পশ্চিমবঙ্গ

মার্চ-জুন, ২০১৯

অরণ্যবাংলা

১১ জুন, ২০১৯। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের
আবক্ষ মূর্তির পুনঃস্থাপন করছেন
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের মুখপত্র

বর্ষ-৫১-৫২ সংখ্যা ১১-১২, ১-২

মার্চ-জুন ২০১৯

মূল্য : ৫০ টাকা

সূ • চি • প • ত্র

সম্পাদকীয় ৩

সকলের কাছেই পৌঁছে দিতে হবে উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা : মুখ্যমন্ত্রী ৪

সংস্কৃতির বাংলায় জাগরণের ডাক ৬

ফটোফিচার:

নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে রাজ্য সরকার প্রদত্ত রাজ্যের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা ৯

ক্রোড়পত্র—

অরণ্যবাংলা ১০

প্রচ্ছদ নিবন্ধ— আমাদের অরণ্যবাংলা

উপদেষ্টা সম্পাদক
প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী

প্রধান সম্পাদক
আলোকোজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক
সুপ্রিয়া রায়

সহ-সম্পাদক
রাতুল দত্ত সর্বাণী আচার্য

প্রথম প্রচ্ছদ পরিচিতি
সবুজশ্রী: গাছ বিতরণ করছেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রচ্ছদ অলংকরণ- **সুরজিৎ পাল**

সম্পাদকীয় শাখা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মহাকরণ (চতুর্থ তল), কলকাতা ৭০০ ০০১
দূরভাষ (০৩৩) ২২৫৪ ৫০৮৬ ই-মেল : editbengali@gmail.com
বিতরণ শাখা: ১১৮, হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা ৭০০ ০১০, দূরভাষ (০৩৩) ২৩৭২ ০৩৮৪

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষে তথ্য অধিকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধিগৃহীত একটি সংস্থা) **১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত**

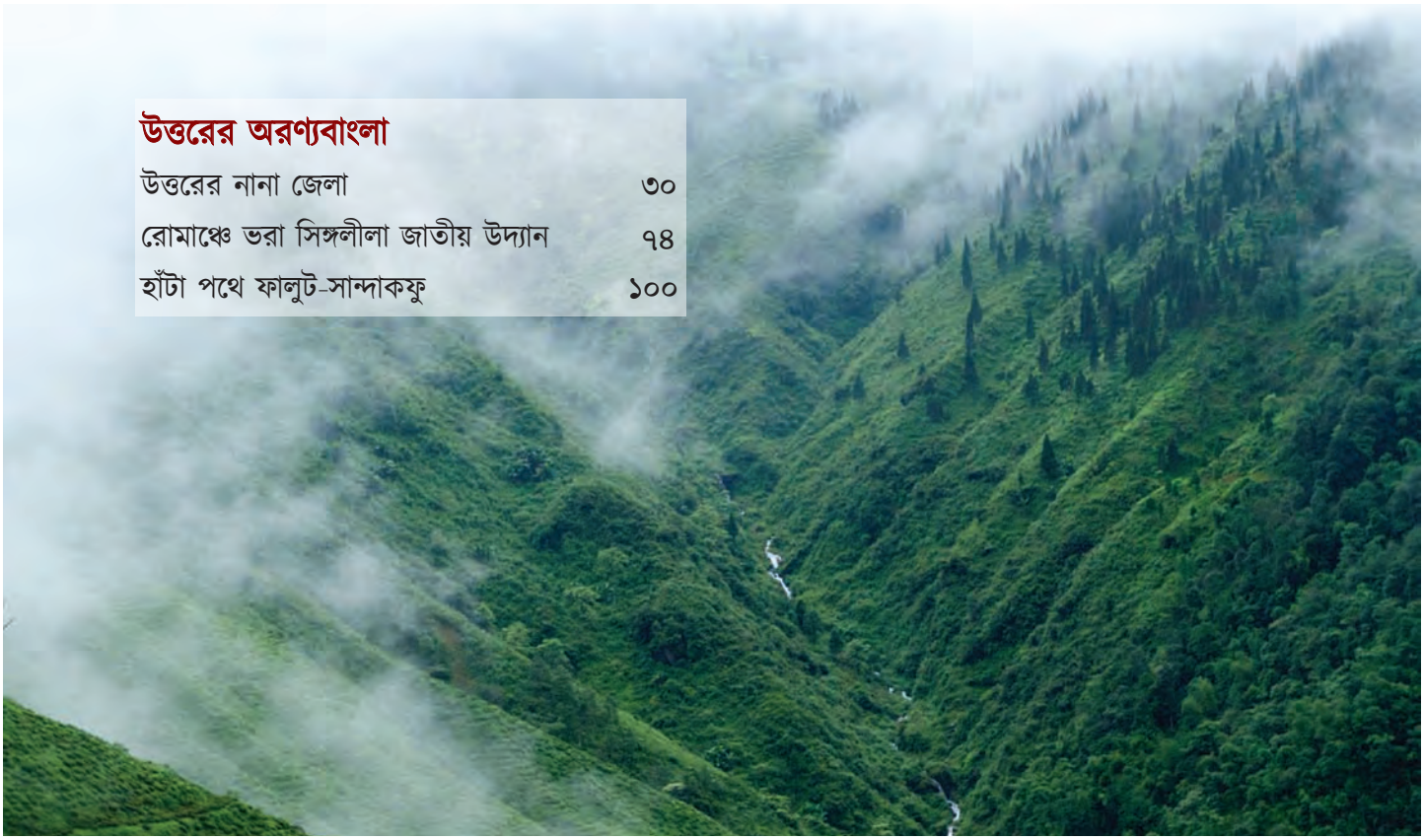

উত্তরের অরণ্যবাংলা

উত্তরের নানা জেলা ৩০

রোমাঞ্চে ভরা সিঙ্গলীলা জাতীয় উদ্যান ৭৪

হাঁটা পথে ফালুট-সান্দাকফু ১০০

দক্ষিণের অরণ্যবাংলা

ডেস্টিনেশন জঙ্গল মহল:

- চলুন লং ড্রাইভে জঙ্গলমহল ১১২
- ছোট্ট ছুটির ফাঁকে ঝাড়গ্রাম ১১৮

সুন্দরবন:

- ডাকছে সুন্দরবন ১৪২
- ম্যানগ্রোভ ও ম্যানইটারের সুন্দরবন ১৫০

বনবাস ১৫৬

বঙ্গদর্শন ১৯৪

- আদিবাসী সমাজ ও জঙ্গলমহল: বাংলার-জীবন সংস্কৃতির উত্তরাধিকার ১৯৫
- বাংলার মসলিন দেশের গর্ব ২০৮
- বাংলার দারু বিগ্রহ: শিল্প ইতিহাসের পরম্পরা ২২১
- জয়দেব মেলা: চিরন্তন সত্যের অনুসন্ধান ২৩৭

স • ম্পা • দ • কী • য়

অরণ্যবাংলা : সবুজশ্রী প্রকল্প

উদ্দেশ্য মহৎ, রূপায়ণ ততোধিক কঠিন। প্রতি শিশুর হাতে চারাগাছ তুলে দিয়ে অরণ্যবাংলাকেই আরও মজবুত করে গড়ে তোলার ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকল্পের নাম সবুজশ্রী।

অরণ্যবাংলার সংরক্ষণে তিনি প্রথম থেকেই বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। উত্তরের পাহাড়-অরণ্য যেমন আছে, তেমনই আছে জঙ্গলমহল, সুন্দরবন।

অরণ্য-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ওই অঞ্চলের জনজাতিগুলির সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে। ফলে সুগম হয়েছে অরণ্য। অরণ্য আবাসের উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে পরিকল্পিতভাবে।

অরণ্য-পর্যটনের নতুন দিশায় জেগে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ। স্থানীয় উন্নয়নে পর্যটন এক মস্তো বড়ো সহায়ক। তবে খেয়াল রাখতে হবে, পরিবেশ যেন বিঘ্নিত না হয়। পরিবেশ-বান্ধব পর্যটনের বিস্তারের পাশাপাশি অরণ্য-সৃজনের পরিকল্পিত উদ্যোগের সফল রূপায়ণ জরুরি।

সবুজশ্রী প্রকল্প এই ব্যাপারে নিতে পারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। প্রয়োজন জনসচেতনতা। ইকো-ক্লাবগুলির মাধ্যমে এই কাজ গতি পেতে পারে।

রাজ্যের অরণ্য-অঞ্চলগুলি সম্পর্কে সামান্য ধারণা দিতে এই সংখ্যায় কিছু নিবন্ধ ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হল ছবি ও মানচিত্র সহ। বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য ও ছবি নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এই সংখ্যায় বঙ্গদর্শন বিভাগে প্রকাশিত হল কয়েকটি মূল্যবান নিবন্ধ। অনবধানবশত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

সকলের কাছেই পৌঁছে দিতে হবে উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা : মুখ্যমন্ত্রী

হয়ে গেল সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন। দেশের ৫৪২টি লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাংসদেরা। পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত ৪২ জন সাংসদ। রাজ্যের ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রে সাতটি পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয় ১০ মার্চ, ২০১৯। নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হল ২৩ মে।

নির্বাচন পরবর্তী সময়ে রাজ্য সরকার দ্রুতগতিতে উন্নয়নের কাজে উদ্যোগী হয়েছে। রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে সরকারি পরিষেবা এখন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সরকারি প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা থেকে কোনও উপভোক্তা যেন বঞ্চিত না হন সেদিকে কড়া নজর রাখার কথা বলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সর্বত্র শান্তি বজায় রাখার পাশপাশি উন্নয়নের কাজকেই পাখির চোখ করেছেন তিনি।

নবান্ন থেকেই শুরু হয়েছে এই উদ্যোগ। ১০ জুন, নবান্নে এক প্রশাসনিক বৈঠক আয়োজিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী-সহ বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রী, বিভিন্ন পর্যায়ের সচিব, জেলাশাসক, জেলার পুলিশসুপার-সহ বিভিন্ন আধিকারিকরা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্য সরকারের ঋণের বোঝা প্রতিদিনই বাড়ছে। এই বিপুল বোঝা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার রাজ্যবাসীর প্রাথমিক চাহিদাগুলি পূরণে কতটা আন্তরিক সেকথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানান, ২০১৯ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ২ লাখ ৭৪ হাজার ৩১৬ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারকে ঋণবাবদ দেওয়া হয়েছে। বারবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ঋণের বোঝা কমানোর আবেদন করেও কোনও ফল পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে, লোকসভা নির্বাচনের ফলে দীর্ঘসময় রাজ্যর সমস্ত উন্নয়নের কাজ বন্ধ ছিল।

এসব সত্ত্বেও রাজ্য সরকার রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি করে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম অব্যাহত রেখেছে। ২০১৮-১৯ সালে রাজস্ব কর সংগ্রহের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৫ হাজার ৩৪১ কোটি টাকা। রাজ্যের জিএসটি-র পরিমাণ ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এক বছরে (২০১৮-১৯-এ)।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান যে গত আট বছরে পরিকল্পনাখাতে ব্যয় ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মূলধন খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৮ গুণ।

সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যয় গত আট বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে গত আর্থিক বছরের ৯ শতাংশ বৃদ্ধিসহ সাড়ে ৪ গুণেরও বেশি, কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের ব্যয় গত আট বছরে গত আর্থিক বছরে ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি-সহ ৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে ব্যয় এই সময়ে ৫ গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে গত আর্থিক বছরের ৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি-সহ।

একদিকে ঋণের বিপুল বোঝা, অন্যদিকে আর্থিক সংস্কারের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি— রাজ্য সরকার এই দুই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করছে শক্ত হাতে।

সার্বিক উন্নয়নই রাজ্য সরকারের লক্ষ্য। লক্ষ্য সব মানুষের কাছেই উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়া। এই লক্ষ্যে সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

১০ জুন ২০১৯। নবান্নে আয়োজিত প্রশাসনিক বৈঠক।

বিদ্যাসাগর কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এই নতুন আবক্ষ মূর্তিটি স্থাপন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃতির বাংলায় জাগরণের ডাক

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলার প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁর নাম প্রথম দিকে। জীবনের আলোর পথে হাঁটি হাঁটি পা পা করে পথ চলার শুরু হয় তাঁর বর্ণপরিচয় হাতে নিয়ে। বাঙালির জীবনে বিদ্যাসাগর-এর স্থান একেবারে আলাদা একটা কক্ষে।

প্রায় ২০০ বছর আগে এক দরিদ্র বাঙালি পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর জন্ম। মেদিনীপুরের বীরসিংহ-এ। ছোট্ট ঈশ্বর বাবার সঙ্গে পায়ে হেঁটে হেঁটে আসে কলকাতা শহরে। সমস্ত রকম প্রতিকূলতাকে পরাজিত করে সংস্কৃতের এক মস্ত পণ্ডিত হয়ে ওঠেন তিনি। কিন্তু পাণ্ডিত্যের বৃত্তের বাইরে মানবতার বৃহৎ বৃত্তে শুরু হয় তাঁর পরিক্রমণ। বিদেশি শাসনের মায়াজালে তিনি বদ্ধ হননি। জীবন-আচরণের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি আজীবন থেকে যান বাঙালিয়ানার নির্ভীক মডেল। ধুতি-চাদর-আর চটি পরিহিত বিদ্যাসাগর মশাই বাংলার সমাজকে গতি দিলেন। বিধবা-বিবাহ-এর মতো সামাজিক সংস্কার করার জন্য দুঃসাহস, ক্ষমতার প্রয়োজন। তাঁর মধ্যে, দুটোই অপর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। 'বহুবিবাহ' প্রথা বন্ধের জন্যও তাঁর উদ্যোগ উল্লেখ্য। নারী শিক্ষার প্রসারে তাঁর অবদান স্মরণীয়।

এই লড়াকু বাঙালির কাছে ততোধিক প্রয়োজনীয় ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নির্মাণ। বাঙালির অপরিসীম ও অপরিশোধ্য ঋণ এই মানুষটির কাছে।

বাংলা ও প্রতিটি বাঙালির বিনত অবস্থান বিদ্যাসাগরের কাছে। তাঁর নাম স্মরণ ও উচ্চারণ-এর সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে ভেসে ওঠেন তিনি। তিনি আমাদের বিদ্যাসাগর। বাঙালির কাছে তাঁর মৃত্যু নেই। এ হেন বিদ্যাসাগর-কে কেন্দ্র করে যে কোনও অমর্যাদাকর পরিস্থিতি পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তের বাঙালিকেই অত্যন্ত মর্মাহত করবে, এটাই স্বাভাবিক। যে কোনও পরিস্থিতিতেই এই ধরনের কোনও ঘটনা বাংলার হৃদয়কে যেন উপড়ে ফেলে আজও। আবেগসর্বস্ব বাঙালি জীবনে এই ধরনের ঘটনা যন্ত্রণা বয়ে আনে।

বিদ্যাসাগর-এর মতো বরেণ্য বাঙালি মনীষীদের যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে সম্মান জানাতে আজও পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গীকারবদ্ধ। বিদ্যাসাগর-এর দ্বিশতজন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যেই কমিটি তৈরি হয়েছে। শুরু হয়েছে বছর-ব্যাপী কর্মসূচির।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর-সংক্রান্ত কোনও অসূয়াপ্রসূত অস্থির পরিস্থিতি দেখা দিলে কড়া হাতে তা মোকাবিলায় সরকার উদ্যোগী ও সক্ষম।

বিদ্যাসাগর-এর নামাঙ্কিত কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর-এর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি এবং একটি আবক্ষ মূর্তি নতুন করে প্রতিস্থাপিত করেন গত ১১ জুন, ২০১৯ তারিখে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিদ্যাসাগরের মূর্তি নষ্ট করে, তাঁর অবদানকে লঘু করা যাবে না। রাজা রামমোহনকে ছোটো করলে ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া যাবে না। এ ধরনের কাজ যারা করে, তাদের জন্য যিশু খ্রিস্টের ভাষায় বলতে হয়—'ভগবান ওদের ক্ষমা কর। ওরা জানে না ওরা কী করছে।'

রাজ্যের বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রের বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সাংস্কৃতিক বাংলার পুনর্জাগরণের আহ্বান জানান। ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতা থেকে এই আহ্বান তিনি পৃথিবীব্যাপী বাঙালি তথা ভারতবাসীর কাছে রাখেন।

বিদ্যাসাগরের জীবনব্যাপী কাজ বিশ্বের মানবসমাজের ইতিহাসে স্বর্ণময় হয়ে আছে। যে কোনও সময়ে যে কোনও সমাজে বিদ্যাসাগর-এর মতো 'ক্ষণজন্মা' মানুষেরা স্বীকৃতি আদায় করে নিতে পারেন। যে মানুষের জীবন পৃথিবীর অন্যতম একটি দেশের ইতিহাসের অনেকগুলো অধ্যায় জুড়ে থাকে, সেই মানুষের মৃত্যু নেই।

বিদ্যাসাগরও সেই মানুষ। যাঁর মৃত্যু নেই। ঐতিহ্যের পরম্পরা জুড়ে এই জেদী মানুটির কর্মকাণ্ড প্রবহমান।

হেয়ার স্কুলের সেই ঐতিহাসিক মাঠে আর এক ঐতিহাসিক ঘটনা। বিদ্যাসাগর-এর আবক্ষমূর্তি, যেটি বিদ্যাসাগর কলেজ-এ নতুন করে বসানো হল, সেটির আবরণ উন্মোচন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। আবেগঘন এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী-সহ রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘ-এর প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ১১ জুন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় ঈশ্বরচন্দ্রের বাড়িতে আসেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। সেই দিনটাকে স্মরণ করে এই অনুষ্ঠানের দিন ধার্য করার জন্য আয়োজকদের বিশেষ ধন্যবাদ জানান।

বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরম্পরা যাঁদের জীবনব্যাপী কর্মের মধ্য দিয়ে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিল, নব জাগরণের অগ্নিদীপ্ত চেতনা ও শিক্ষা প্রজ্জ্বলিত করে রেখেছিল এক হাত থেকে আরেক হাতে সেই মনীষীরা আজ বারেবারে উচ্চারিত হয়েছেন। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-এর উত্তরসূরী হিসাবে এই প্রদীপ্ত ধারাকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার পবিত্র কর্তব্য আমাদের পালন করতেই হবে। বঙ্গ সংস্কৃতির বিশ্বজোড়া খ্যাতিকে শুধু অম্লান নয়, আরও বেশি করে ছড়িয়ে দিতে হবে। অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে তাঁদের মর্যাদা। উপস্থিত বক্তাদের নানা বক্তব্যে এই কথাই উঠে আসে।

এই অনুষ্ঠানে বিদ্যাসাগর কলেজকে ১ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ৫০ লাখ দেওয়া হবে ঘাটাল কলেজকে। পূর্বে মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের পৈতৃক বাড়িটিকে সংস্কার করে 'ঐতিহ্য গৃহ' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন।

বিদ্যাসাগর কলেজ প্রাঙ্গণে সাড়ে আট ফুট উঁচু বিদ্যাসাগরের একটি পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

হেয়ার স্কুল থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার পথ মুখ্যমন্ত্রী, বিশিষ্ট মন্ত্রী ও ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে হেঁটে আসেন বিদ্যাসাগরের আবক্ষ-মূর্তির সঙ্গে। মূর্তিটি একটি হুড-খোলা গাড়িতে সামনে থাকে। এই পদযাত্রাও নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক।

কৃতীদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী

বাংলার মেধা বিশ্ব সেরা : মুখ্যমন্ত্রী

২০১৮-১৯ সালে বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের চা-চক্রে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২ জুন নেতাজি ইন্ডোরে এই চা-চক্রে অংশ নেন ছাত্রছাত্রীরা।

গত বছরও মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে কৃতীদের সঙ্গে একটি চা-চক্রের আয়োজন হয়েছিল উত্তীর্ণে। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তিনি এই পরম্পরাটি চালু করেন।

তিনি উপস্থিত ছেলেমেয়েদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, যেন তারা মা-বাবা কিংবা শিক্ষকদের আদর্শ মেনে চলে। যারা এই সোনার টুকরো ছাত্রছাত্রী তৈরি করেছেন সেইসব বাবা মা ও শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সকলকে আমার অভিনন্দন। 'জেমস অফ বেঙ্গল' নামে একটি বই তৈরি হয়েছে এই প্রথম, সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের নাম ও বায়ো ডেটা নিয়ে এই বই তৈরি হয়েছে। এটা তোমাদের জীবনের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। আজকাল ছেলেমেয়েরা হাতের মুঠোয় সব তথ্য পেয়ে যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে। এই ব্যবস্থা আগে ছিল না। এটা অনেক বড় সুবিধা। এর মাধ্যমে অনেক বেশী শিখছে ছেলেমেয়েরা, অনেক এগিয়ে যাচ্ছে তারা। বাংলার ছেলেমেয়েরা সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের মেধা পৃথিবীবিখ্যাত। এর কোনও তুলনা হয় না। দেশ-বিদেশ সব জায়গায় আমাদের এই বাংলার ছেলেমেয়েরাই। আমরা এর জন্য গর্বিত।

ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি আরও বলেন, নিজেদের যত্ন নেবে, ঠিক করে খাওয়া দাওয়া, ব্যায়াম করবে, গান শুনবে, প্রয়োজন মতো সিনেমা দেখবে, নেগেটিভ কিছু দেখবে না। কাজ তো থাকবেই, মাথা গরম করবে না, হাসি মুখে কাজ করবে। আর বাবা-মা কে কখনো ভুলে যেও না, তারাই সবচেয়ে বড় সম্পদ–সবচেয়ে আপন। বাবা-মা, ভাই-বোন তাদের যত্ন করা আমাদের কর্তব্য। শিক্ষকের কোনও বিকল্প নেই। তারাও আমাদের পিতা-মাতা তুল্য।

বাংলায় এখন অনেক সুযোগ তৈরি হয়েছে। সল্টলেকে আইএএস ও আইপিএস-দের ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে রাজ্য সরকার। আমরা ৩০০ পলিটেকনিক কলেজ তৈরি করেছি, উৎকর্ষ বাংলার মাধ্যমে সেখানে দক্ষতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ছেলেমেয়েদের।

স্বাধীনতার পর থেকে এখানে ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। গত ৮ বছরে ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়ে গেছে এবং আরও ১১টির কাজ চলছে। ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজ হচ্ছে। ৮টি মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে, আরও ১০ টি তৈরি হচ্ছে। মেডিক্যাল-এ প্রায় ২০০০ আসন বেড়েছে এবং আরও ৫৫০-টি আসন বাড়ছে। বাংলায় ফ্যাশন টেকনোলজি সেন্টার, ইনফরমেশন টেকনোলজি সেন্টার, সিলিকন ভ্যালি তৈরি হচ্ছে। ট্রিপল আইটিআই এখানে তৈরি হয়ে গেছে। সকলের উদ্দেশ্যে শুভকামনা জানিয়ে তিনি বলেন, সকলে ভালো থাকো, সুন্দর থেকো, জয় করো। বাংলার মণীষীদের ও সংস্কৃতিকে চিরকাল মনে রেখো।

ক্রোড়পত্র

অরণ্যবাংলা

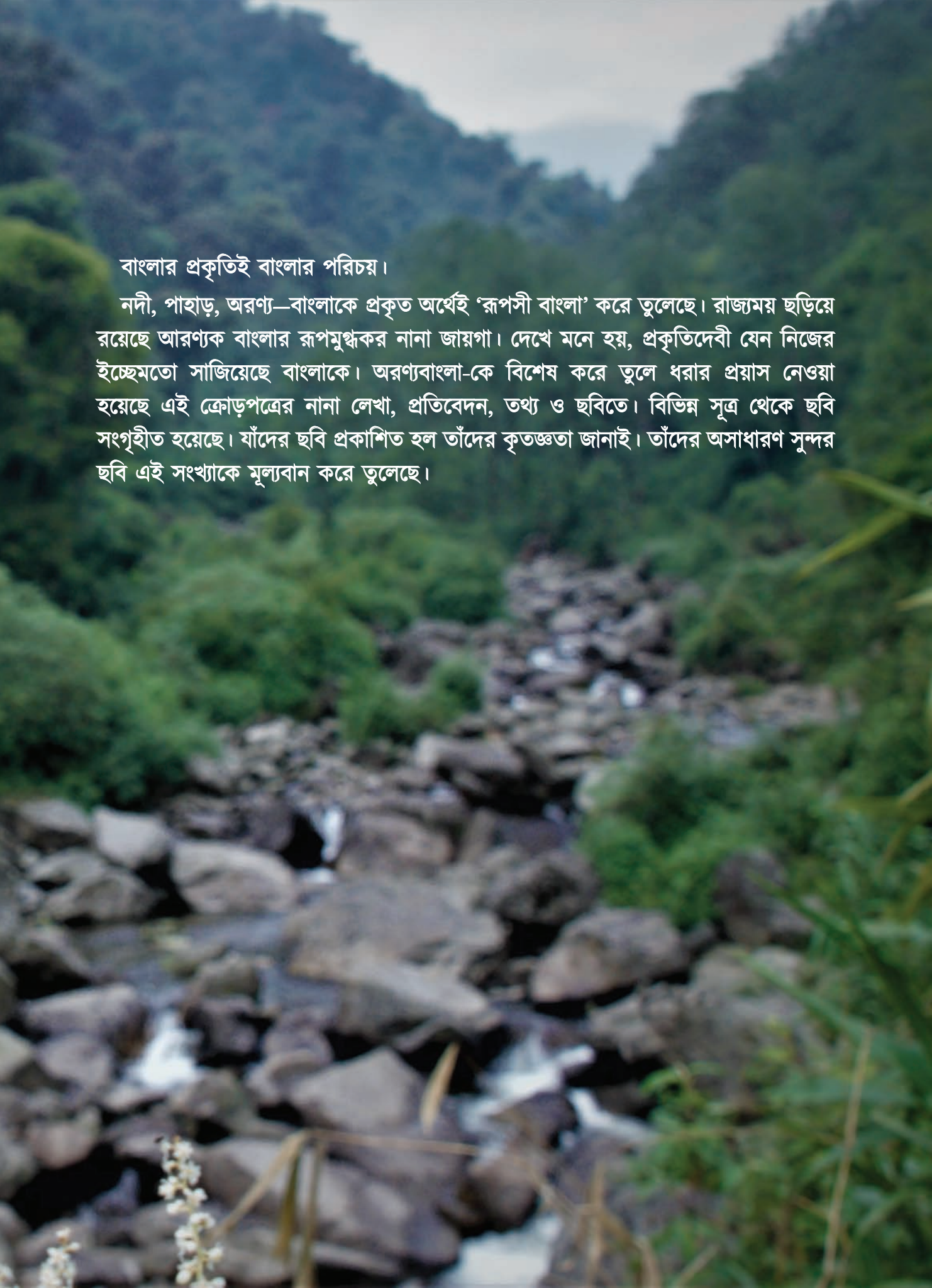

বাংলার প্রকৃতিই বাংলার পরিচয়।

নদী, পাহাড়, অরণ্য—বাংলাকে প্রকৃত অর্থেই 'রূপসী বাংলা' করে তুলেছে। রাজ্যময় ছড়িয়ে রয়েছে আরণ্যক বাংলার রূপমুগ্ধকর নানা জায়গা। দেখে মনে হয়, প্রকৃতিদেবী যেন নিজের ইচ্ছেমতো সাজিয়েছে বাংলাকে। অরণ্যবাংলা-কে বিশেষ করে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে এই ক্রোড়পত্রের নানা লেখা, প্রতিবেদন, তথ্য ও ছবিতে। বিভিন্ন সূত্র থেকে ছবি সংগৃহীত হয়েছে। যাঁদের ছবি প্রকাশিত হল তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁদের অসাধারণ সুন্দর ছবি এই সংখ্যাকে মূল্যবান করে তুলেছে।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

আমাদের অরণ্যবাংলা

সে যেন এক নৃত্যরতা নারী। কাঞ্চনজঙ্ঘা তার মাথার মুকুট। পরনের মেখলা ছড়িয়েছে সমুদ্রের তীরে তীরে। আর সবুজ অরণ্য কখনও নিবিড়, কখনও হালকা হয়ে জড়িয়ে আছে সারা শরীর। শরীরময় জল-রুপোর গয়না।

এই আমাদের অরণ্যবাংলা।

উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ। পাহাড়, অরণ্য, নদী, ঝোরা। আশ্রয় দিয়েছে অজস্র প্রজাতির প্রাণকে। বৈচিত্র্যময় এক জগৎ।

এখানেও মানুষ আর বাঘের পাশাপাশি অবস্থান। সাগর কিনারের সুন্দরবনেও মানুষ আর বাঘের বসতি। নোনাজলে অরণ্যের প্রকৃতি আবার অন্যরকম।

পাহাড়ি অরণ্য আর সামুদ্রিক অরণ্য তো আছেই। মালভূমির অরণ্য নিয়ে আছে আমাদের পরিচিত 'জঙ্গলমহল'। এছাড়া রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বনাঞ্চলের অংশ।

সভ্যতা তথা উন্নয়ন শুরু হয়েছিল অরণ্য সাফাই করেই। সে কলকাতা, দার্জিলিং বা সুন্দরবনই হোক। কিন্তু আজ আমরা নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংস করার বিপদ বুঝতে পারছি। তাই চলছে অরণ্য তৈরির প্রয়াসও।

মানুষ ছাড়াও সর্বত্র প্রাণী বা প্রাণের যে অগণিত প্রজাতির উপস্থিতি আছে এই রাজ্যজুড়ে সেই কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। এই মনে রাখাটাও খুবই জরুরি।

এই অঞ্চল নদীমাতৃক। নদী যেখানে আছে সেই অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র অন্যরকম। জল সকল প্রাণেরই জীবন। জলচর, স্থলচর, উভচর, খেচর প্রাণীর পাশাপাশি নানারকম উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গও এই অঞ্চলে দেখা যায়। ফলে এই অঞ্চলের জৈব-বৈচিত্র্যও অসাধারণ।

পরিবেশবিদদের কাছেই শুধু আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি, সাধারণ মানুষের জীবনেও এই জৈব-বৈচিত্র্য বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। প্রাকৃতিক

ভারসাম্য বজায় রাখার কথা আর পাঠ্যপুস্তকে সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিটি মানুষ বাস্তবে সে-কথা অনুভব করছে। বিশেষ করে, শহরের মানুষ। প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন মানুষ অহরহ অনুভব করছে এর কু-প্রভাব। এক টুকরো সবুজের জন্য প্রাণ হাঁপিয়ে যাচ্ছে। তাই ঘিঞ্জি নগরজীবনেও সবুজায়নের ভাবনা গুরুত্ব পাচ্ছে ক্রমশ। জমির অভাব। শহরে মানুষের ঠাঁই মিলছে উঁচু উঁচু আবাসনে। দরিদ্র মানুষের জন্যও তৈরি হচ্ছে এই আবাসন। আবাসনের চারপাশে সবুজের সমারোহ অপরিহার্য হয়ে পড়ছে। ব্যস্ত নাগরিক জীবনে মনের কথা ভাবতে হবে। প্রাকৃতিক ভারসাম্যে হানি ঘটলে মানসিক ভারসাম্যও বিঘ্নিত হয়। শহরের শিশুদের, প্রবীণদের জন্য সবুজ, উন্মুক্ত প্রকৃতি কোনওভাবেই হেলাফেলার নয়। যেকোনও বয়সের মানুষের কাছেই প্রকৃতি মানে জীবন্ত ঈশ্বর। সে যে ধর্মের বা সম্প্রদায়েরই হোক না কেন।

পশ্চিমবঙ্গের নথিভুক্ত অরণ্যঅঞ্চল ৩১১,৮৭৯ বর্গ কিমি এবং সংরক্ষিত, নিরাপত্তাপ্রাপ্ত এবং অশ্রেণিভুক্ত বনাঞ্চল হল যথাক্রমে ৭,০৫৪ বর্গ কিমি, ৩৭৭২ বর্গ কিমি এবং ১০৫৩ বর্গ কিমি যা রাজ্যের ভৌগোলিক এলাকার ১৩.৩৮ শতাংশ।

ইন্ডিয়ান ফরেস্ট অ্যাক্ট ১৯২৭ অনুযায়ী যে বনাঞ্চলের সম্পূর্ণ মাত্রায়

নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই অ্যাক্টের ২০-নং ধারা অনুযায়ী বিশেষ অনুমতি ছাড়া যেখানে সব ধরনের কাজকর্ম নিষিদ্ধ, সেই বনাঞ্চলকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল (Reserve Forest or RF) বলা হয়। উপরোক্ত অ্যাক্ট অনুযায়ী বা অন্য রাজ্যের বন আইন অনুসারে সীমিত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় যে বনাঞ্চলে, এবং যেখানে ১৯২৭-এর আইএফএ-র ২৯ নং ধারা অনুযায়ী কোনও নিষেধ ছাড়া সব ধরনের কাজকর্ম করা যায়, সেই বনাঞ্চলকে নিরাপদ বনাঞ্চল (Protected forest or PF) বলা হয়।

এই দুই ধরনের বনাঞ্চলের বাইরে যা পড়ে আছে তাকে অশ্রেণিভুক্ত বনাঞ্চল বলা হয়।

এই রাজ্যের ভৌগোলিক ইতিহাসও ধীরে ধীরে পালটে গিয়েছে। বিশেষ করে, ইংরেজ আসার পরে। ইংরেজ কোম্পানির ও শাসকের বিপুল কর্মকাণ্ডের শুরুয়াৎ হয় এই বাংলা থেকেই। জলা-জঙ্গলের কলকাতাকে তারা রাজধানী করে তোলে। আজ যেখানে রবীন্দ্রসদন, তার পাশে যখন সেন্ট পলস ক্যাথেড্রাল চার্চ তৈরির কাজ শুরু হয়, সেই উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, তখন ওখানে বাঘের বসতি ছিল। অর্থাৎ ২০০ বছর আগে কলকাতা ছিল বাঘের দখলে।

সেই কলকাতা রাতারাতি পালটে যেতে লাগল, একের পর এক ইমারত তৈরি হতে লাগল। গাছ কেটে আগুন জ্বেলে তৈরি হচ্ছে ইমারত। ইংরেজরা রাস্তা তৈরি করল। রাস্তার ধারে ধারে গাছ লাগাল। সেই গাছও আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে। পরিকল্পিতভাবে শাসনকেন্দ্র তৈরি করেছিল একসময়। কিন্তু তা অক্ষুণ্ণ থাকেনি। পুরোনো কলকাতার যেখানে-সেখানে স্থানীয় মানুষের বসবাস শুরু হয়। কলকাতা তখন সারা বিশ্বের নজরে। বাংলার নানা প্রান্ত থেকে, বাংলার বাইরে থেকে, বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ আসছে। কাজের জায়গা। যে যেখানে পারছে জঙ্গল-সাফাই করে কুঁড়েঘর গড়ে তুলছে। যাদের পয়সা আছে, তারাও গড়ে তুলতে লাগল

পশ্চিমবঙ্গে জেলাভিত্তিক ভৌগোলিক এলাকা এবং নথিভুক্ত অরণ্য

জেলা	ভৌগোলিক অঞ্চল (বর্গ কি.মি.)	নথিভুক্ত অরণ্য অঞ্চল (বর্গ কি.মি.)	নথিভুক্ত অরণ্য অঞ্চল (শতাংশ)
দার্জিলিং	৩,১৪৯	১,২০৪	৩৮.২৩%
জলপাইগুড়ি	৬,২২৭	১,৭৯০	২৮.৭৫%
কোচবিহার	৩,৩৮৭	৫৭	১.৬৮%
বাঁকুড়া	৬,৮৮২	১,৪৮২	২১.৫৩%
মেদিনীপুর	১৪,০৮১	১,৭০৯	১২.১৪%
বর্ধমান	৭,০২৪	২৭৭	৩.৯৪%
পুরুলিয়া	৬,২৫৯	৮৭৬	১৪.০০%
বিরভূম	৪,৫৪৫	১৫৯	৩.৫০%
হুগলী	৩,১৪৯	৩	০.১০%
নদীয়া	৩,৯২৭	১২	০.৩০%
মুর্শিদাবাদ	৫,৩২৪	৮	০.১৫%
মালদা	৩,৭৩৩	২০	০.৫৪%
উত্তর দিনাজপুর	৩,১৪০	১০	০.৩২%
দক্ষিণ দিনাজপুর	২,২১৯	৮	০.৩৬%
কলকাতা	১০৪	-	০.০০%
হাওড়া	১,৪৬৭	-	০.০০%
২৪-পরগনা (দক্ষিণ)	১০,১৫৯	৪,২২১	৪১.৫৪%
২৪-পরগনা (উত্তর)	৩,৯৭৭	৪৩	১.০৮%
মোট	৮৮,৭৫২	১১,৮৭৯	১৩.৩৮%

একের পর এক জমি কিনে বড়ো বড়ো ইমারত। অর্থাৎ কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অরণ্য সাফাই হয়ে গেল।

বাংলার মানুষের জীবনে একের পর এক আধুনিকতার ছোঁয়া লাগল। বাংলার নানা অঞ্চলেও এর প্রভাব পড়ল। শিক্ষা দীক্ষার আলোয় বাংলার মানুষ আগ্রহ দেখাল। মফস্‌সল শহরগুলিতেও শুরু হল বিদ্যালয়। শুরু হল নারী-শিক্ষা। অন্ধকার দূর হতে লাগল। উন্নত জীবনের স্বপ্নে তখন বাংলা মশগুল।

শিক্ষিত বাঙালি ইংরেজ শাসকের অন্যতম বড়ো সহায়। বাঙালির ইংরেজি শিক্ষাকে কাজে লাগাল ইংরেজ। প্রশাসনের নানা কাজে বাঙালির চাকরি হতে লাগল। 'ঘরকুনো' বদনাম ঘুচিয়ে ইংরেজের হাত ধরে চাকরির প্রয়োজনে বাংলা ছেড়ে ইংরেজের বিস্তৃত সীমানায় তাদেরও অস্থায়ী ঠিকানা গড়ে উঠল। অন্যদিকে, গ্রামের শিক্ষিত মানুষ এল শহরে। আবার একদিন শহর ছেড়ে পাড়ি জমালো ভিন্ প্রদেশে।

এই কলকাতাকে কেন্দ্র করে ইংরেজরা প্রশাসনিক কেন্দ্রের বিস্তার ঘটাল। গড়ে তুলল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি।

বাঙালির হাতে তখন অনেক টাকা। গ্রাম-বাংলার এক বিস্তৃত অঞ্চল আধা-শহরে রূপান্তরিত হল। এই রূপান্তরের ইতিহাসের মধ্যে অরণ্যের ইতিহাস লুকিয়ে আছে।

ইংরেজ শাসকেরা এই অঞ্চলের যে তথ্য নথিবদ্ধ করে গিয়েছেন, সেখানে দেখা যায় মানুষ ছাড়াও প্রকৃতি,

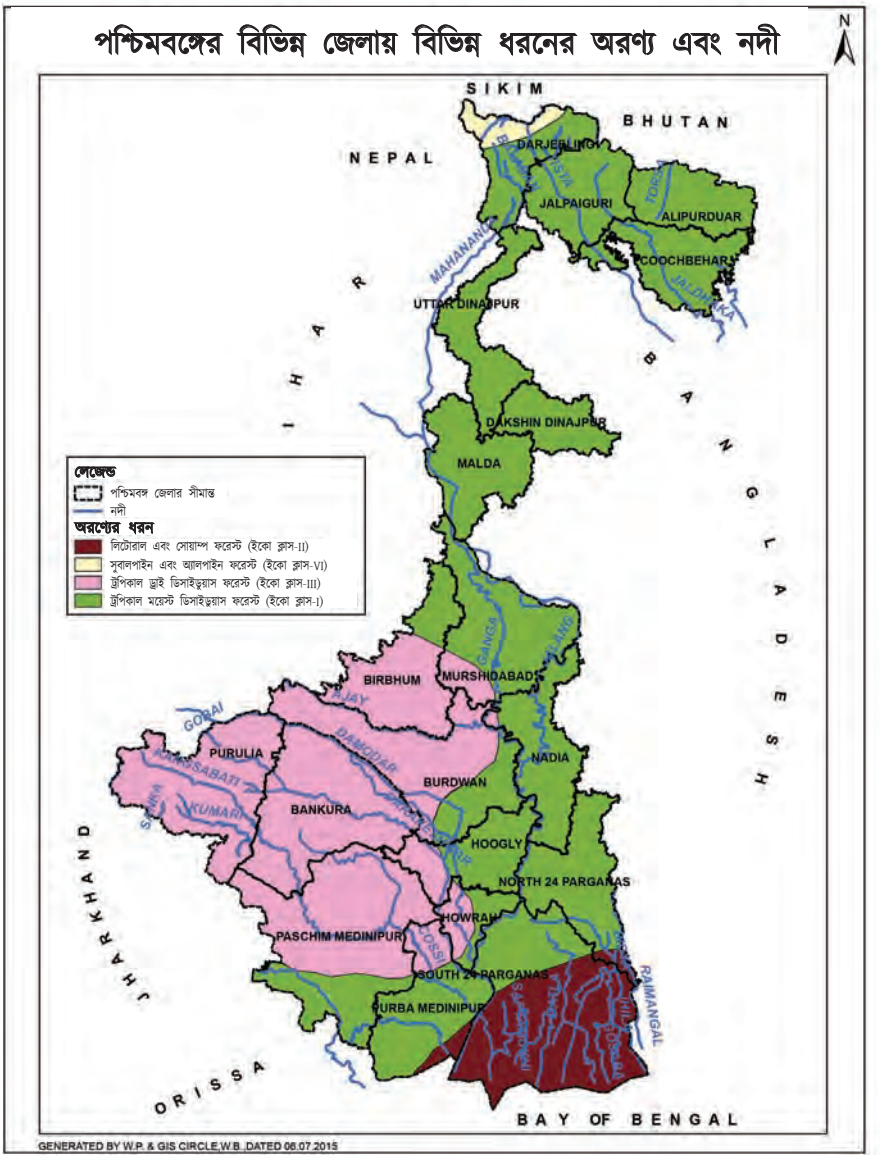

প্রাকৃতিক সম্পদ, জীবজন্তু কতটা গুরুত্ব পেয়েছিল। ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও অন্যান্য রিপোর্টে নানা তথ্য তাঁরা রেখে গিয়েছেন। বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, হাতির মতো প্রাণীর থেকে বিভিন্ন নিরীহ প্রাণীর সম্বন্ধেও যে তথ্য ও পরিসংখ্যান আছে, সেই থেকে এই অরণ্য অঞ্চল সম্পর্কে বিশদে ধারণা তৈরি করা যায়। উৎসাহীরা সেই তথ্য ভাণ্ডারে ডুব দেবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু, এই রাজ্যের মানুষ তাদের নিজস্ব সম্পদ, ঐতিহ্য, জীবনসংস্কৃতি রক্ষায় এবং প্রসারে উদাসীন থাকতে পারে না। তাদেরও পরম দায়িত্ব আছে এর সংরক্ষণে।

'অরণ্যবাংলা' আমাদের সম্পদ।

অরণ্যসম্পদ এই রাজ্যের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এক বড়ো হাতিয়ার।

রাজ্যের মধ্যে যে প্রাচীন অরণ্য অঞ্চল আছে, সেই অঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন জনজাতির মানুষ থাকেন। এরা আজও অনেকাংশেই অরণ্য-নির্ভর জীবনযাপন করেন। এইসব জনজাতির প্রকৃত উন্নয়নের ওপরই নির্ভর করছে অরণ্যের ভবিষ্যৎ। পরিকল্পিত কর্মসূচির সঠিক রূপায়ণ ছাড়া

বাঁকুড়ার ঝিলিমিলির ওয়াচ টাওয়ার

বিন্দু

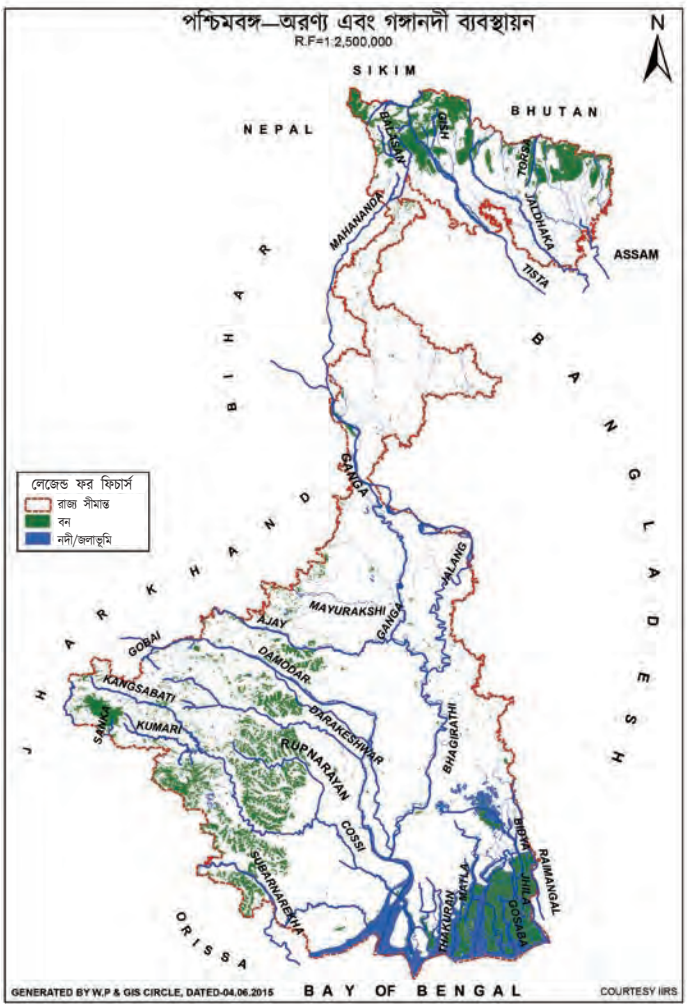

সুন্দরবনে বরদাবড়ি-র ওয়াচটাওয়ার

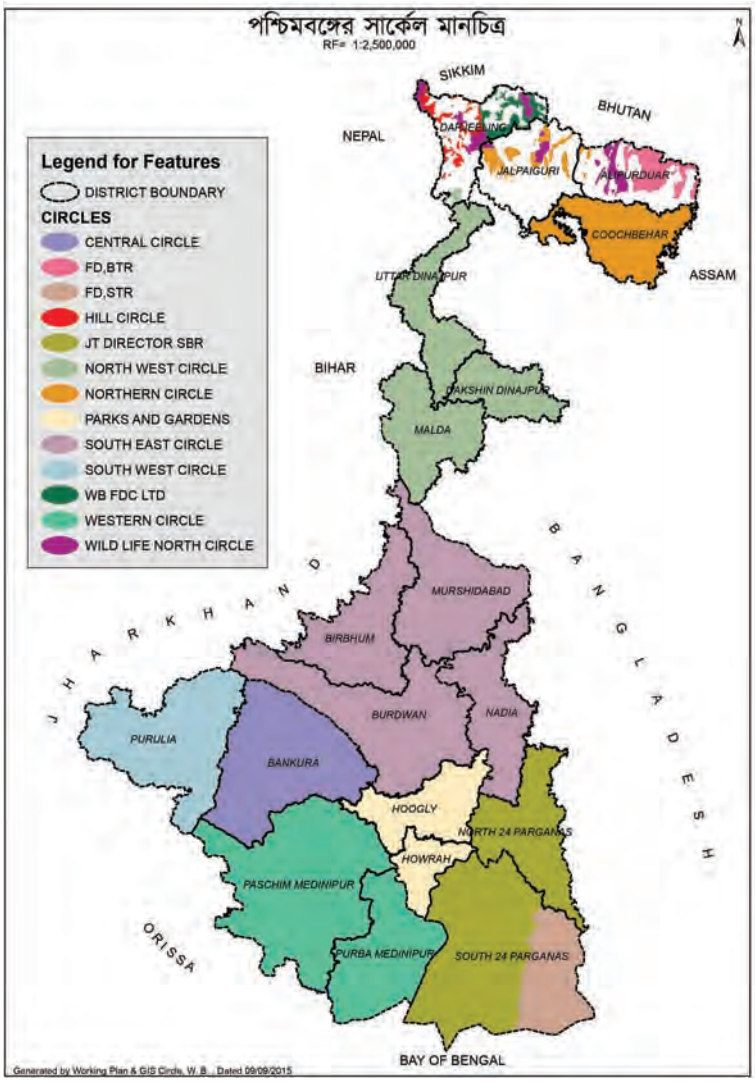
পশ্চিমবঙ্গের সার্কেল মানচিত্র
RF= 1:2,500,000
N
SIKKIM
BHUTAN
NEPAL
DARJEELING
JALPAIGURI
ALIPURDUAR
COOCHBEHAR
ASSAM
UTTAR DINAJPUR
BIHAR
DAKSHIN DINAJPUR
MALDA
MURSHIDABAD
BIRBHUM
BURDWAN
NADIA
PURULIA
BANKURA
HOOGLY
NORTH 24 PARGANAS
HOWRAH
PASCHIM MEDINIPUR
PURBA MEDINIPUR
SOUTH 24 PARGANAS
JHARKHAND
BANGLADESH
ORISSA
BAY OF BENGAL
Legend for Features
DISTRICT BOUNDARY
CIRCLES
CENTRAL CIRCLE
FD,BTR
FD,STR
HILL CIRCLE
JT DIRECTOR SBR
NORTH WEST CIRCLE
NORTHERN CIRCLE
PARKS AND GARDENS
SOUTH EAST CIRCLE
SOUTH WEST CIRCLE
WB FDC LTD
WESTERN CIRCLE
WILD LIFE NORTH CIRCLE
Generated by Working Plan & GIS Circle, W. B. , Dated 09/09/2015

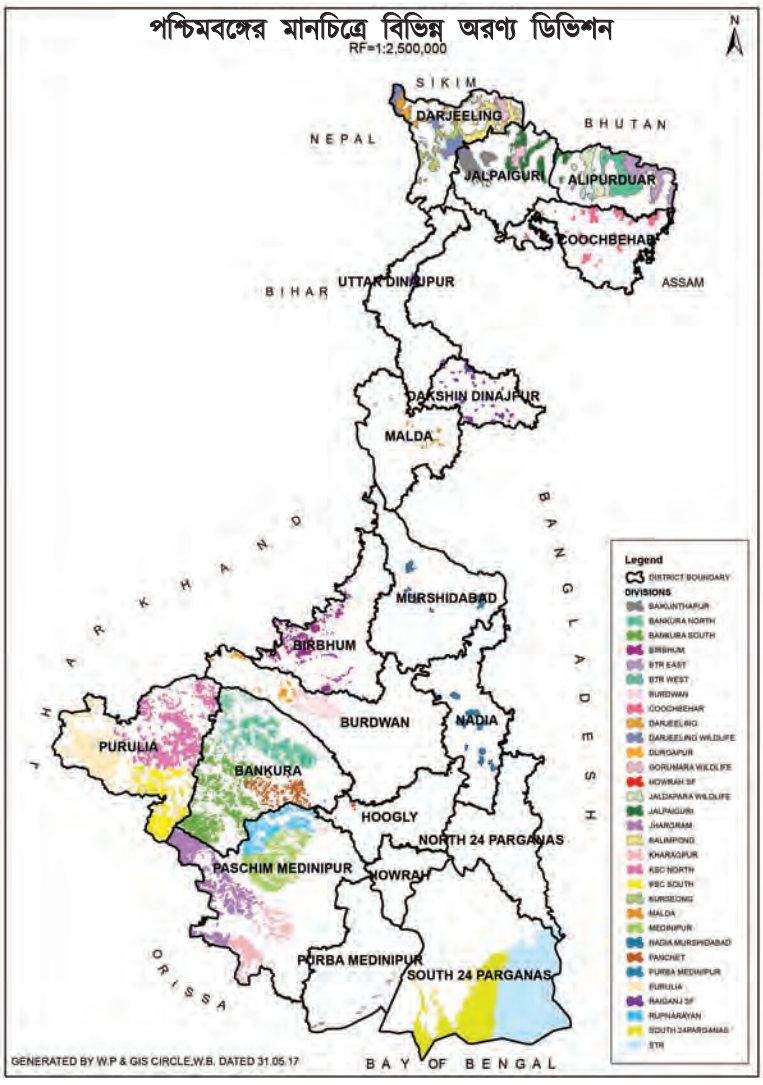

গোপগড় ইকো-টুরিজিম পার্ক

কোনওভাবেই এইসব জনজাতি এবং সংলগ্ন অঞ্চলের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সম্ভব নয়।

বিভিন্ন জনজাতির উন্নয়নের জন্য একের পর এক পর্ষদ বা বোর্ড গঠিত হয়েছে। তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বজায় রাখা ও উন্নয়নের জন্য অর্থও বরাদ্দ হচ্ছে। স্থানীয় অঞ্চলের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের রূপরেখা তৈরির পাশাপাশি চলছে কিছু কাজও।

এই অরণ্য অঞ্চলের জনজাতিগুলির ইতিহাসের ওপরই বর্তমান ও ভবিষ্যতের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। তাঁদের সহজসরল জীবনযাপনের সুবিধা নিয়ে সুবিধাবাদী মানুষ দল বেঁধে যে উন্নয়নের কথা বলেন, দেখতে হবে তাতে কার লাভ হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে এইসব অঞ্চলে যাঁরা আছেন তাঁদের অভ্যস্ত জীবন-স্বাচ্ছন্দ্য যেন কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

পাহাড়ের অরণ্য অঞ্চলের সঙ্গে মালভূমি জঙ্গলমহলের সাদৃশ্য নেই। আবার সমুদ্র-সংলগ্ন অরণ্য অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য আলাদা। এই বিভিন্ন ভূ-প্রাকৃতিক অরণ্যের সঙ্গে জনজাতিগুলির মানুষের বৈশিষ্ট্যগত অর্থাৎ নৃতাত্ত্বিক ফারাকও লক্ষণীয়।

শ্রীখোলার পথে

ছবি - কাজল বিশ্বাস

নতুন সাজে শুশুনিয়ার 'মরুৎবাহা'

অরণ্য অঞ্চলের বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন জল-আবহাওয়ার কারণে উদ্ভিদ ও প্রাণের যেমন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, মানুষ এবং তাঁদের জীবনযাপন ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যও আলাদা। তাঁদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ আর্থিক উন্নয়নের চরিত্র এবং গতিও ভিন্ন।

অরণ্যের মধ্যে যাঁরা থাকেন তাঁদের অর্থনীতি অরণ্য-নির্ভরই ছিল। অরণ্যের পশু-পাখি শিকার করে একসময় তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করতেন। আজও এই শ্রেণির লোকেরা এইভাবেই জীবন কাটাতে চান। কিন্তু অরণ্য অর্থাৎ গাছপালা ও জীবজন্তু বাঁচাবার প্রয়োজনেই এর সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাই অরণ্যের মধ্যে বসবাসকারী ও সংলগ্ন অঞ্চলের মানুষের দ্বারা যাতে অরণ্য ও বন্যপ্রাণ ধ্বংস না হয় সেদিকে নজর দেওয়া জরুরী হয়ে উঠেছে। এই উদ্দেশ্যে যৌথ বন সংরক্ষণ কমিটির মাধ্যমে কাজ চলছে। কিন্তু মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি না হলে অরণ্যের ক্ষতি হবেই, আটকানো যাবে না। প্রয়োজন বিকল্প অর্থনীতির। প্রয়োজন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ-পরবর্তী স্তরে জীবিকার সুযোগ।

অরণ্যনির্ভর অর্থনীতির ক্ষেত্রেও নানা প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। কোনও কোনও অঞ্চলে এই ধরনের কাজও চলছে। মৌমাছি পালন এক্ষেত্রে একটি সফল উদ্যোগ হিসেবে প্রমাণ রেখেছে। বিভিন্ন ধরনের প্রাণীপালন, তুঁতের চাষ ও পশুপালন, ভেষজ উদ্ভিদের চাষ, সাবাই ঘাসের চাষ, উদ্যানপালন, ওষধি গাছের চাষ স্থানীয় মানুষের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে না পারলেও তাঁদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের প্রাথমিক শর্ত পূরণ করতে পারবে, যা তাঁদের সম্মানজনকভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখাবে।

আজ বিদ্যুৎ সর্বত্র পৌঁছেছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সকলেই

ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ির হুদহুদির ঝরনা

পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়

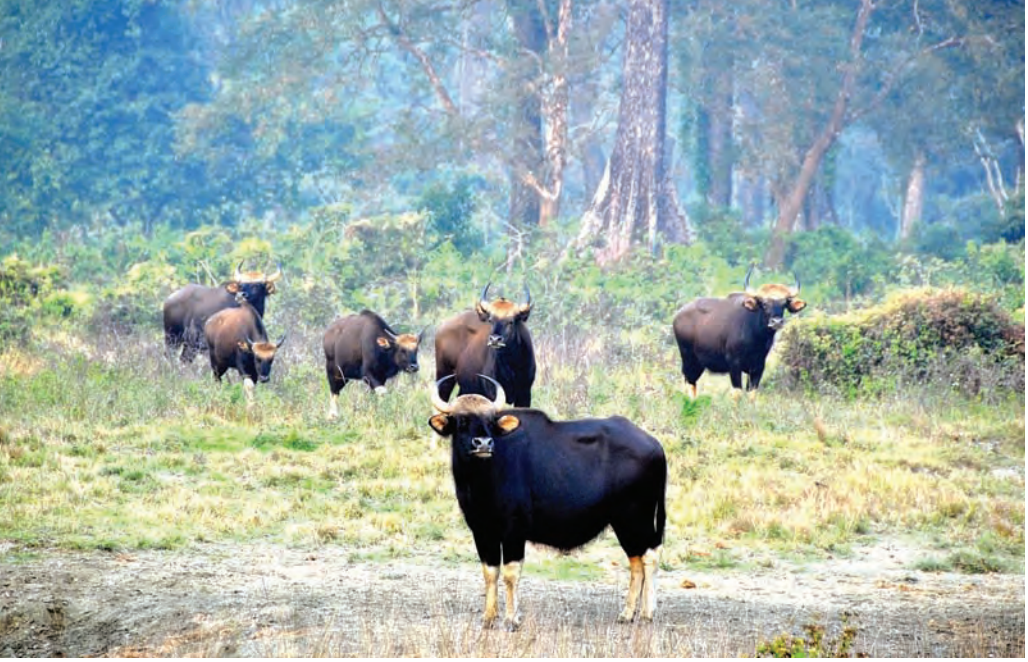

পরিষেবা পাচ্ছেন। পানীয় জলও সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার কাজ প্রায় সমাপ্ত।

কিন্তু দেখতে হবে, অরণ্যের মানুষ এর ফলে কতটা উপকৃত হচ্ছে।

অরণ্য অঞ্চলের জল ওষধি-গুণ সমৃদ্ধ। ঝরনা বা ঝোরা থেকে যে জল পাওয়া যায়, সেই জল বিশুদ্ধভাবে বোতল বন্দী করে স্থানীয় মানুষের কাছে সুলভ করে তোলা যায়। এর ফলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নারী-পুরুষ কাজ পায়। প্রাকৃতিক-সম্পদের মাধ্যমে সহজে আয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বর্ষার প্রবল জলকে ধরে রাখা যেতে পারে 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পের মাধ্যমে। পুকুর কেটে জল ভরা ছাড়াও জল ভরে রাখার অন্য কোনও ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে। এই জল ধরে রেখে সারা বছর চাষ, উদ্যানপালন, প্রাণীপালন ও দৈনন্দিন কাজকর্ম করা যেতে পারে।

অরণ্য অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষদের দিয়ে ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে অনেক কিছুই করা সম্ভব। এর ফলে স্থায়ী উন্নয়ন হতেই পারে। নতুন করে অরণ্য অঞ্চল তৈরি করাও খুবই জরুরি, অরণ্যের সম্প্রসারণের জন্য।

নতুন গাছ লাগাতে হবে, পরিচর্যা করতে হবে, নতুন চারা তৈরি করতে হবে। এই বিপুল কর্মকাণ্ডে অরণ্য অঞ্চলের মানুষের কর্মসংস্থান স্বাভাবিকভাবেই হবে, হচ্ছেও। তবে যতটা হওয়ার দরকার ততটা হচ্ছে না। দরকার কড়া নজরদারি। চোরাকারবারীদের কঠোরভাবে আটকাতে হবে। অরণ্যসম্পদের পাচার শুধু আর্থিক ক্ষতি নয়। প্রাকৃতিক ভারসাম্যের

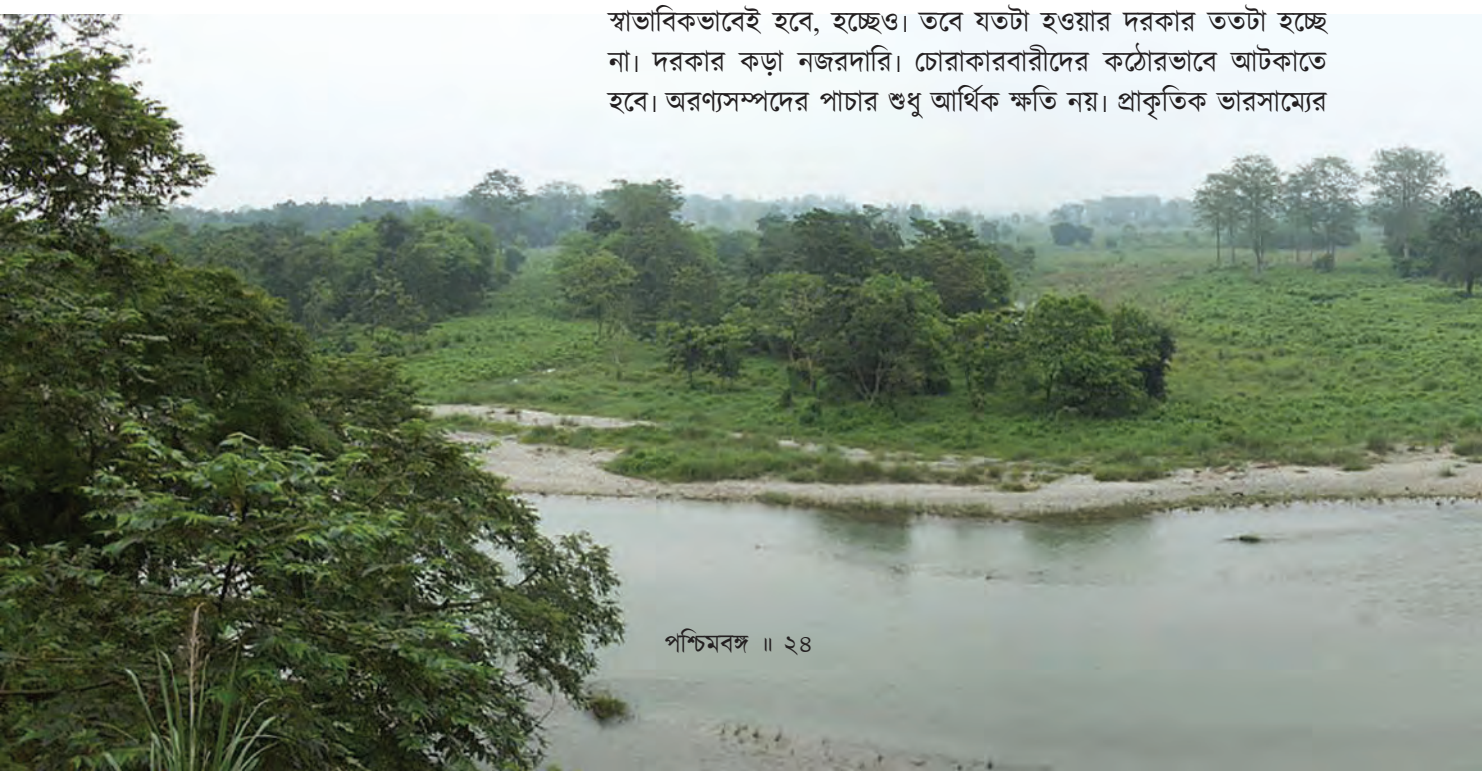

ওপর বিরাট আঘাত। এই লোভী হাতকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে হবে। এই পাচার-চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে স্থানীয় কিছু মানুষ। তাই প্রয়োজন, স্থানীয় মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতার প্রচার ও প্রসার। প্রয়োজন, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা। স্থানীয় মানুষের আর্থিক উন্নতি না হলে এইসব সমস্যার আশু সমাধান হবে না।

অরণ্যের মধ্যে ও পাশে অবস্থানকারী জনজাতিগুলির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক-রীতি, নীতি, প্রথা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ভাবনা আলাদা। গোষ্ঠীগত, ভাষাগত পার্থক্যও বিদ্যমান। তাঁদের মৌখিক ও লিখিত সাহিত্যও মূল্যবান। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিসও আলাদা। সবই মানবসভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে বিশেষ মূল্যবান। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনও সরকারি বিভাগের মাধ্যমে এই বিবর্তনের ধারাকে নিয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি চোখে পড়ছে না। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কাজ হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু সামগ্রিকভাবে কাজের ক্ষেত্রে এখনও তেমন কোনও একক উদ্যোগ বিশেষভাবে নজর কাড়েনি। এব্যাপারে আরও কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

প্রয়োজন রাজ্যের বাকি অঞ্চলের মানুষদের এবং বহিরাগত পর্যটকদেরও আরও অরণ্যমুখী করে তোলা। প্রকৃতি-পর্যটনের বিপুল সম্ভবনাকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের নতুন অভিমুখ গড়ে তুলতে হবে।

এই নিবন্ধের সঙ্গে সংযোজিত হল পশ্চিমবঙ্গের অরণ্য ও বন্যপ্রাণ সম্পর্কে একটি মানচিত্র, রাজ্যের বিভিন্ন ধরনের স্থানের বিভিন্ন ধরণের অরণ্যের তালিকা ও মানচিত্র।

গরুমারা অভয়ারণ্য

পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র-এ

জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য, বাঘ সংরক্ষণ এলাকা, হাতি সংরক্ষণ এলাকা, জলপ্রপাত বা ঝরনা, লেক, ইকো টুরিজম, ফরেস্ট রেস্ট হাউস, জলাভূমি, প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, চিড়িয়াখানা, পার্ক এবং উদ্যান, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কেন্দ্র, প্রশাসনিক ভবন এবং অন্যান্য অরণ্য কেন্দ্র

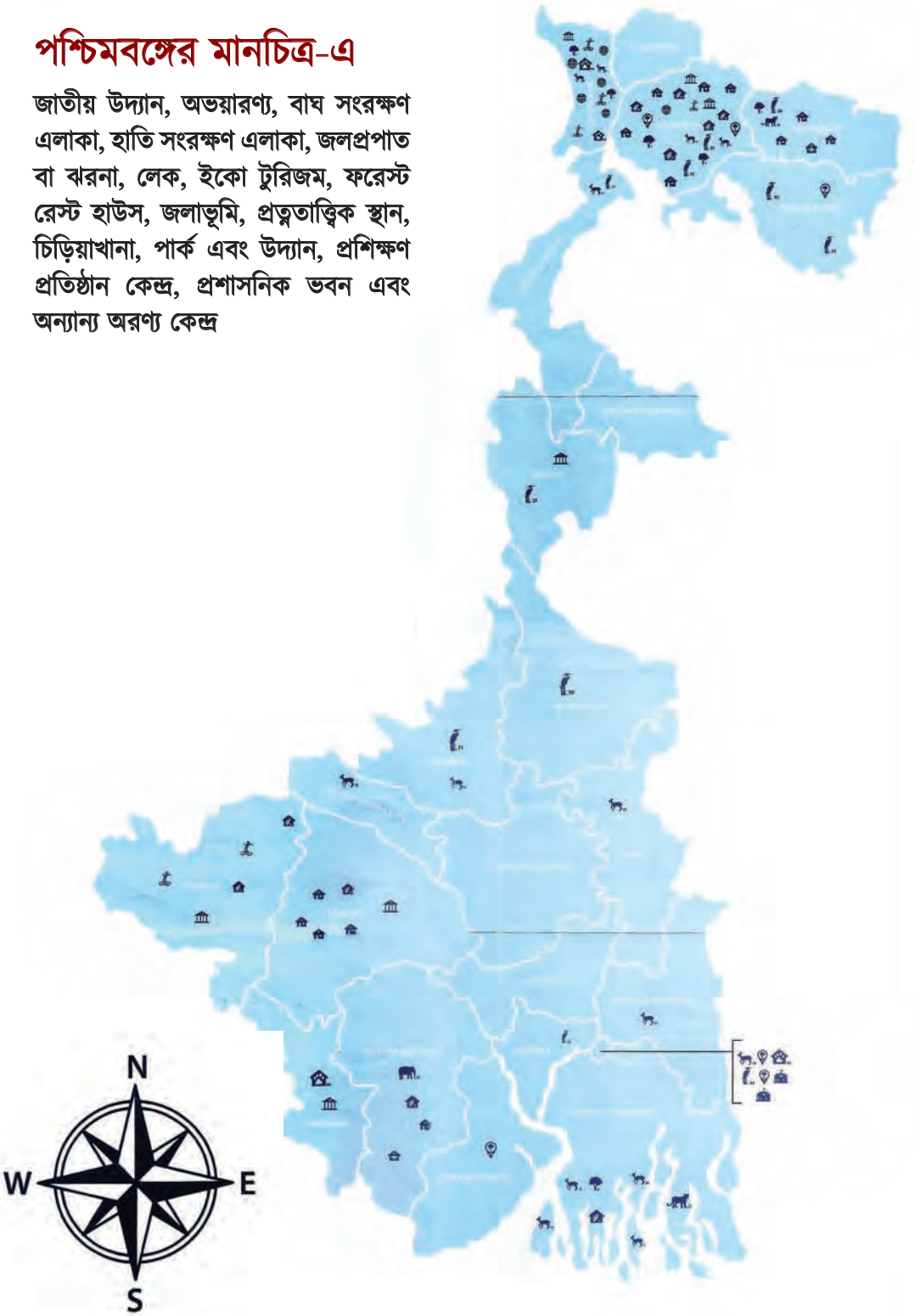

জাতীয় উদ্যান

(১) সিঙ্গালীলা
(২) নেওড়া ভ্যালি
(৩) বক্সা
(৪) গরুমারা
(৫) জলদাপাড়া
(৬) সুন্দরবন

অভয়ারণ্য

(৭) জোড়পোখরি সালামন্দর
(৮) সেঞ্চল
(৯) চাপরামারি
(১০) মহানন্দা
(১১) কুলিক
(১২) বেথুয়াডহরি
(১৩) বল্লভপুর
(১৪) রমনা বাগান
(১৫) বিভূতিভূষণ অভয়ারণ্য
(১৬) চিন্তামণি কর পক্ষী অভয়ারণ্য
(১৭) সজনেখালি
(১৮) হ্যালিডে আইল্যান্ড
(১৯) লোথিয়ান আইল্যান্ড
(২০) পশ্চিম সুন্দরবন

ব্যাঘ্র প্রকল্প

(২১) বক্সা
(২২) সুন্দরবন

হাতি প্রকল্প

(২৩) ময়ুর ঝরনা

জলাভূমি

(২৪) গরাতি
(২৫) চুকচুকি
(২৬) সাঁতরাগাছি
(২৭) কুলিক
(২৮) নারাথালি
(২৯) পরান পুকুর
(৩০) বল্লভপুর
(৩১) আহিরন বিল
(৩২) পূর্ব কলকাতার জলাভূমি
(৩৩) রসিকবিল
(৩৪) রসামাটি

লেক

(৩৫) জোড়পোখরি
(৩৬) টেমপোলা
(৩৭) সেঞ্চল
(৩৮) মিরিক
(৩৯) কালিপোখরি
(৪০) গাজলডোবা

জলপ্রপাত

(৪১) ছাঙ্গে
(৪২) পাগলাঝোরা
(৪৩) হুইসেলখোলা
(৪৪) মহাকাল
(৪৫) বামনি
(৪৬) তুর্গা

ইকো টুরিজম স্পট

(৪৭) ধূপঝোরা
(৪৮) রাইনো ক্যাম্প
(৪৯) কালিপুর
(৫০) চাপরামারি
(৫১) হলং
(৫২) দুয়ারসিনি
(৫৩) গোপগড়
(৫৪) শুশুনিয়া
(৫৫) গড়পঞ্চকোট
(৫৬) বন্নি ক্যাম্প

বন বিশ্রামাগার

(৫৭) জয়ন্তি
(৫৮) রাজাভাতখাওয়া
(৫৯) হাতিপোতা
(৬০) নীলপাড়া
(৬১) হলং
(৬২) গরুমারা
(৬৩) চাপরামারি
(৬৪) রায়ডাক
(৬৫) বেলিয়াতোর
(৬৬) শুশুনিয়া
(৬৭) গোয়ালতোড়
(৬৮) বেলপাহাড়ি
(৬৯) হিজলি

প্রত্নতাত্ত্বিক কেন্দ্র

(৭০) জোড়বাংলা
(৭১) আদিনা মসজিদ
(৭২) পঞ্চরত্ন মন্দির
(৭৩) কনক দুর্গা মন্দির
(৭৪) নল রাজার গড়
(৭৫) টাইগার হিল
(৭৬) জটিলেশ্বর মন্দির

পার্ক এবং গার্ডেন

(৭৭) সেন্ট্রাল পার্ক (বনবিতান)
(৭৮) ইডেন গার্ডেন্স
(৭৯) পরিমল গার্ডেন
(৮০) তিস্তা উদ্যান
(৮১) মাল উদ্যান
(৮২) এন. এন. পার্ক

চিড়িয়াখানা

(৮৩) আলিপুর
(৮৪) পদ্মজা নাইডু
(৮৫) ঝাড়গ্রাম
(৮৬) বেঙ্গল সাফারি

ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

(৮৭) হিজলি
(৮৮) ফরেস্ট্রি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

প্রশাসনিক ভবন

(৮৯) অরণ্য ভবন
(৯০) বন ভবন

রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের অরণ্য : তালিকা ও মানচিত্র

	অরণ্যের ধরণ	কোন অঞ্চলে/ জেলায়
১	সাব হিমালয়ান সেকেন্ডারি ওয়েট মিক্সড ফরেস্ট	জলপাইগুড়ি জেলা
২	ইস্ট হিমালয়ান শাল ফরেস্ট	দার্জিলিং জেলায় মহানন্দার নীচের দিকের ঢাল-সহ পাহাড়ের উচ্চশিরার মাঝের কিছু ঢাল এবং শিখর অঞ্চলে
৩	ইস্ট হিমালয়ান আপার ভাবার শাল ফরেস্ট	জলপাইগুড়ি জেলা
৪	ইস্ট হিমালয়ান লোয়ার ভাবার শাল ফরেস্ট	জলপাইগুড়ি জেলা
৫	ইস্টার্ন তরাই শাল ফরেস্ট	জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশন
৬	ইস্টার্ন হেভি অ্যালুভিয়াম প্লেন শাল ফরেস্ট	মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা
৭	ময়েস্ট শাল সাভানা	জলপাইগুড়ি জেলা
৮	ওয়েস্ট গ্যাঙ্গেটিক ময়েস্ট মিক্সড ডেসিডুয়াস ফরেস্ট	নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলা
৯	ইস্ট হিমালয়ান ময়েস্ট মিক্সড ডেসিডুয়াস ফরেস্ট	দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা
১০	সেকেন্ডারি ইউফোরবিয়াসিয়াস স্ক্রাব	জলপাইগুড়ি জেলা
১১	লো অ্যালুভিয়াল সাভানা উডল্যান্ড	জলপাইগুড়ি জেলা
১২	ম্যানগ্রোভ স্ক্রাব	উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা
১৩	ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট	উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা
১৪	সল্ট ওয়াটার মিক্সড ফরেস্ট	উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা
১৫	ব্র্যাকিশ ওয়াটার মিক্সড ফরেস্ট	উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা-সহ সুন্দরবনের পশ্চিমাঞ্চল
১৬	পাম সোয়াম্প ফরেস্ট	উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার ম্যানগ্রোভ অঞ্চল
১৭	সাব-মন্টেন হিল-ভ্যালি সোয়াম্প ফরেস্ট	কোচবিহার জেলা
১৮	ব্যারিংটোনিয়া সোয়াম্প ফরেস্ট	মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা
১৯	ইস্টার্ন ওয়েস্ট অ্যালুভিয়াল গ্র্যাসল্যান্ড	জলপাইগুড়ি জেলার পলিমাটি অঞ্চল
২০	ড্রাই পেনিনসুলার শাল ফরেস্ট	পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলা
২১	নর্দার্ন ড্রাই মিক্সড ডেসিডুয়াস ফরেস্ট	পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলা
২২	ড্রাই ডেসিডুয়াস স্ক্রাব	পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম জেলা
২৩	বুটি ফরেস্ট	পুরুলিয়া জেলা
২৪	খয়ের-শিশু ফরেস্ট	জলপাইগুড়ি জেলা
২৫	ইস্ট হিমালয়ান সাবট্রপিক্যাল ওয়েট হিল ফরেস্ট	দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা
২৬	লরাসিয়াস ফরেস্ট	দার্জিলিং জেলা
২৭	বাক ওক ফরেস্ট	দার্জিলিং জেলা
২৮	হাই লেভেল ওক ফরেস্ট	দার্জিলিং জেলার ২১০০-২৪০০ মিটার উচ্চতায়
২৯	ইস্ট হিমালয়ান মিক্সড কনিফেরাস ফরেস্ট	দার্জিলিং জেলা
৩০	ইস্ট হিমালয়ান সাব-আলপাইন বির্চ/ফার ফরেস্ট	দার্জিলিং জেলা

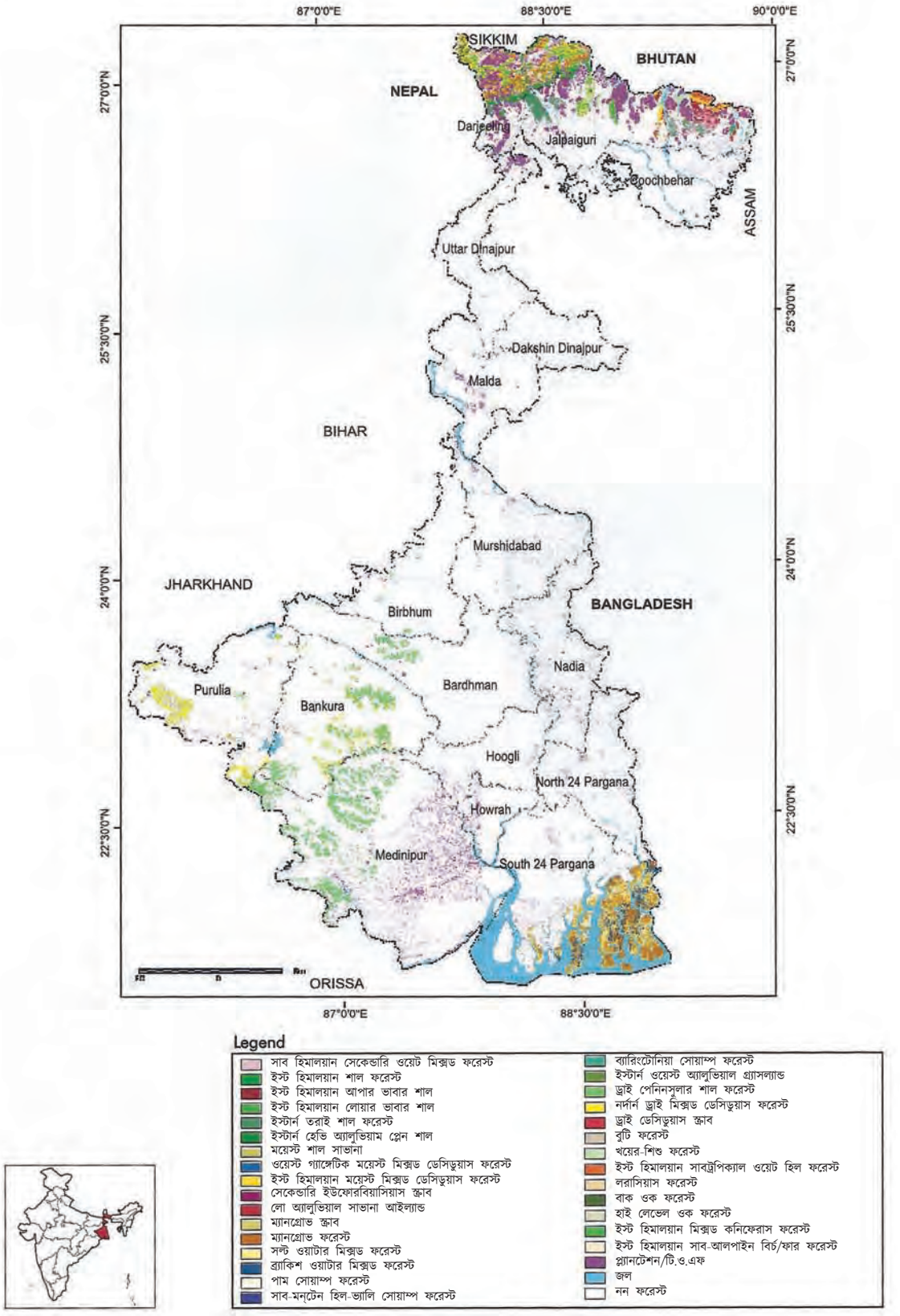
87°0'0"E
88°30'0"E
90°0'0"E
27°0'0"N
25°30'0"N
24°0'0"N
22°30'0"N
SIKKIM
BHUTAN
NEPAL
Darjeeling
Jalpaiguri
Coochbehar
ASSAM
Uttar Dinajpur
Dakshin Dinajpur
Malda
BIHAR
Murshidabad
JHARKHAND
BANGLADESH
Birbhum
Nadia
Purulia
Bardhman
Bankura
Hoogli
North 24 Pargana
Howrah
Medinipur
South 24 Pargana
ORISSA
Legend
সাব হিমালয়ান সেকেন্ডারি ওয়েট মিক্সড ফরেস্ট
ইস্ট হিমালয়ান শাল ফরেস্ট
ইস্ট হিমালয়ান আপার ভাবার শাল
ইস্ট হিমালয়ান লোয়ার ভাবার শাল
ইস্টার্ন তরাই শাল ফরেস্ট
ইস্টার্ন হেভি অ্যালুভিয়াম প্লেন শাল
ময়েস্ট শাল সাভানা
ওয়েস্ট গ্যাঙ্গেটিক ময়েস্ট মিক্সড ডেসিডুয়াস ফরেস্ট
ইস্ট হিমালয়ান ময়েস্ট মিক্সড ডেসিডুয়াস ফরেস্ট
সেকেন্ডারি ইউফোরবিয়াসিয়াস স্ক্রাব
লো অ্যালুভিয়াল সাভানা আইল্যান্ড
ম্যানগ্রোভ স্ক্রাব
ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট
সল্ট ওয়াটার মিক্সড ফরেস্ট
ব্র্যাকিশ ওয়াটার মিক্সড ফরেস্ট
পাম সোয়াম্প ফরেস্ট
সাব-মন্টেন হিল-ভ্যালি সোয়াম্প ফরেস্ট
ব্যারিংটোনিয়া সোয়াম্প ফরেস্ট
ইস্টার্ন ওয়েস্ট অ্যালুভিয়াল গ্র্যাসল্যান্ড
ড্রাই পেনিনসুলার শাল ফরেস্ট
নর্দার্ন ড্রাই মিক্সড ডেসিডুয়াস ফরেস্ট
ড্রাই ডেসিডুয়াস স্ক্রাব
বুটি ফরেস্ট
খয়ের-শিশু ফরেস্ট
ইস্ট হিমালয়ান সাবট্রপিক্যাল ওয়েট হিল ফরেস্ট
লরাসিয়াস ফরেস্ট
বাক ওক ফরেস্ট
হাই লেভেল ওক ফরেস্ট
ইস্ট হিমালয়ান মিক্সড কনিফেরাস ফরেস্ট
ইস্ট হিমালয়ান সাব-আলপাইন বির্চ/ফার ফরেস্ট
প্ল্যানটেশন/টি.ও.এফ
জল
নন ফরেস্ট

উত্তরের অরণ্যবাংলা

উত্তরের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এই চার জেলা অসাধারণ করে তুলেছে অরণ্যবাংলাকে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে এই জেলাগুলিকে নিয়ে উত্তরের অরণ্যবাংলাকে ধরার চেষ্টা হয়েছে।

দার্জিলিং

পৃথিবীতে এমন বৈচিত্র্যময় সম্ভার নিয়ে খুব কম অরণ্যই আছে। তাই দার্জিলিং-এর অরণ্য বিশিষ্টতায় অনন্য। ভারত বা বাংলাই নয়, পৃথিবীর বৈচিত্রময় অরণ্য সম্পদের দিক দিয়ে দার্জিলিং-এর স্থান অনন্য। একটি সীমিত পরিসরে এত রকমের বৈচিত্র্য নিয়ে সেজে আছে দার্জিলিং-এর অরণ্য, ভাবতে অবাক লাগে। এই অরণ্যে দিনযাপন তাই বিশেষভাবে আকর্ষণীয়, যার টানে বিশ্বের মানুষ ভিড় জমায়।

ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার ইতিহাসটুকু একটু ঝালিয়ে নিতে হবে এই অরণ্যবাংলাকে খুঁজে নিতে গেলে। কখনও বা ব্রিটিশ-পূর্ব ভারতের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোল বা ভূতত্ত্ব যে কতটা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে সেটাও বোঝা যাবে।

অরণ্যবাংলা কেবলই শুধু অরণ্য ভ্রমণের কথাই বলে না। বাংলার আর্থ-সামাজিক বিষয়টিও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

উত্তরের দার্জিলিং বা দক্ষিণের সুন্দরবন—পাহাড় বা সমুদ্রের অরণ্য-অধ্যুষিত এইসব অঞ্চলের অনেক কিছু ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের শিরোপা নিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে অবস্থান করছে।

একটু বিস্তৃতভাবে আমাদের জানা দরকার এইসব ইতিহাস।

দার্জিলিং-এর টয় ট্রেন বিশ্ব-ঐতিহ্যের শিরোপায় ভূষিত। দেশ-বিদেশের মানুষ আসেন দার্জিলিং-এ এই টয় ট্রেন চড়ে এখানকার অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে। পাহাড়ি অরণ্যের বুক চিরে ধোঁয়া উড়িয়ে ছোট্ট ছোট্ট কাঠের বাংলোর পাশ কাটিয়ে চলছে ট্রেন। দূরে দিগন্তবিস্তৃত পাহাড়, রুপোলি কাঞ্চনজঙ্ঘা, পাইন, ফার, দেবদারুর অরণ্য।

আজকের যে দার্জিলিং দেখছি কীভাবে তা গড়ে উঠল জানতে ইচ্ছে করে বইকি। কেমন ছিল এই অঞ্চল, কারা এমন সুন্দর করে গড়ে তুলল এই শহর। প্রশ্নের পর প্রশ্ন এসে জড়ো হয়।

ইংরেজরা ভারতে তাদের রাজত্ব বিস্তারের কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করেছিল। কারণ তাদের চোখে তখন সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন।

ইংল্যান্ড একটি ছোট্ট দ্বীপ। সামান্য ভূমিখণ্ড তাদের। যখন তারা ভারতের বিশাল ভূমির সন্ধান পেল, স্বভাবতই তাদের চোখে তখন বিশাল ভূমি দখলের স্বপ্ন।

তাই দেখি, প্রথম থেকেই তারা নজর দিল অরণ্য-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির দিকে। আমরা যেন কখনও ভুলে না যাই যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখানে এসেছিল ব্যবসা করতে। অর্থই তাদের কাছে প্রধান বিষয়।

নিজের দেশ ছেড়ে একের পর এক ইংরেজ এসে পাড়ি জমাচ্ছে ভারতে। যে ভারতের আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল। দীর্ঘ সময় ধরে জাহাজে আসতে আসতে কত ইংরেজ যুবক অসুস্থ হয়ে পড়ছে, মারা যাচ্ছে বেঘোরে। তবু আসার বিরাম নেই। এর থেকেই বোঝা যায় জীবন হাতে করে যে যুবকেরা এখানে আসত, তারা কতটা নিরুপায় ছিল।

পানীয় জল নেই, আলো নেই, থাকার জায়গা নেই, কথা বলার ও শোনার লোক নেই। যে জীবনে তারা অভ্যস্ত ছিল, কিছুই নেই এখানে। তবু তারা আসছে।

এইভাবেই কলকাতার তিনটে গ্রামকে কিনে যে স্বপ্নপূরণের কাজ শুরু হল, ধীরে ধীরে এই কলকাতা থেকেই বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত হল।

একের পর এক জীবন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। কিন্তু কোম্পানির উদ্দেশ্য টাল খাচ্ছে না। ধীরে ধীরে তারা তাদের সুস্থভাবে বাঁচার পরিবেশ তৈরি করতে লাগল।

একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলল বিস্তৃত সাম্রাজ্য। এই অসাধারণ কাজটি কীভাবে সম্ভব হয়েছিল, তার খুঁটিনাটি বিবরণ আমাদের চমকে দেয় আজও। আর এর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে অরণ্যবাংলার অনেকগুলি অধ্যায়।

ইংরেজরা ভারতের নানা প্রান্তে গড়ে তুলেছিল শৈলশহর। দার্জিলিংও তার একটি। দার্জিলিং-এর ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান চতুর ইংরেজের কাছে সঠিকভাবেই ধরা পড়েছিল।

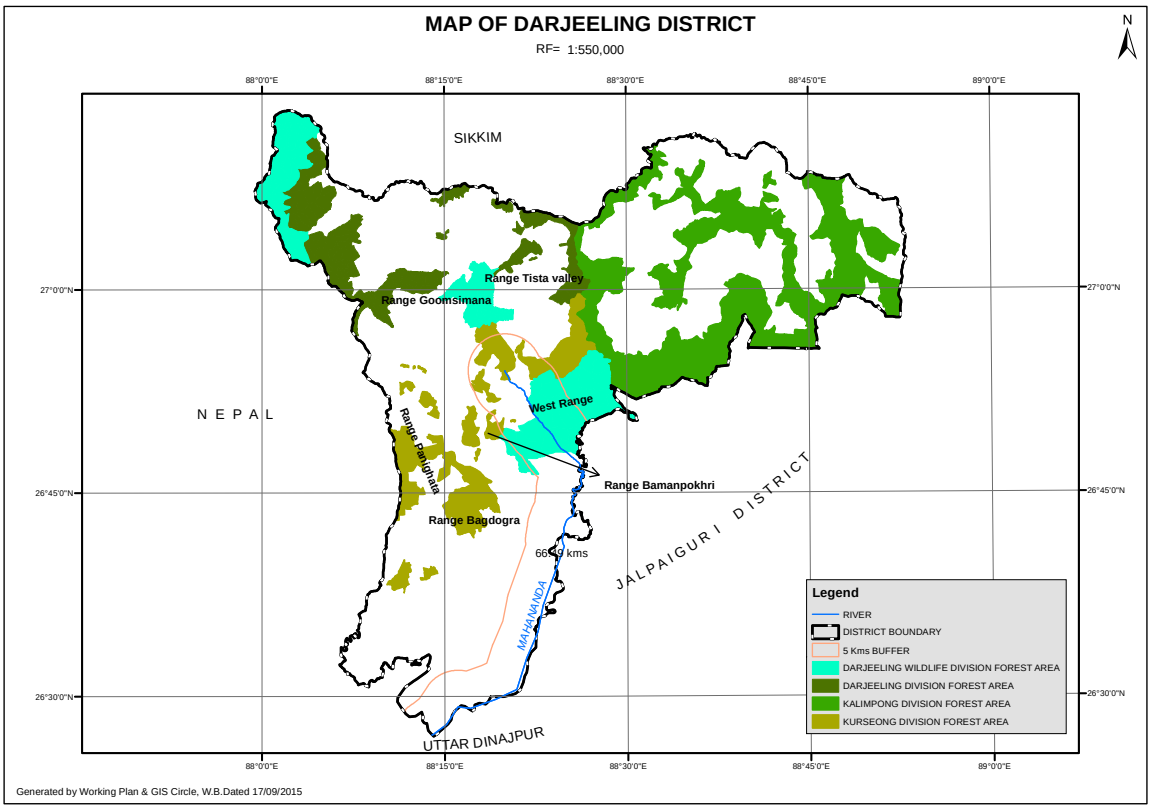

The name Darjeeling is a corruption of dorje, the precious stone or ecclesiastical scepter, which is emblematic of the thunderbolt of Sakhra (Indra) and of ling, a place. It means therefore the place of the dorje, the mistic thunderbolt of the Lamaist religion, the being the name by which the Buddhist monastery which once stood on Observatory Hill was formerly known. এই কথাই জানতে পারি Omally's District Gazetteer of Darjeeling থেকে।

সিঙ্গলীলা পর্বতমালা পশ্চিমে নেপাল থেকে দার্জিলিংকে আলাদা করেছে। উত্তর-পূর্বে জলঢাকা নদী, দক্ষিণ-পূর্বে জলপাইগুড়ি, দক্ষিণে পূর্ণিয়া। সমুদ্র-তল থেকে ৩০০ ফুট থেকে ১২,০০০ ফুট উচ্চতার। এই অংশের মূল তাৎপর্য ছিল রাজনৈতিক। এই তরাই অঞ্চল হিমালয়ের পাদদেশ ধরে প্রসারিত, ভৌগোলিকভাবে, ভারতের সমভূমিরই অংশ এটি। কিন্তু ভূতাত্ত্বিকভাবে বলা হত *it is sort of natural country*—পলিগঠিত সমভূমিও নয়, পাথুরে পাহাড়ও নয়, কিন্তু একটা বড়ো অংশ বালি, ছোটো পাথর এবং পর্বত থেকে নেমে আসা বোল্ডার দিয়ে তৈরি। উদ্ভিদবিদ্যার দিক থেকে বলা যায়, এটি অরণ্য অঞ্চল, শালই প্রধান গাছ। ৬০০০ থেকে ১০,০০০ ফুট উচ্চতায় সালের বৈচিত্র্যময় অবস্থান। এক কথায় এই অঞ্চল *Series of long ridges and valleys.*

এই অঞ্চল সিকিমের রাজার অধীন ছিল। তখন যুদ্ধপ্রিয় গোর্খারা এই অঞ্চলের দখলের জন্য ব্যস্ত। রাজা তাদের প্রতিহত করে চলেছে। নেপালের পাহাড় এবং উপত্যকার দখল নেওয়ার পর ১৭৮০-তে পূর্ব

সিকিমের দিকে তারা এগিয়ে যায়। তারপর ৩০ বছর ধরে বারবার এই আক্রমণ চলে। এরপর সিকিমও তারা দখল করে। তিস্তার দিক থেকে পূর্বমুখী এই আক্রমণ চলে। তরাইও দখল করে নেয়।

এর মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নেপালিদের এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয় (১৮১৪)।

সিকিমের রাজার থেকে যে অংশ তারা দখলে নিয়েছিল তা কোম্পানির হাতে আসে এবং কোম্পানি সিকিমের রাজার সঙ্গে চুক্তি করে ফিরিয়ে দেয় (১৮১৭)। মেচি এবং তিস্তার মাঝের এই সমগ্র অঞ্চল আবার সিকিমের হাতে আসে। এই ৪০০০ বর্গমাইল অঞ্চলের সার্বভৌমত্ব সিকিমের রাজার হাতেই থাকবে—এই নিশ্চয়তা দেয় কোম্পানি। ব্রিটিশের হস্তক্ষেপে গোর্খাদের হাত থেকে সমগ্র সিকিম এবং তিস্তার পশ্চিম এবং দক্ষিণ অংশ রক্ষা পেল নেপালের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে। নেপাল এবং ভুটানের মাঝখানে একটি buffer state-এর ভূমিকা নিল।

গোর্খাদের প্রতিরোধ করার এই সাফল্য কোম্পানির শক্তি বাড়াল।

সিকিমের রাজা স্বভাবতই কোম্পানির অনুগত হয়ে পড়ল। কোম্পানি সিকিমে তাদের স্থায়ী আসন পেতে ফেলল। রাজা নেপাল বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সঙ্গে যে কোনও বিবাদেই কোম্পানির ওপর নির্ভরশীল থাকল। দশ বছর বাদে সিকিমের সঙ্গে নেপালের বিবাদ বাধল। চুক্তির শর্ত হিসেবে গভর্নর-জেনারেলকে জানানো হয়। ১৮২৮-এ জেনারেল (তখন ক্যাপ্টেন) লয়েড একটা সমাধানের জন্য ডেপুটেড হলেন। জে ডব্লিউ গ্র্যান্ট, মালদার কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের সঙ্গে তিনি পাহাড়ে এলেন। এই ঘটনাকে 'Terra incognita' বলা হয়। এই আগমনের সময় 'দার্জিলিং' তাঁদের নজর কাড়ে।

১৮২৯ সালের ১৭ জুন-এর একটি রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে— We learn that Lyoyd Visited 'the old Gorkha Station called Darjeeling for six days in February 1829 and was immediately struck with its being well adopted for the purpose of a sanatorium।

লয়েড দেখলেন, শীতের দেশের মানুষ ইংরেজরা এই গরমের দেশে অর্থাৎ বাংলার সমতল অঞ্চলে এসে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাদের জন্য, এই আবহাওয়া অত্যন্ত উপযোগী। অর্থাৎ এরকম স্থানেই একটা স্যানাটোরিয়াম করা যায়। যেমন ভাবনা, তেমনি কাজ, শুধু স্যানাটোরিয়াম তৈরির কথাই নয়, লয়েড ও-গ্র্যান্ট-বেন্টিঙ্করা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টি দিয়েই সবটা দেখতে লাগলেন। দেখলেন, রাজনৈতিক দিক দিয়েও এই সীমান্তবর্তী অঞ্চল কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বের কথা ডিরেক্টরদের বোঝাতে তাঁদের বিশেষ বেগ পেতে হল না।

সবদিক বিবেচনা করে এই জায়গাটির দখল নেওয়ার জন্য জোর দিলেন লয়েড। মিঃ গ্র্যান্টও তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ককে এই অঞ্চলের গুরুত্ব বোঝালেন। এবার বোর্ড অব ডিরেক্টরদের বোঝানোর পালা শুরু হল।

অরণ্য-পাহাড়ের দার্জিলিং আশ্চর্যরকম সুন্দর। আর এই প্রথম নজর পড়ে ইংরেজদের। শীতের দেশের মানুষ ওরা। কলকাতা শহরের গরম থেকে যখন ওরা এমন সুন্দর অরণ্য-পাহাড়ের মাঝে গিয়ে হাজির হল, ওদের তখন নানা স্বপ্ন চাড়া দিল মাথায়।

ধীরে ধীরে গড়ে উঠল দার্জিলিং শহর—চা-বাগানকে কেন্দ্র করে বিশ্বের একটি সুন্দর শিল্প-শহর। ধুরন্ধর ইংরেজ যেভাবে দার্জিলিংকে কবজা করল তার ইতিহাসও বড়ো চমকপ্রদ। এই কলকাতা শহর থেকেই তো একটি অরণ্য-পাহাড়ের অঞ্চলকে ওইভাবে সাজিয়ে তুলল।

দার্জিলিং ধীরে ধীরে একটি জেলা হয়ে উঠল। প্রয়োজনের খাতিরে দার্জিলিং শহর গড়ে তুললেও বাকি অঞ্চলে তারা ততটা নজর দেয়নি। তাই আজও কিছু কিছু জায়গা একের পর এক ভ্রমণবিন্দু হয়ে উঠছে। সেসব অঞ্চল ঘনবসতি পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। যদিও পাহাড় ফাটিয়ে পথ হয়েছে, ধুলো ও ধোঁয়া উড়িয়ে চলছে ল্যান্ডরোভার। দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। কিন্তু মানুষের লোভের হাত থেকে আজও অনেকটা অরণ্য বেঁচে আছে, আছে অসাধারণ বৈচিত্র্য নিয়ে।

দার্জিলিং-এর বিভিন্ন জায়গার, নদীর, পর্বতের, শৃঙ্গের, গিরিপথের নামের উৎস খুঁজতে গিয়ে কর্নেল ওয়াডেল (Colonel Waddell) কিছু তথ্য পেলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির একটি জার্নালে (Vol. LX, Part-I, 1891) তিনি লিখছেন—"The oldest names he writes are found to be of Lepcha origin. The Lepchas from their wild forest life are born naturelists, possessing a name for nearly every natural product, animal or vegetable, whether of economic value or not.

যেখানে লেপচারা বসতি ছেড়ে চলে গিয়েছেন সেখানে এখনও লেপচা নামও চলে। অর্থাৎ দার্জিলিং-এর সঙ্গে লেপচা জনজাতির সম্পর্ক এক নতুন দিগন্তকে উন্মোচিত করে। ফিরে যেতে ইচ্ছে করে এর প্রাচীনতর ইতিহাসের খাঁজে খাঁজে।

বর্তমানে দার্জিলিং-এর একটি মহকুমাকে আলাদা করে একটি জেলা তৈরি হয়েছে, কালিম্পং। তাই এখন দার্জিলিং-এর দুটি অরণ্য ডিভিশন হল, (১) দার্জিলিং ও (২) কার্শিয়াং। অখণ্ডিত দার্জিলিং-এর অরণ্যই রাজ্যের অন্যান্য অরণ্য অঞ্চল থেকে আলাদা।

আট হাজার থেকে বারো হাজার ফুট উচ্চতায় রুপোলি ফারের অরণ্য। আছে রডোডেনড্রনের বিশাল বিস্তৃত অরণ্য। ছয় হাজার ফুট উচ্চতায় বাঁশবনের ঘন অরণ্য ছাড়িয়ে চেস্টনাট, ম্যাপল, ওক, ম্যাগনোলিয়া, লরেল-র বিশাল সমারোহ। চার হাজার ফুট উচ্চতায় পর্যাপ্ত পরিমাণে টুন গাছ দেখা যায়। জ্বালানি হিসেবে যার মূল্য যথেষ্ট। তিন হাজার ফুট উচ্চতায় শালবনের মাথা গগন ছুঁয়েছে। নিম্ন পার্বত্য এলাকায় শালই প্রধান। পশ্চিম থেকে পুবে চেল নদীর তীর পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। এখানে গিয়ে শালের অরণ্য হঠাৎই যেন থেমে গিয়েছে। যেন ভূ-তত্ত্বেই এর রহস্য আছে। শাল-অরণ্যর পর তরাই অঞ্চল। এই নিম্ন-পাদদেশে ও সংলগ্ন সমতলে নদীখাত, ঝোপ-জঙ্গল ও সাভানা অরণ্য। সাভানা এমন এক ধরনের ঘাস যার থেকে সহজে জঙ্গলে আগুন ছড়িয়ে যায়।

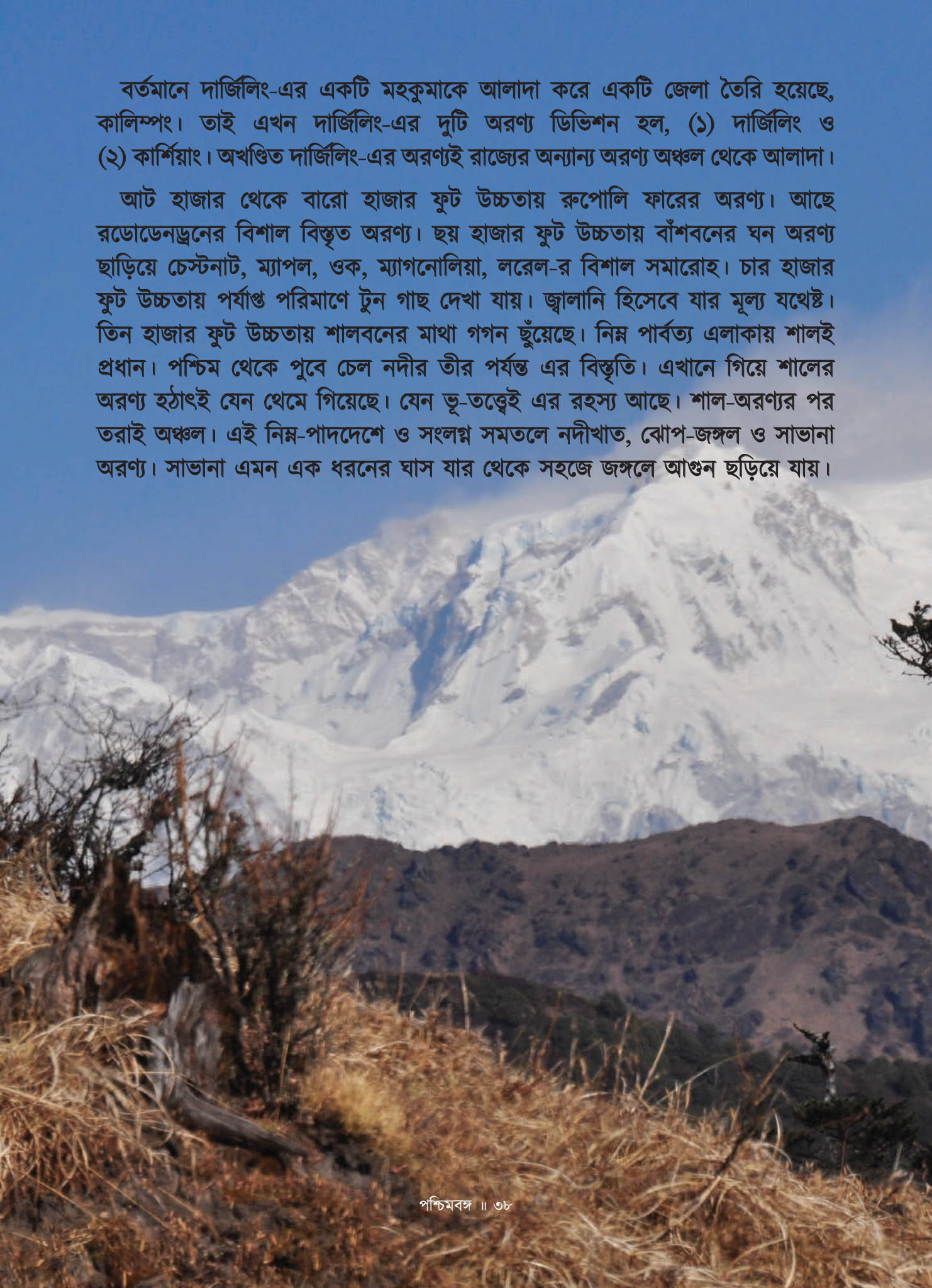

দার্জিলিং, কার্শিয়াং এবং তিস্তা ডিভিশন—প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে তিনটে ডিভিশনে ভাগ করা হয়েছিল একথা জানা যায় ওম্যালির গেজেটিয়ার থেকে। দার্জিলিং ডিভিশনে ৪টি পাহাড়ি রেঞ্জ। চারটি রেঞ্জ—(১) সিঙ্গলিলা—দক্ষিণমুখী হয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে জেলার পূর্ব সীমানা, (২) ঘুম রেঞ্জ—পশ্চিম থেকে ঘুমে, (৩) সেঞ্চল-মহালদিরাম রেঞ্জ—দক্ষিণ দিকে কার্শিয়াংমুখী, (৪) তাকদা রেঞ্জ—মূল সেঞ্চল রিজ থেকে ডানদিকে গিয়ে উত্তর-পূর্বমুখী দিকে তিস্তা-রঙ্গিতের মিলন। ছয় হাজার ফুটের ওপরে, তিন হাজার ফুটের নীচের মধ্যবর্তী রেঞ্জ ও ধাপে চা ও স্থানীয় মানুষের চাষাবাদ চলে।

কার্শিয়াং ডিভিশন পাহাড় এবং তরাই নিয়ে গঠিত। সাড়ে ছয় হাজার ফুট উচ্চতায় পাহাড় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, বৃহত্তর অংশ জুড়ে তিন হাজার ফুটের কম উচ্চতা। পুবে তিস্তা আর পশ্চিমে চামতা নদীর মাঝে পাহাড়ের পাদদেশ জুড়ে বিস্তীর্ণ অরণ্য। এই ডিভিশনের আরেকটি অরণ্য পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম জুড়ে পাহাড় ও তরাই জুড়ে যেন সিরিজ তৈরি করেছে—মেচির পশ্চিম পাড় অবধি, দার্জিলিং জেলা ও নেপালের মাঝে যেন সীমানা তৈরি করেছে এই নদী।

কালিম্পং

একসময়ের দার্জিলিং জেলার এক মহকুমা আজ নিজেই একটি জেলা। ছোট্ট কিন্তু ভারী সুন্দর। নামের মতোই। এই জেলার ঐতিহাসিক পটভূমি আরও মনকাড়া। এক সময়ের তিস্তা ডিভিশনের এই অঞ্চল নিজস্ব মাদকতায় অসাধারণ। অরণ্যবাংলার প্রাণভোমরা যেন এখানে ঘুমিয়ে আছে। তাই তো নতুন সরকার এই অপরূপ মনমুগ্ধকর জায়গাকে দিয়েছে অগ্রাধিকার। শুধু অরণ্য নয়, অরণ্যকেন্দ্রিক জীবনযাপন, সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে সংরক্ষণের তাগিদে জেলার মর্যাদা দিয়েছে কালিম্পংকে। এই জেলার প্রায় সব অঞ্চলই অরণ্যপ্রিয় পর্যটকদের আনাগোনায় বছরভর জেগে থাকে। এইসব অরণ্যকেন্দ্রিক পর্যটনস্থলগুলোই তুলে ধরা হল।

লাভা

কালিম্পং শহর থেকে আলগারা হয়ে ৩০ কিমি দূরে। ৭২০০ ফিট উচ্চতার এই ছোট্ট শহর লাভা। ফার, পাইন আর বার্চের ঘন অরণ্যের লাভায় শীতে জমিয়ে ঠাণ্ডা পড়ে। পড়ে বরফও। সিল্ক রুটের পথে এই লাভার পর্যটক আকর্ষণ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বেড়েছে। গরম ও শীত সারা বছর ধরেই এই অরণ্য-শহর জমজমাট। জলপাইগুড়ির মালবাজার, কালিম্পঙের ডামডিম-গরুবাথান হয়েও এখানে আসা বা ফেরা যায়।

লাভা শহর ছাড়িয়ে গুটি গুটি পায়ে হেঁটে হেঁটে চলে যাওয়া যায় নানা দিকে। অনেক বন্য জন্তুরও দেখা মেলে। নৈসর্গিক পরিবেশকে আরও গম্ভীর করে তুলছে বৌদ্ধ মনাস্ট্রি।

লাভা

রিশপ

TOURIST SPOTS OF KALIMPONG
Gangtok (40 KM)
Rangpo
Pedong
Sillery Gaon
Rishop
Algarah
Kolakham
Neora Valley National Park
Bindhu
Melli
Deolo
Lava
Teesta
Kalimpong
Relli
Jhalong
Jaldhakha
SH 12
Darjeeling (35 KM)
Loleygaon
Jhandi
Nimbong
Teesta
Neora
Murti
Jaldhakha
NH 10
Chel
Gorubathan
Geesh
Leesh
Kalijhora
Bagrakote
Mongpong
NH 17
Malbazaar (20 KM)
Coronation Bridge
Siliguri (20 KM)
Accomodation
Birdwatching
Forest
Angling
Bridge
Buddhist Monastery
Paragliding
Tea Garden
Rafting
Viewpoint

ন্যাওড়াভ্যালী জাতীয় উদ্যান

১৯৮৬ সালে কালিম্পং-এ নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানের শিরোপায় ভূষিত হয়। পূর্ব ভারতের এক অনাঘ্রাত অরণ্যের ভূমিকা পালন করছে ৮৮ বর্গ কিমির এই জাতীয় উদ্যান। কালিম্পং পাহাড়ের এই গভীর অরণ্য আজও জনসমাগমে প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠেনি। আজও অনেকটাই আরণ্যক ভীতি এর সঙ্গী। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। দূরে পাহাড়শৃঙ্গ। কোথাও সবুজ উপত্যকা, নদী, ঝোরা। খুব নিরাপদে বন্যপ্রাণের স্বর্গীয় আবাসভূমি।

নেওড়া নদীর এই উপত্যকার এলাকা বর্গ কিমি। এর অনেক অংশেই আজও মানুষের পা পড়েনি। তাই একে 'কুমারী অরণ্য'ও বলা হয়। গভীর বাঁশের বিস্তৃত অরণ্য যেমন আছে, তেমনি আছে রঙবেরঙের রডোডেনড্রন।

এই উপত্যকার সর্বোচ্চ পয়েন্ট রাচেলা দাড়া (১০,৬০০ ফুট), সিকিম ও ভূটান সীমান্তে। অসাধারণ জৈব-বৈচিত্রের নিরাপদ অবস্থান এই উপত্যকার সম্পদ।

লাভা থেকে পথ গিয়েছে উপত্যকায়। আরেক প্রান্তে সামসিং থেকে মৌচুকি বিট থেকে ঢোকা যায়। দুঃসাহসিক অভিযানের আরেক নাম নেওড়াভ্যালী জাতীয় উদ্যান।

ছাঙ্গে ফলস

চারশো ফিট উচ্চতা থেকে নামছে ঝরনা। শুধু ঝরনার শব্দই চারপাশ জুড়ে। এই ঝরনার গান শুনতে ছাঙ্গে ফলস যাচ্ছে পর্যটকরা। দূরত্ব লাভা থেকে ১৪ কিমি। অরণ্য-গভীরে চড়াই-উৎরাই ভেঙে গাড়িতে যেতে হবে। দূরে ম্যাজেস্টিক কাঞ্চনজঙ্ঘা। কত না পাখীর মেলা। কত না তাদের আওয়াজের, ডাকের, সুরের, কিচির-মিচিরের বৈশিষ্ট্য। চাঁদনি রাতে অপূর্ব এর অভিজ্ঞতা।

এ এক অচেনা কালিম্পং।

লোলেগাঁও

গভীর জঙ্গলের ওপর দিয়ে ১৮০ মিটার ক্যানোপি ওয়াক। অরণ্যবাংলার আরেক গা-ছমছমানো অভিজ্ঞতার স্বাদ নিতে যেতে হয় লোলেগাঁও। বন্যতা আর নির্জনতা যেন সমার্থক।

দড়ির সেতু ক্রমশ উপরে উঠে গিয়েছে, নিচে অরণ্য, পাখি ও অন্যান্য জন্তু জানোয়ার। এই উত্তরণের অনুভব সাধারণ পর্যটকদের কাছে রোমাঞ্চকর।

বেশ কয়েকটি ট্রেকিং রুট রয়েছে এ পথে। নিম্ন হিমালয়ের রূপ এখানে মন জয় করে নেয়। সাম্থার বা রেলি-র দিকে চলে যাওয়া যায়।

লোলেগাঁও-এ হেরিটেজ ফরেস্ট বা ঐতিহ্যের অরণ্যের স্বাদ আলাদা। এখান থেকেও কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং এভারেস্ট দেখা যায়। এই লেপচা গ্রাম অবসরের আরেক ঠিকানা প্রকৃত অর্থেই লোলেগাঁও যেন আনন্দের গ্রাম। এই আনন্দের উৎস যেন আজও লুকিয়ে আছে অনাবিল অরণ্য-সভ্যতায়।

বিন্দু ব্যারেজ—ভারত-ভূটান সীমান্তের মাঝে দাড়িয়ে ছবি : কাজল বিশ্বাস

রকি আইল্যান্ডের ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড : অন্তর্জাল

ঝালং–বিন্দু–সামসিং–সান্তালেখোলা–রকি আইল্যান্ড

চালসা যেন ডুয়ার্সের টুরিস্ট জংশন। শিলিগুড়ির মিত্তাল বাসস্ট্যান্ডের থেকে বাস যাচ্ছে মহানন্দা রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্য দিয়ে। সেবক-মাল পেরিয়ে চালসা বা গরুমারা থেকে খুনিয়া মোড় হয়ে চাপরামারির অরণ্যের মধ্যে দিয়ে পথ চলেছে ঝালং, বিন্দু। অরণ্য শেষে গোর্খা গ্রাম গৈরিবাস। সিঙ্কোনা, ইপিকাক, সর্পগন্ধা নানা ভেষজ উদ্ভিদের চাষ হয়। ভেষজ ওষুধও তৈরি হচ্ছে কারখানায়। গৈরিবাস থেকে চড়াই পথে ৬ কিমি গেলে ঝোলং খোলা ও জলঢাকার সঙ্গমে ঝালং। ১৯৬৭ সালে ভারতের প্রথম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলা হয় এখানে। ঝালং-এ সমতলজুড়ে গড়ে ওঠে প্রকল্প-কর্মীদের বসতি। এখানের আকাশ আশ্চর্য রকম নীলচে-কালো। দূরে জলঢাকা বইছে। ওপারে ভূটান পাহাড়।

ঝালং থেকে ১২ কিমি উত্তরে বিন্দু। ভুটানের তেন্ডু পাহাড়ের কোলে ভারত তথা বাংলার শেষ পাহাড়ি গ্রাম। ভুটান থেকে বিন্দু নদী এসেছে। এসে মিশছে জলঢাকায়। এখানেই বিন্দু ব্যারেজ তৈরি হয়েছে। পাশে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। অনুমতিতে দেখা যায় এই প্রকল্পের কাজ। পার হওয়া যায় ব্যারেজের সেতু। চলে যাওয়া যায় ভুটানি গ্রামে। ৬ কিমি হেঁটে ভুটানের তেন্ডু পাহাড়ের জনপদ ঘুরে আসা যায়। দূরের ভুটান পাহাড় কেবলই হাতছানি দেয়। দিগন্ত বিস্তৃত হিমালয়ের মাঝে নেপালি ও ভুটিয়াদের বসতি। নানা রঙের ফুল ও অর্কিড, আর বিচিত্র প্রজাতির পাখি যেমন আছে, তেমনি ইপিকাক, সিঙ্কোনার চাষের পাশাপাশি চা-কমলালেবুর চাষও হয়। দেখা যায় এলাচ, আদা আরও রকমারি চাষের খেত। পাহাড়ি সবুজ গ্রামগুলো যেন এক একটা ছবি। জনপদের নিজস্বতা ছড়িয়ে আছে পথের বাঁকে বাঁকে।

উপভোগ্য প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার আহ্বান নিয়ে একহারা স্বভাবের মাথা উঁচু করে থাকা ঝালং-এ এক সাদামাটা নজরমিনার

ছবি : কাজল বিশ্বাস

চালসা থেকে ১৮ কিমি দূরে ভুটান সীমান্তে অসাধারণ প্রকৃতির মাঝে সামসিং। জঙ্গল-পাহাড়ের বন্ধুতায় এক অপরূপ উপত্যকায় এই কমলা-বাগানের রাজত্ব।

সামসিং পশ্চিমবঙ্গেরই একটি গ্রাম। নামটা শুনে চট করে মনে হবে অন্য কোনও রাজ্য বা দেশের। ভুটান সীমান্তের এই গ্রাম বারবার ডাক দেয়। এমনই টান। ভুটান পাহাড় নিজের সঙ্গে নিজের আলাপে যেন মগ্ন। রাত কিংবা দিন—দুই সময়েই উপভোগ্য। অদ্ভুতভাবে যে কোনও মানুষকে ভিড় থেকে আলাদা করে দিয়ে, নিজেই সঙ্গী হয়ে ওঠে।

অপরূপ সামসিং

ছবি সৌজন্য : অন্তর্জাল

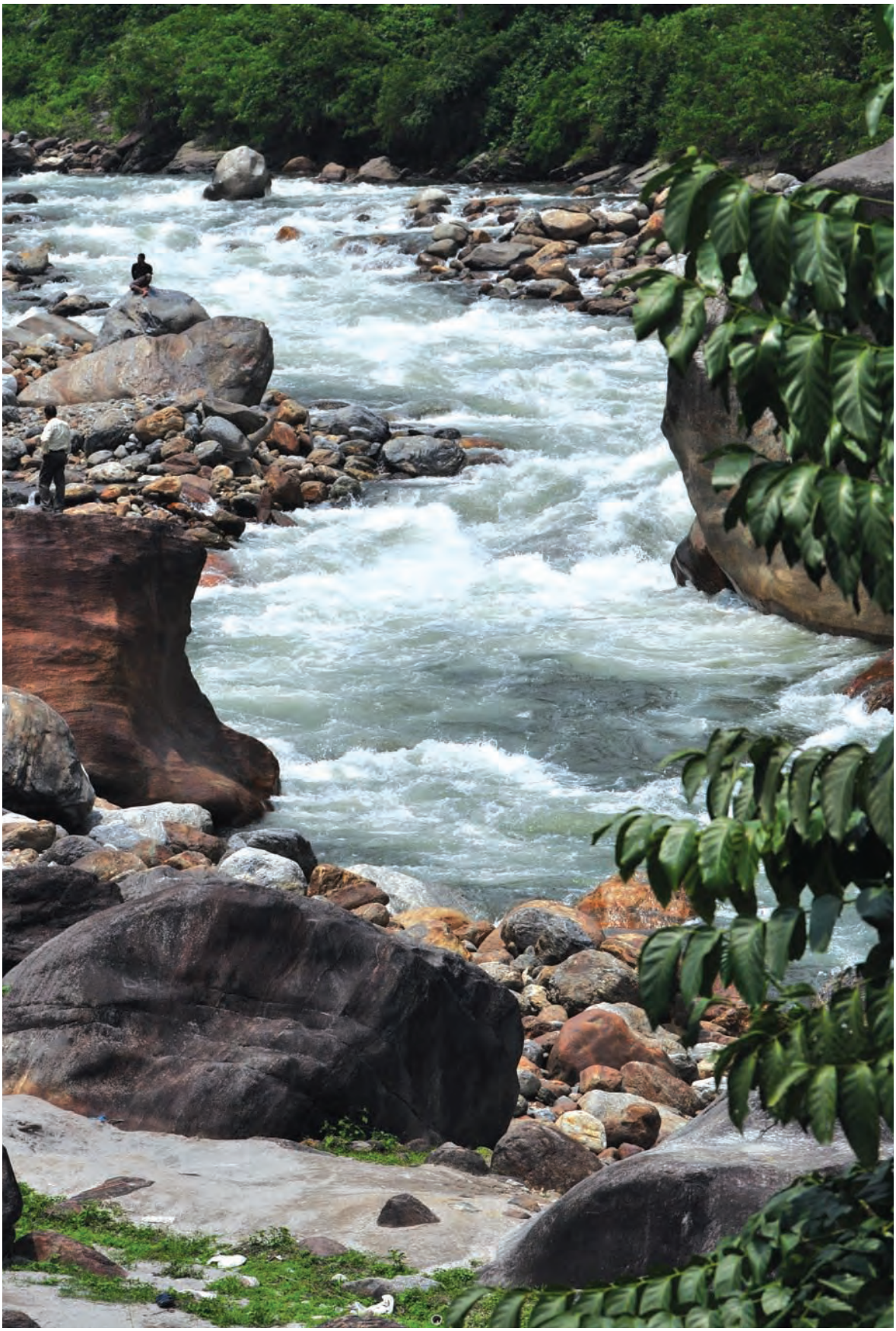

রকি আইল্যান্ড-র পাশে মূর্তি নদী প্রবল বেগে ছুটে চলেছে ছবি : কাজল বিশ্বাস

গাছ ভরা কমলালেবু। পছন্দমতো কেনা যায়। দেখতে লাগে আরও ভালো। রকি আইল্যান্ডের দিকে হাঁটতে হাঁটতে কেবলই চোখ চলে যায় কমলা-বাগানে। শীতের সামসিং-এ এটা আরেকটা মজা। এ যেন উপরি পাওনা।

রকি আইল্যান্ডে পৌঁছে আবার আরেক জগত। বড়ো বড়ো বোল্ডারের ওপর দিয়ে মূর্তি নদী ছুটছে। টপকে টপকে পৌঁছে যাওয়া যায় জলের কাছে। ওঠা যায় আইল্যান্ডেও। কেমন একটা ভয় ভয় ভাব। থাকারও ব্যবস্থা আছে। আবার ক্যাম্পও করে কেউ কেউ। পাহাড়, নদী, অরণ্য মাখামাখি করে সাজিয়ে রেখেছে এই দ্বীপ। প্রকৃতির জাদুতে যারা বিশ্বাস করে, তাদের জন্যই এই জায়গা।

ঠিক এইরকমই আরেক জায়গা সান্তালেখোলা। ওয়াইল্ডারনেস ফরেস্ট ক্যাম্প-এ একটা রাতের অভিজ্ঞতা জীবনের অনেক সঞ্চয়ের একটি—অনায়াসে এই দাবি করা যায়।

চালসা থেকে চা-বাগান চিরে পথ গিয়েছে মাটিয়ালি, সামসিং হয়ে সান্তালেখোলা। এই ২২ কিমি পথ পাড়ি দেওয়া শুধু পথের সৌন্দর্য দেখতে। সঙ্গে চেখে নেওয়া সামসিং-সান্তালেখোলার মুগ্ধতা। কিন্তু না। অরণ্য-বাংলোকে উপভোগ করতে হলে এখানে এসে থাকতে হবে।

ঝালং-বিন্দু-প্যারেন-তোদে-তাংতা—গোটা অঞ্চল জুড়ে সৌন্দর্যের মাখামাখি। ঝালং থেকে বিন্দু যাওয়ার বাঁ দিকে পথ গিয়েছে প্যারেনে। শিলিগুড়ি থেকে ১১৪ কিমি দূরে বিন্দু।

অভিযানপ্রিয় পর্যটকেরা তোদে-তাংতা থেকে পাহাড়-অরণ্যের দূর্গম পথ হেঁটে দশ হাজার ফুট উচ্চতায় রোচেলা পৌঁছতে পারেন। ওখান থেকে ন্যাওড়াভ্যালির জঙ্গল হেঁটে পৌঁছতে পারেন লাভায়। বিন্দু থেকে ৩ কিমি দূরে গোদক। গোদক ছাড়িয়ে পথ গিয়েছে চিসাং। চড়াই পথে আরও ৭ কিমি গিয়ে তোদে। এখান থেকে দেখা যায় নাথুলা পিক।

বসন্তে ফুলে সেজে ওঠে তোদে। প্রাইমুলা, রডোডেনড্রন, গ্ল্যাডিওলাস, এমনকি সূর্যমুখীও বাহার বাড়ায়।

সান্তালেখোলায় বনবাংলোর প্রবেশপথ

জঙ্গলের জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি জঙ্গলের এক অনন্য ভাষ্য তৈরি করেছে। দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা পেয়েছে জলপাইগুড়ির শালের জঙ্গল। ভারতের বন্যপ্রাণের এক উল্লেখযোগ্য জগত এই জেলায়। ফলে, শুধু অরণ্য বাংলায় নয়, আরণ্যক ভারতের এক বিশিষ্ট অংশ জলপাইগুড়ির জঙ্গল।

জলপাইগুড়ির এক অংশ আজ আলিপুরদুয়ার জেলা। তাই এই দুই জেলা জুড়ে জঙ্গলের অসাধারণ বৈচিত্র্য বিরাজমান। অধিক উচ্চতায় একধরনের অরণ্য। বন্যাপ্লাবিত নদীতীর জুড়ে আরেক ধরনের আরণ্যক প্রকৃতির ধরন আলাদা। মূর্তি, জলঢাকা, তোর্সা-সংলগ্ন উঁচু উঁচু ঘাসের জঙ্গল বন্যপ্রাণের সমারোহ ঘটিয়েছে। বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর যেমন নিরাপদ, নিভৃত আবাসস্থল এই অঞ্চল, তেমনি অসাধারণ জৈব-বৈচিত্র্যর কারণে পাখিদেরও স্বর্গরাজ্য। এক শৃঙ্গী ভারতীয় গণ্ডার দেখা যায় এখানের গরুমারা ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে। বিলুপ্তপ্রায় হিসপিড হেয়ার, পিগমী হগের সন্ধান মিলেছে গরুমারায়। এই জাতীয় উদ্যানেই 'বেঙ্গল ফ্লোরিক্যাল' নামে—একটি বিপন্ন পাখির ছবি তোলা গিয়েছে।

এই দুই জেলার বিভিন্ন অরণ্যে বাঘ, লেপার্ড, এশিয়ান হাতি, গাউর, বুনো শুয়োর, সম্বর, চিতল, হগ ডিয়ার, বার্কিং ডিয়ার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে এই দুই জেলায় বনদপ্তরের কয়েকটি ডিভিশন উল্লেখযোগ্যভাবে কাজ করছে। কয়েকটি অভয়ারণ্য এবং জাতীয় উদ্যান আছে এর আওতায়। সমভূমি থেকে তরাই, পাহাড়ী নদী, ঝোরা, ঘাসের ঘন জঙ্গল, অসূর্যস্পর্শা গভীর অরণ্য—বন্যপ্রাণের আশ্চর্য এক জগত তৈরি করেছে।

জলপাইগুড়ি জেলায় মূলত শালের জঙ্গল, এছাড়া রয়েছে চিরহরিৎ অরণ্য, সাভানা, নদীকেন্দ্রিক জঙ্গল আর জলাভূমি। শালের নানা বৈচিত্র আছে—(ক) পরিণত, (খ) বিক্ষিপ্ত, (গ) ভেজামিশ্র এবং (ঘ) শুকনো। জমিতে বালির পরিমাণ বেশ

ভালোরকম থাকলে সেখানে সাভানা তৈরি হয়। নদীকেন্দ্রিক অরণ্যে মূলত পাতাঝরা বৃক্ষের সমারোহ। দুটি প্রধান প্রজাতি শিশু ও খয়ের। ছোটো ছোটো পাহাড়ি ঝোরার আশপাশের জমিতে জলাভূমির গাছ দেখতে পাওয়া যায়। জলপাইগুড়ি জেলার একটা বিরাট অংশের মানুষ এই অরণ্য-নির্ভর। বিভিন্ন বন্যপ্রাণ প্রজাতির আশ্রয়স্থল হওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এই অরণ্যের একটা পরিচিতি আছে।

চালসা, লাটাগুড়ি, ডায়না, নাথুয়া, মোরাঘাট, জলগাঁও, রামসাই, বানারহাট—এইসব জায়গাতেও অরণ্যের শোভা ও জীববৈচিত্র মানুষকে আকর্ষণ করে।

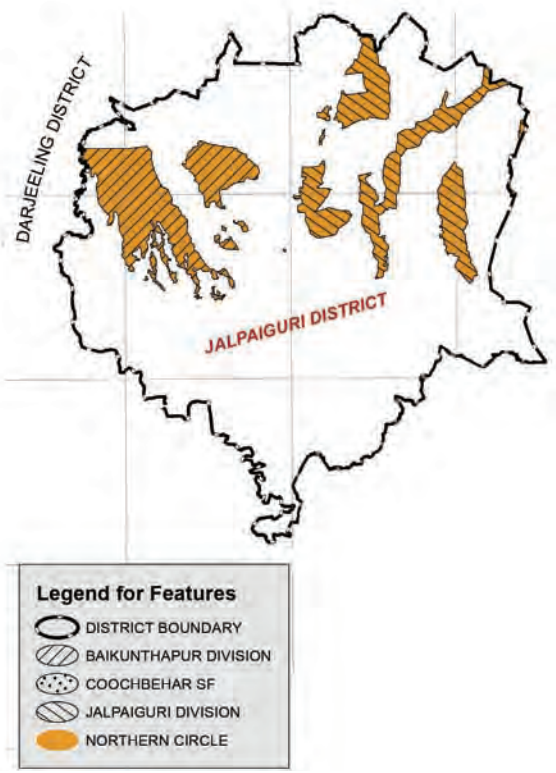

রূপের ভেলায় ভেসে ভেসে
ডুয়ার্স থেকে দিকে দিকে

“এই অপরূপ প্রকৃতির মাঝে আছে নানা জনজাতি গোষ্ঠী। আদিমতার এক স্বাদ নিয়ে জেগে আছে ডুয়ার্স।”

ভুটানের দুয়ার বা দরজাই মুখে মুখে হয়ে গিয়েছে ডুয়ার্স। এই অঞ্চলের অতীত-ইতিহাস জানতে কামতাপুরের ইতিহাস জেনে নিতে হবে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলা সীমান্তের ৪৭৫০ বর্গ কিমি জুড়ে ডুয়ার্স বিস্তৃত। চা, কাঠ আর পর্যটন (Tea, Timber, Tourism) ডুয়ার্সের তিন স্তম্ভ। ১৫২টি চা-বাগানে ঘেরা ডুয়ার্স সবুজের স্বর্গ রচনা করেছে।

পশ্চিমে বইছে তিস্তা। পুবে সঙ্কোশ। ছোটো নদী বা ঝোরা, আর বড় নদী বা খোলা—দুইয়ের সমারোহ ডুয়ার্সের ভূ-প্রকৃতিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে।

তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, রায়ডাক, কালজানি, মূর্তি, ডায়না, জয়ন্তী তো আছেই। নাচতে নাচতে বয়ে চলেছে অজস্র পাহাড়ি নদী। পাহাড়, অরণ্য আর জলধারা ডুয়ার্সকে লাস্যময়ী করে তুলেছে।

এই অপরূপ প্রকৃতির মাঝে আছে নানা জনজাতি গোষ্ঠী। আদিমতার এক স্বাদ নিয়ে জেগে আছে ডুয়ার্স।

আছে জলদাপাড়া, গরুমারা, চাপরামারি—তিন অভয়ারণ্য যার মধ্যে দুটি জাতীয় উদ্যানের শিরোপা পেয়েছে। ডুয়ার্সের বুক চিরে ভুটানের রাজপথও চলেছে।

গরুমারা জাতীয় উদ্যান

পরাধীন ভারতের সংরক্ষিত এই শিকার ভূমি ১৯৭৬-এ অভয়ারণ্যের শিরোপা পায়। এলাকা মাত্র ৮.৬১ বর্গ কিমি। ১৯৮০-তে পশ্চিমবঙ্গের ৫ম জাতীয় উদ্যান, বর্তমানে এলাকা ৮০ বর্গ কিমি। লাটাগুড়ি থেকে অনুমতি নিয়ে উদ্যানভ্রমণের সুযোগ মেলে। মূর্তি ও রায়ডাক নদী বয়ে চলেছে। দূরে দূরে নীলচে-সবুজ পাহাড়। উত্তর পশ্চিমে সিঙ্গলীলা গিরিশিরা। কাঞ্চনজঙ্ঘা দৃশ্যমান।

অপরূপ পরিবেশে গরুমারার বাংলো। ওখানেই রাইনো পয়েন্ট। বয়ে চলেছে ইংডং। মিষ্টি একটি নদী। নদীর পাড়ে জঙ্গলের জন্তু-জানোয়াররা আসে সল্ট লিকে।

বাংলো থেকে বামনি বিট ধরে যেতে হবে আরও দেড় কিমি পথ। মূর্তির পাড়ে যাত্রাপ্রসাদ ওয়াচ টাওয়ার। যাত্রাপ্রসাদ ছিল কুনকি হাতি। বুনো দাঁতাল হাতির সঙ্গে লড়াই-এ ১৯৭০-এ মারা যায় যাত্রাপ্রসাদ। ওরই স্মৃতিতে এই ওয়াচ টাওয়ারের নাম। এই ওয়াচ টাওয়ার থেকে গরুমারা-র বন্যপ্রাণ দেখা যায় সবচেয়ে ভালো।

মেদলাবাড়ি ওয়াচ টাওয়ার

একশৃঙ্গ গণ্ডারের খাসতালুক দেখতে ৩ কিমি দূরে গরাতি ওয়াচ টাওয়ার যেতে হবে। রাত জেগে দেখতে হবে বন্য ও বন্যপ্রাণের জগত।

দক্ষিণ গরুমারার কালীপুর জঙ্গল বুধুরাম বিটের আওতায়। এইখানেই তৈরি হয়েছে মেদলাবাড়ি ওয়াচ টাওয়ার। লাটাগুড়ি থেকে অনুমতি ও টিকিট নিয়ে যেতে হবে মেদলাবাড়ি ওয়াচ টাওয়ার। লাটাগুড়ি-তে টিকিট কেটে বসে থাকতে হবে। এরই ফাঁকে দেখে নিন প্রজাপতি পার্ক। দেখে নিন স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করে জঙ্গল-প্রান্তের মহিলারা করে চলেছেন হাতের কাজ। বনদপ্তরের উদ্যোগে।

কালিপুর জঙ্গলে আদিবাসী নৃত্য

সময় হলে বনদপ্তরের গাড়িতে নিয়ে যাবে ওয়াচ টাওয়ার দেখাতে। শেষের পথটা যেতে হবে মোষে টানা গাড়িতে। নীরবতাই জঙ্গলের ভাষা। অরণ্যপ্রিয় মানুষেরও। গাড়ি চলবে নিঃশব্দে। এমন গাড়ি চড়ার অভিজ্ঞতাও অনন্য।

তারপর উঠে যান ওয়াচ টাওয়ারে। দূরে-কাছে বন্যপ্রাণের সমারোহ।

সময় শেষ হলে গাড়িতে করে নিয়ে যাবে কালীপুর জঙ্গল। দেখানো হবে আদিবাসী নৃত্য। জঙ্গল ও জঙ্গল-সংলগ্ন মানুষের সংস্কৃতির স্বাদ নেবেন পর্যটক।

ওয়াচ টাওয়ারের থেকে ১ কিমি দূরে গরুমারা ইকো ভিলেজ। থাকার জন্য কটেজও আছে।

এলিফ্যান্ট-রাইড, আদিবাসী নৃত্য, হাতি পরিচর্যা দেখা-থাকা-খাওয়া সব মিলিয়ে এখানে ভাড়া একসঙ্গে নিয়ে নেয়।

মোষ-টানা-গাড়িতে করে পর্যটক চলেছে মেদলাবাড়ি ওয়াচটাওয়ারেতে

ঘুরে নেওয়া যায় জঙ্গলের এদিক ওদিক। কিছুদূরে জাতীয় সড়কে মহাদেব তথা মহাকালের মন্দির। বইছে বামনিঝোরা নদী। তিস্তার পাড়ে বৈকুণ্ঠপুর—দেবী চৌধুরানী উপন্যাসের পটভূমির সঙ্গে যুক্ত। গোসালায় দেবী চৌধুরাণীর মন্দির। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময় সন্ন্যাসীদের গোপন ডেরা ছিল মাটিয়া ড্যাম সংলগ্ন অরণ্য, গহন জঙ্গল। ন্যাওরা, বামনি ও মূর্তি নদী বইছে। হাতি, গণ্ডার, গাউর নানা বন্যপ্রাণের বিচরণভূমি আজ। পাখিরাও নিশ্চিন্তে তাদের জগত গড়েছে। শ্বাসরুদ্ধ নিস্তব্ধতা যেন।

মেদলাবাড়ি যাওয়ার পথে

স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী

ছবি : কাজল বিশ্বাস ও অন্যান্য সূত্র

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান

জলদাপাড়ার বিখ্যাত হলং বাংলো

পর্যটকেরা এইসব হাতির পিঠে চেপেই অরণ্য ভ্রমণের রোমাঞ্চের স্বাদ নেয়।

আলিপুরদুয়ার জেলায় তোর্সা নদীর তীরে জলদাপাড়া বনভূমির অবস্থান। গাছ ও নানা বন্যপ্রাণ প্রজাতি বাঁচাতে ১৯৪১ সালে একে অভয়ারণ্যের (Sanctuary) তকমা দেওয়া হয়। সেই থেকে আজ—বিলুপ্তির সম্ভাবনার তালিকায় থাকা একশৃঙ্গ বিশিষ্ট গন্ডারের বিশাল বসতি এখন এই জাতীয় উদ্যানের গর্ব। প্রসঙ্গত জলদাপাড়া এবং বক্সা টাইগার রিজার্ভ-এর মধ্যে হাতি করিডর হিসাবে কাজ করছে চিলাপাতা-র অরণ্য।

২০১২ সালের মে মাসে একে জাতীয় উদ্যান হিসাবে ঘোষণা করা হয়। মূলত এলিফ্যান্ট ঘাসে ঢাকা সাভানা অঞ্চল। এক খড়্গ বিশিষ্ট গন্ডার এখানকার মূল আকর্ষণ। অসমের কাজিরাঙার পরে এখানেই সবথেকে বেশি গণ্ডারের বাস। এছাড়াও আছে লেপার্ড, হাতি, সম্বর, বার্কিং ডিয়ার, আরও নানা জাতের হরিণ, বুনো শুয়োর।

পক্ষীপ্রেমীদের জন্য জলদাপাড়া যেন স্বর্গভূমি। দুর্লভ বেঙ্গল ফ্লোরিকান-এর দেখা মেলে এখানে। আছে প্যাট্রিচ, হর্নবিল, ঈগল, শিকরা, পেঁচা, ময়ূর-ও। পাইথন থেকে শুরু করে নানা জাতের বিষাক্ত সাপ ও অন্যান্য সরীসৃপেরও দেখা পাওয়া সম্ভব। আছে ৮টি মিষ্টি জলের কচ্ছপ প্রজাতি।

জলদাপাড়ার ওয়াচটাওয়ার ও বনাবাসগুলি আকর্ষণের নিরিখে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। বিশ্বের অসংখ্য মানুষ বন্যপ্রাণ সম্পর্কে অনন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে এইখানে এসে, থেকে, ঘুরে বেড়িয়ে। আজও সেই আকর্ষণ অটুট আছে।

জলদাপাড়ার নজরমিনার

বিখ্যাত সেই এক শৃঙ্গ গণ্ডার

চাপরামারি অভয়ারণ্য

গরুমারা থেকে বামনিঝোরা হয়ে ১৭ কিমি দূরে লাটাগুড়ি। জলপাইগুড়ি থেকে ৫০ কিমি। চালসা থেকে ২০ কিমি। লাটাগুড়ির ৯ কিমি দূরে চুকচুকি পক্ষী পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। কাঠের ওয়াচ টাওয়ার থেকে পাখি ও অন্য জন্তু-জানোয়ার দেখা যায়। অনুমতিতে রাতেও দর্শনের সুযোগ মেলে।

গরুমারার উত্তরে চাপরামারি। গরুমারা থেকে ৩১ নং জাতীয় সড়ক ধরে ১২ কিমি দূরে চালসা যেতে হবে। শিলিগুড়ি থেকে ৭৮ কিমি দূরে এখানে আসতে হবে ওই সড়ক ধরেই।

চালসা থেকে খুনিয়া মোড় (৭ কিমি) হয়ে বাঁয়ে আরও ৪ কিমি গিয়ে চাপরামারি।

পর্ণমোচীর অরণ্য। ৯.৬০ বর্গ কিমি। ১৯৭৬-এ অভয়ারণ্যের স্বীকৃতি। ৭৮ প্রজাতির স্থন্যপায়ী প্রাণীর অবস্থান। ৮৩ ধরনের ঘাসের বৈচিত্র্য নিয়ে অসাধারণ grass-land. প্রায় ২০০ ধরনের পাখি। হাতিরা ঘুরে বেড়ায় দল বেঁধে। হরিণেরাও। জলাভূমিতে জল খেতে আসে বন্য শূকর, নীলগাই, শম্বর। হাতিরা মাতে স্নানে।

চাপরামারি ফরেস্ট বাংলো থেকে অরণ্যকে উপভোগ করা যায় নিবিড়ভাবে।

চাপরামারি বনবাংলো

দূরে বনচরেরা

আলিপুরদুয়ার

বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষণ

(বক্সা টাইগার রিজার্ভ)

উত্তরে হিমালয়। ঠিক তার নিচে বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষণ অঞ্চল। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরদিকে ৭৬০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে এই সংরক্ষিত এলাকা। উচ্চতা ২০০ থেকে ৫৭৪০ ফুট।

প্রায় ২৮৪ প্রজাতির পাখির এই সাম্রাজ্যে এশিয়ান হাতি, গাউর, সম্বর হরিণ, ক্লাউডেড লেপার্ড, ভারতীয় লেপার্ড এবং বাংলার বাঘ দেখা যায়।

এই সংরক্ষিত এলাকায় ৩৭টি গ্রামে মানুষের বসতি।

আলিপুরদুয়ার জেলার এই বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষণ এলাকার উত্তরে ভুটানের সীমান্ত। সিঙ্গুলা পাহাড়ের রেঞ্জ বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষণ-এর উত্তর বরাবর চলে গিয়েছে। পুব দিকের সীমানা ছুঁয়েছে অসম রাজ্য। ৩১ নং জাতীয় সড়ক দক্ষিণের সীমারেখা।

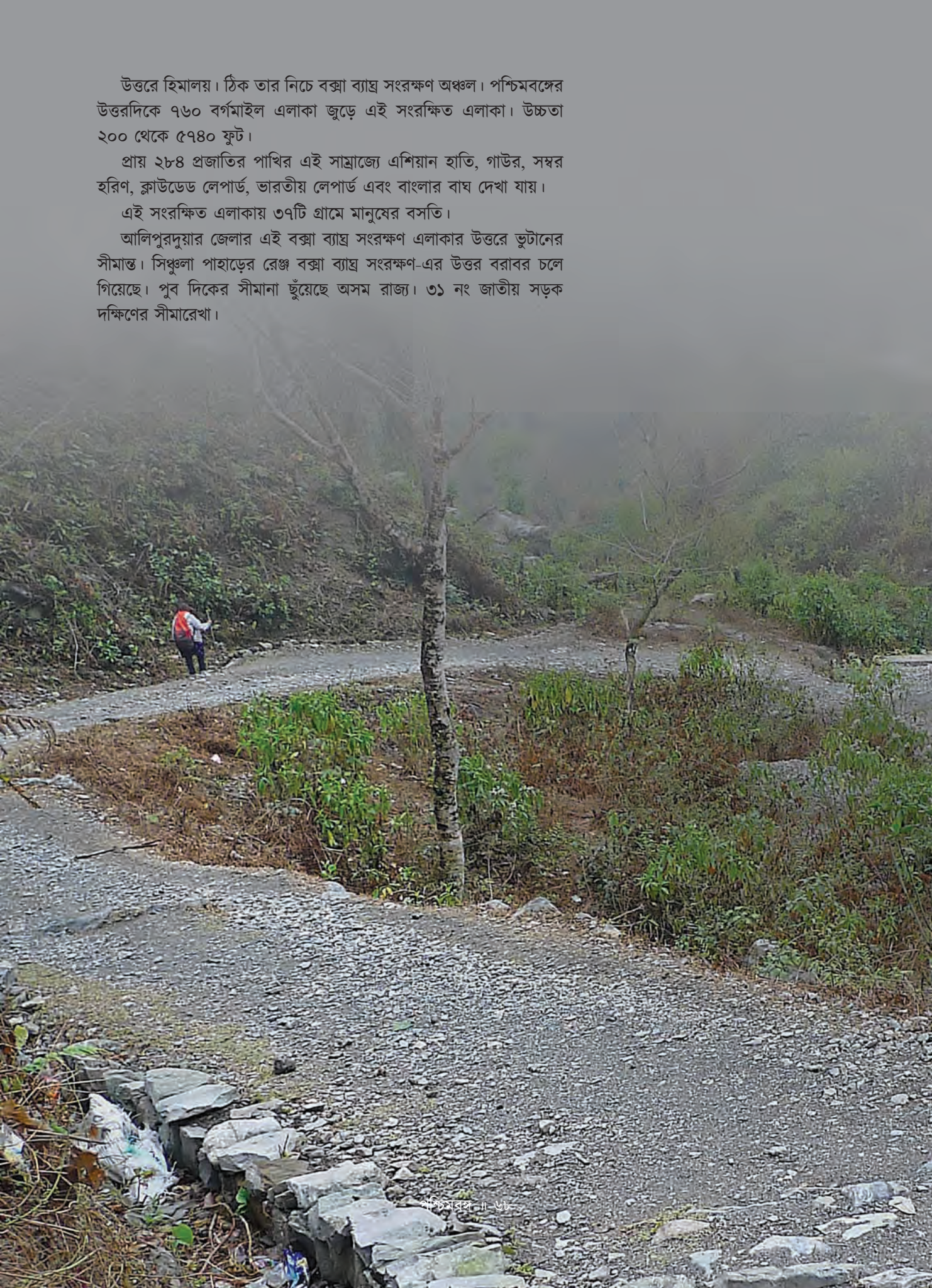

উত্তর-পূর্ব ভারতের জৈব-বৈচিত্র্যের যে বিস্ময়কর সম্ভার দেখা যায় তারই পুব দিকের প্রসারিত অঞ্চল এই এলাকা। অত্যন্ত বেশি মাত্রায় স্থানীয়/দেশজ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ইন্দো মালায়ন অঞ্চলের প্রতিনিধি যেন।

এই সংরক্ষিত অঞ্চল ভঙ্গুর 'তরাই ইকো-সিস্টেম-এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষণ-এর উত্তরের সন্নিহিত অঞ্চল ভুটানের ফিসবু (Phibsoo) ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারি। বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষণের পুবে মানস জাতীয় উদ্যান। তাই এই অঞ্চল ভারত ও ভুটানের মধ্যে এশিয়ান হাতি দক্ষিণ-পূর্বে চিলাপাতা অরণ্য ও জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য-র হাতি-করিডর।

বক্সার দূর্গম পথে

ছবি : কাজল বিশ্বাস

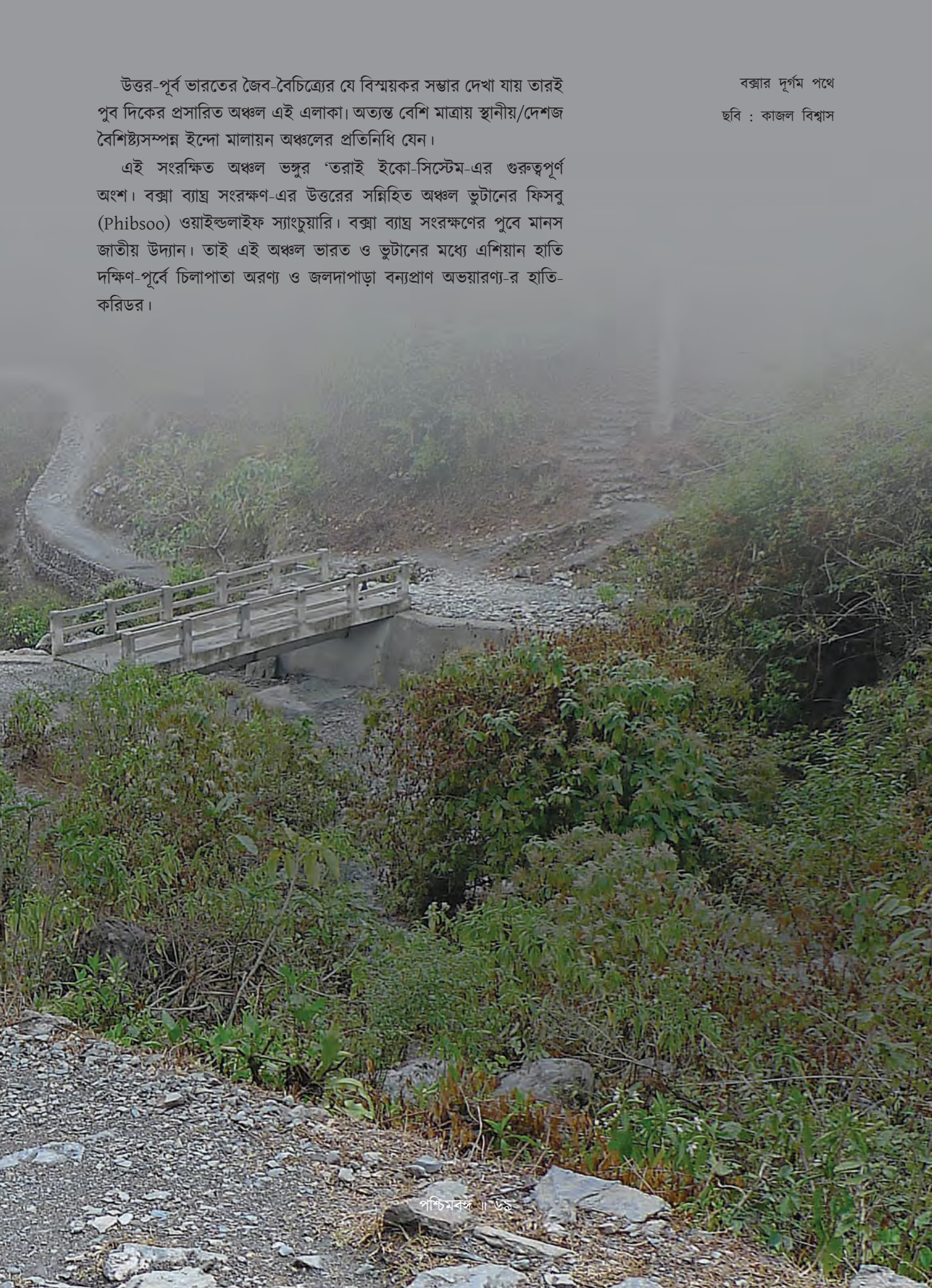

রাজাভাতখাওয়া নামের মধ্যে ইতিহাসের গন্ধ। বক্সা টাইগার রিজার্ভের তোরণ দিয়ে প্রবেশ করতে হবে এখানে। সিঞ্চুলা পাহাড়ে কাঠের দোতলা বনবাংলো। নিঝুম অরণ্যে ইতিহাস কানে কানে বলে যাবে ১৮৮০-তে কোচ রাজার ভাত খাওয়ার গল্প। ভুটানরাজকে না হটিয়ে ভাত না খাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন রাজা। ভুটানরাজ অবশেষে সন্ধির প্রস্তাব দেন এবং শর্ত মেনে ফিরে যান ভুটানে। কোচরাজা তখন এখানে বসেই প্রতিজ্ঞা ভেঙে ভাত খান।

শুধু ইতিহাস নয়। রাজাভাতখাওয়া নামের মধ্যে আরও যেন কিছু আছে। আছে অরণ্যের একটি আশ্চর্য জগতে প্রবেশের চাবিকাঠি। রাজাভাতখাওয়ার স্টেশন থেকে রেলে চলে শিলিগুড়ি-আলিপুরদুয়ার। এই ছোট, জনপদে আছে নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার। আছে ওয়াচটাওয়ার।

কোচবিহার থেকে মাত্র ২৪ কিমি দূরে আলিপুরদুয়ার। এখান থেকে ১৭ কিমি দূরে রাজাভাতখাওয়া। আরও ১৪ কিমি গেলে সান্তালাবাড়ি, যেখান থেকে ৫ কিমি হেঁটে বক্সাপাহাড়। বুঢ়া তোর্সার পুবপাড় জুড়ে জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের অংশ চিলাপাতা অরণ্য। গণ্ডারের এই চারণভূমির পাহাড়েই বক্সা জাতীয় উদ্যান। এই জঙ্গলে ১,২৯৫ বর্গ কিমি অঞ্চল জুড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে যে ধ্বংসস্তূপের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, সেটিকে নল রাজার গড় বলা হয়। গুপ্তযুগের অর্থাৎ চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতকের এই গড়ের সন্ধান মিলেছে। তৈরি হয়েছে ইকোলজিক্যাল পার্ক। আছে বনবাংলো। সন্তোষ, তোর্সা ছাড়াও বয়ে যাচ্ছে জয়ন্তী, রায়ডাক,

বালা, পাভা। ৭৬৫ বর্গ কিমির এই মৌসুমী বনাঞ্চলে শাল, সেগুন, শিমুল যেমন আছে, আছে ৬৭ রকমের স্তন্যপায়ী প্রাণী। ৩০৪ বর্গ কিমি কোর এলাকায় বাঘ, চিতা, হাতি, বাইসনের বাস।

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ১৫তম ব্যাঘ্র সংরক্ষণ হিসাবে বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষণ গড়ে তোলা হয়। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে এই সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ৩১১৪.৫২ বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠে। বক্সা বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য-এর ১১৭.১০ বর্গ কিমি এলাকা নিয়ে একটি জাতীয় উদ্যান তৈরি করে। ১৯৯৭ সালে এই শিরোপা পাওয়া যায়।

এই সংরক্ষিত এলাকায় আট ধরনের অরণ্য আছে। আলিপুরদুয়ারে ডিভিশানগুলির প্রধান কার্যালয়।

পূর্ব ও পশ্চিম—দুটি ডিভিশন আছে। এই সংরক্ষিত অঞ্চলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ল্যান্ডমার্ক হিসেবে ধরা হয় বক্সা ফোর্টকে। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ-ভুটান যুদ্ধে ভুটান-রাজের হাত থেকে ব্রিটিশের হাতে আসে এই ফোর্ট। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বিপ্লবীদের এখানে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। আজও তার ধ্বংসস্তূপ দেখতে দেখতে ইতিহাস জীবন্ত হয়ে ওঠে। সম্প্রতি, রাজ্য সরকার এই দুর্গ বা বন্দিশালার সংস্কারের কাজ করেছে। আজও বহু পর্যটক এই ভাঙা বন্দিশালা দেখতেই অনেক কষ্ট করে হেঁটে হেঁটে ওপরে ওঠেন। ইতিহাসের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। শ্রদ্ধায় অবনত করেন মাথা।

বক্সা ফোর্ট

ছবি : কাজল বিশ্বাস

১৯৯২-তে জাতীয় উদ্যানের শিরোপায় ভূষিত হয় এই অরণ্যের একটি অংশ। বক্সার অরণ্য বৈচিত্র্যে অনন্য। বাঘ, চিতা, হাতি, বাইসন, বন্য শূকর যেমন আছে, তেমনি আছে পাখি, নানা প্রজাতির পোকামাকড়, প্রজাপতি, লতাগুল্ম, অর্কিড, ঘাস, বাঁশ, বেত।

এরই মাঝে আছে ডুকপাদের কয়েকটি গ্রাম। একটি হল লেপচাখা। অপূর্ব প্রকৃতির মাঝে এর অবস্থান।

আলিপুরদুয়ারের ভুটানঘাট, রায়ডাক, রায়মাটাং, জয়ন্তী-মহাকাল অরণ্য-ভ্রমণের স্বাদ দিতে অপেক্ষায় থাকে। নদী, পাহাড় আর অরণ্য-এর সমাহার এই বিস্তৃত অঞ্চলকে ক্রমশ আরও আকর্ষক করে তুলছে। এখানে পাওয়া যায় অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ। প্রকৃতিকে মন ভরে জেনে নেওয়ার অনবদ্য সুযোগ আছে এখানে। আছে বনবাংলো।

আলিপুরদুয়ার থেকে ৪০ কিমি দূরে তুরতুরি চা-বাগান পেরিয়ে আরও ৮ কিমি গেলে ভুটানঘাট। ভুটানঘাট থেকে ২২ কিমি দূরে রায়ডাক। সবুজ চা-বাগানের মাঝ দিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়ে রাভাদের গ্রাম। রায়ডাক নদী ভুটানে গিয়ে নাম পেয়েছে ওয়াংচু। রায়ডাক নদীর নামে এখানে রায়ডাক অরণ্য। গহন অরণ্যে রায়ডাক বনবাংলোয় থাকার দুর্লভ সুযোগও ঘটে। আলিপুরদুয়ার থেকে বাসে শামুকখোলা নেমে অরণ্যের মধ্য দিয়ে ৩ কিমি হেঁটেও এই বনবাংলোয় পৌঁছানো যায়। শামুকখোলা থেকে ৪ কিমি গেলে ভুটানঘাট বনবাংলো। আর আলিপুরদুয়ার থেকে জিপ বা বাসে ২ ঘণ্টায় পৌঁছানো যায় বনবাংলোয়। ঘুরে আসা যায় ৭ কিমি দূরে পাহাড়-কোলের ভুটানপাড়া। ভারত-ভুটান সীমান্তের এই ভুটানঘাট থেকে পথ গিয়েছে পুনাখায়। ভুটানঘাট থেকে রায়ডাক পেরিয়ে ১ কিমি দূরে বা ভুটানঘাট থেকে ৫ কিমি দূরে পিপিং খোলা। রায়ডাক থেকে নিমাতির ঘন জঙ্গলের মধ্যে বনবাংলোতে থাকা যায়। নিমাতি থেকে কালচিনি হয়ে চলে যাওয়া যাবে রায়মাটাং।

নদী-পাহাড়-জঙ্গল ও চা-বাগানের মাঝে এখানে রাভা সংস্কৃতির মিশেল রায়মাটাং-কে নতুন স্বাদের পর্যটনের কেন্দ্রবিন্দু করে তুলেছে। হোম-স্টে-র সুবিধা আছে।

বক্সাদুয়ার থেকে জয়ন্তী অরণ্যে ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছে যাওয়া যায় পাহাড়-চুড়োয় জলাশয় বা পুকুরি। এই পুকুরির মাছ অতি পবিত্র। মাছের জন্য খাবার নিয়ে যায় পর্যটকেরা। বৌদ্ধ-পূর্ণিমায় এখানে আসেন বৌদ্ধরা। পূজা দেন।

জয়ন্তী নদীর পশ্চিমপাড়ে জয়ন্তী পাহাড়। পাহাড় লাগোয়া বনবাংলো। পূবে ডলোমাইট পাহাড়। ভুটানের কাতলুং ও সাচিক্ষু-এই দুই নদীর জলে বর্ষায় পুষ্ট হয় জয়ন্তী। শীতে সাদা-নুড়ি বিছানো গর্ভদেশ সেও যেন রূপে ঝকমক করে।

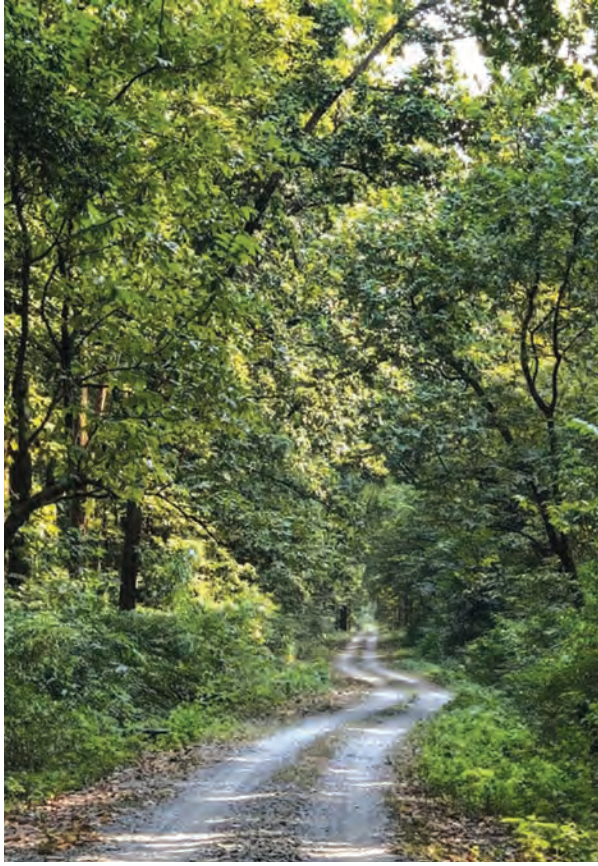

জয়ন্তী নদী

ছবি : কাজল বিশ্বাস

ফালুট-সান্দাকফু

রোমাঞ্চে ভরা সিঙ্গলীলা জাতীয় উদ্যান

ফালুট টপের যে বিন্দুতে নেপাল, সিকিম আর ভারত তথা বাংলা মিশেছে, সেই বিন্দুতে পা দিয়ে দাঁড়ালে সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। ছড়িয়ে পড়ে এক অদ্ভূত শিহরণ। ওই বিন্দু থেকে ৩২০ কিমি বিস্তৃত চারপাশের হিমালয়ের দুধ-সাদা পর্বত শৃঙ্গগুলোকে দুচোখ ভরে দেখতে দেখতে মনে হয়, এই আমার বাংলা।

সিঙ্গলীলা গিরিশিরার ১১,৮১১ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট রাজ্যের দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গটি ফালুট। সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সান্দাকফুর উচ্চতা ১১,৯২৯ ফুট।

সান্দাকফু ছাড়িয়ে পথ চলেছে ফালুটের দিকে। সিঙ্গলীলা জাতীয় উদ্যানের এই দুর্গম পথে অভিযানপ্রিয় প্রকৃতি-প্রেমিকের দল বারেবারে ছুটে আসে।

ফালুট-সান্দাকফু ট্রেক রুটের পাহাড়ি গ্রামগুলি এককথায়, অপরূপ। বাঁকে বাঁকে শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘাই নয়, আছে সৌন্দর্যের এক আলাদা মৌতাত।

ফালুট টপ থেকে

প্রাণভরে হিমালয়কে দেখার সুযোগ দিয়েছে দার্জিলিং। দার্জিলিঙের সিঙ্গলীলা রেঞ্জেই সিঙ্গলীলা জাতীয় উদ্যান। ১৯৮৬-তে বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য (Wildlife Sanctuary) হিসেবে ঘোষিত হয় এই অরণ্য। ১৯৯২-এ জাতীয় উদ্যানের শিরোপা পায়। রাজ্যের ৭টি জাতীয় উদ্যানের মধ্যে এটিই সবথেকে বেশি উচ্চতায়, পূর্ব হিমালয়-এর একটি অংশ।

সিঙ্গলীলা একটি উত্তর-দক্ষিণ পার্বত্য গিরিশিরা (Ridge) উত্তরপশ্চিম পশ্চিমবঙ্গ থেকে সিকিমের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে। হিমালয়ের ভারতীয় অংশের এই গিরিশিরার পশ্চিম অংশ নেপালের ইলম (Ilam) জেলা।

সিঙ্গলীলা গিরিশিরা পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য রেঞ্জকে পশ্চিম দিকে হিমালয়ের অন্যান্য রেঞ্জ থেকে আলাদা করেছে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সান্দাকফু এই গিরিশিরাতে অবস্থান করছে। এই গিরিশিরার ফালুট (১১৮১১ ফুট), টংলু (১০০৭৪ ফুট), সবরগ্রাম (১১৬০০ ফুট)—এই তিনটে শৃঙ্গও উচ্চতার জন্য উল্লেখযোগ্য।

সাত হাজার ফুট উচ্চতায় এই জাতীয় উদ্যান বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সিঙ্গলীলা জাতীয় উদ্যানের মধ্যে দিয়ে পথ চলেছে সান্দাকফু, ফালুটের।

হিমালয়কে উপভোগ করতে এই অঞ্চলে আসতে হয়। রাম্মাম ও শ্রীখোলা দুটি নদী বয়ে গিয়েছে এই উদ্যানের ভিতর দিয়ে।

১৯০৫ সালে এই গিরিশিরা ধরে কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গ জয়ের চেষ্টা করেন একদল অভিযাত্রী। Jules Jacot-guillarmod, এবং Aleister Crewley-এর নেতৃত্বে।

ইন্দো-মালয় ইকো-জোন-এর এই উদ্যানের জীববৈচিত্র্যের বৈচিত্র্যময়তা বিস্ময়কর। সান্দাকফু যাওয়ার সমগ্র ট্রেক রুটটাই সিঙ্গলীলা রেঞ্জের মধ্যে। তাই একে সিঙ্গলীলা ট্রেকও বলা হয়।

এখান থেকে পৃথিবীর পাঁচটি সর্বোচ্চ শৃঙ্গের চারটিই দেখা যায়। মাউন্ট এভারেস্ট, মাকালু, কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং লোৎসে। এছাড়া দেখা যায় থ্রি সিস্টার্স এবং নেপাল, সিকিম, তিব্বত ও ভুটানের বিভিন্ন শৃঙ্গও।

সান্দাকফু এবং ফালুটের মধ্য দিয়ে বসন্তে এই পথে হেঁটে চলে দলে দলে অভিযাত্রী। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য প্রাণভরে দেখার সুযোগ আর কোথায়? কত রকমের রডোডেনড্রন, ম্যাগনোলিয়া, স্প্রুশ আর অর্কিড। পৃথিবীতে এমন জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় না যেখানে একই ভৌগোলিক অঞ্চলে ছশোরও বেশি অর্কিড দেখা যায়।

এমন একটি জাতীয় উদ্যানের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে এই ট্রেক রুট যেখানে রেড পান্ডা এবং প্যাঙ্গোলিনের মতো বিরল প্রজাতির প্রাণীরও দেখা মেলে। যদিও এই দেখা মেলাও বিরল ঘটনা—এ কথাও বলতে হবে। নানা ধরনের পাখিরও দেখা মেলে বিভিন্ন উচ্চতায়।

এই ট্রেকিং রুটে সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সান্দাকফু হলেও অনেকে সান্দাকফু ছাড়িয়ে ফালুটেও পাড়ি দেয়।

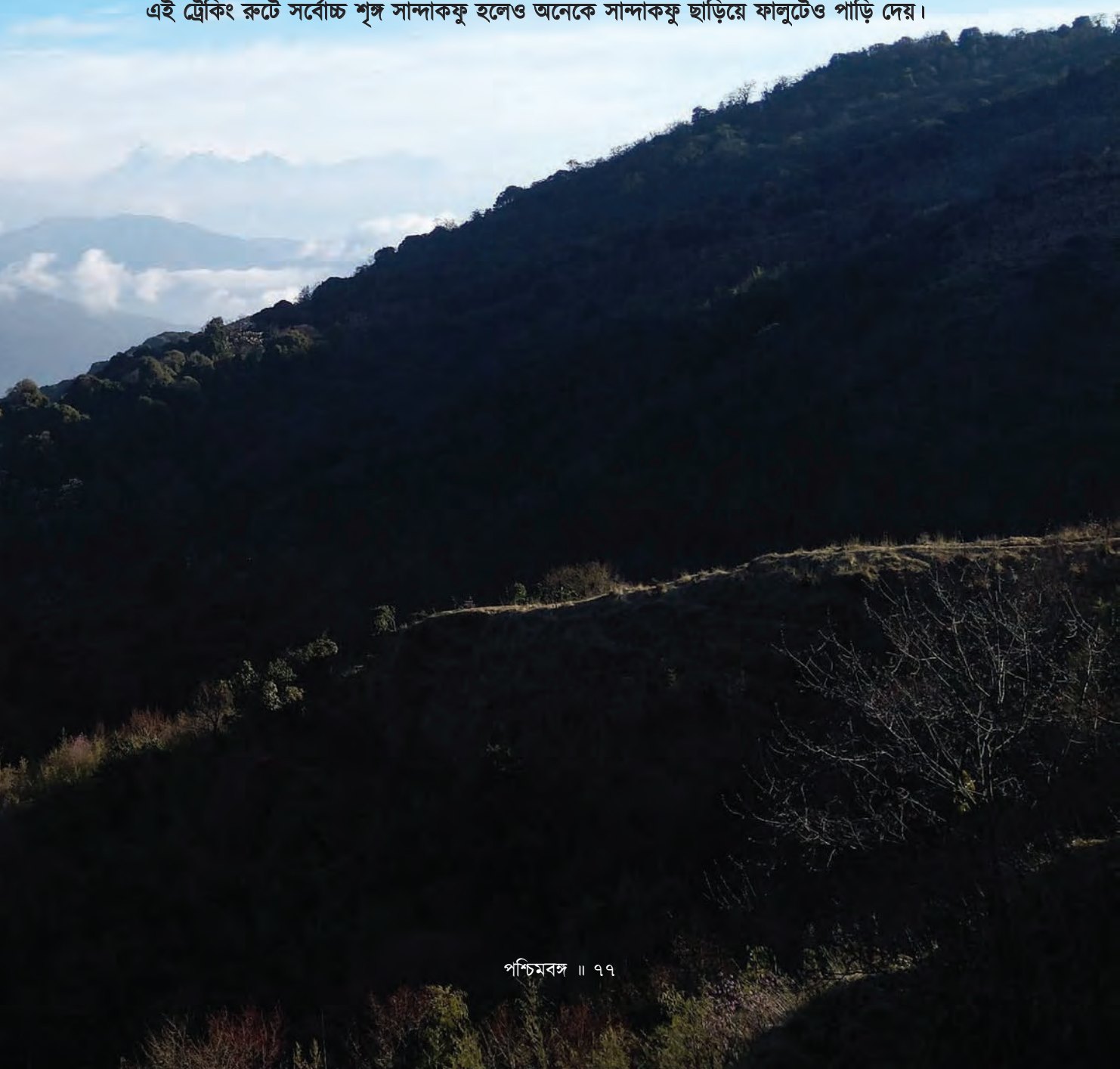

ফালুট টপ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা মাত্র ৩০ মাইল দূরে। ঝকঝকে আকাশে একেবারে যেন ঘুমন্ত বুদ্ধ। ফালুট টপে ছোট্ট মন্দির, স্থানীয় বৌদ্ধরা এখানে আসেন প্রার্থনা করতে। তাঁরাই টাঙিয়েছেন রঙিন টুকরো কাপড়ের পতাকা বা লুংদার, নির্জন এই টপকে স্বমহিমায় প্রাণবন্ত করে রেখেছে যেন।

ফালুট টপ থেকে এভারেস্ট

ফালুট টপ থেকে সূর্যোদয়! সাদা বরফের কাঞ্চনজঙ্ঘার ধীরে ধীরে সোনালি হয়ে ওঠা এই দৃশ্য দেখার অপরূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। শুধু তো কাঞ্চনজঙ্ঘা নয়, ডানদিক থেকে বাঁদিকে চোখ সরালে জেগে ওঠে একের পর এক শৃঙ্গ, এভারেস্টও। একদিকে এভারেস্ট, একদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা। শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার প্রতীক্ষায়। বাংলা থেকেই আমরা যে এমন অনন্যসাধারণ দৃশ্য দেখতে পারি সেকথা হয়তো আজও অনেকেই জানেন না। বাংলার পর্যটন মানচিত্রে ফালুট হয়ে উঠুক এক স্বর্গীয় স্বাদের আকর।

ফালুট টপ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা

পশ্চিমবঙ্গ ।। ৮

সান্দাকফু থেকে ফালুট যাওয়ার পথে এই অসামান্য স্বর্ণালী উপত্যকা। চোখ জুড়িয়ে দেয়। দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা। নীল আকাশে সাদা বরফের কবিতা যেন। সকলের জন্য একই ভাষ্য। এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে আছে একলা স্বভাবের কালো একহারা পাহাড়ি গাছ। উপত্যকায় চড়ে বেড়াচ্ছে স্থানীয় গ্রামবাসীদের পোষ মানানো কালো চমরি গাই। এই গাইয়ের দুধ এই পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের অন্যতম প্রিয় ও প্রয়োজনীয় খাদ্য। তাই অনেক মানুষের জীবন ও জীবিকা এই পশু পালনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে এখানে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা—The five treasure houses of the great snows (Kang-snow, chhen-great, dzo- treasury, nga-five), পাঁচটা শৃঙ্গ, তাই এই নাম—Kangchhendzonga. কাঞ্চনজঙ্ঘার সর্বোচ্চ শৃঙ্গটি সূর্যের উদয় ও অস্তে সোনার রঙে রাঙিয়ে ওঠে, দক্ষিণ দিকের শৃঙ্গে রূপালি রঙ ছড়িয়ে যায়। বাকি শৃঙ্গগুলো রত্ন, শস্য এবং পবিত্র গ্রন্থের ভাণ্ডার, তিব্বতিরা এইভাবেই দেখে।

সিঙ্গলীলা পর্বতের এই ফালুট আজকের অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় বাঙালির কাছেও যেন খুব সহজগম্য হয়ে ওঠেনি।

পায়ে পায়ে দার্জিলিং-এর অরণ্য-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানোর মজাই আলাদা।

পৃথিবীতে যত ধরনের অরণ্য আছে শুধু দার্জিলিং-এ ঘুরে বেড়ালেই তার অনেকটাই উপভোগ করা যায়। বিভিন্ন উচ্চতা ও তাপমাত্রায় এখানে অরণ্য বৈচিত্রময় হয়ে উঠেছে। সান্দাকফু ছাড়িয়ে ফালুটের দিকে যত যাওয়া যাবে, প্রকৃতি ততই ভিন্নতা নিয়ে দেখা দেয়। শীতের শুরুতে তার রূপ একরকম। শীতে বরফে ঢাকা। শীত চলে গেলে অন্য রূপে মেতে ওঠা। গ্রীষ্মে রডোডেনড্রনে ছেয়ে যায়। এ পথের তখন অন্য রূপ। তাই বছরভর যতদূর যাওয়া যায় বেহিসাবী প্রকৃতি-পূজারী মানুষটি পায়ে পায়ে এ-পথে হেঁটে বেড়ায়। বারবার এ-পথ ঘর-ছুট করে, মন-লুঠ করে। এ এক অপরূপ অরণ্য-বাসর।

গাছে যখন প্রথম বরফ জমে, সেই শিল্পকর্ম দেখতে যেতে হবে বইকি। প্রকৃতির এই অনবদ্য জীবন্ত প্রদর্শনী দেখার জন্য ফালুট চলে যায় সাহসী পর্যটকেরা। দূরে দূরে বরফে ঢাকা থেকে শুকিয়ে যাওয়া গাছ—দেখে মনে হবে যেন কেউ পুড়িয়ে দিয়েছে। উপত্যকা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ল্যান্ডরোভারও চলে যাচ্ছে আরোহী নিয়ে—হিমশীতল ডিসেম্বরে, মে মাসের গ্রীষ্মাবকাশে। আরামদায়ক ঝকঝকে অক্টোবরে।

থাকার জায়গার অভাব। তাই কিছুটা জনবিরল। আর তাই তো কবজি ডুবিয়ে সৌন্দর্য উপভোগ করুন। এমন খাবার সহজে মেলে না।

শীতের শুরুতে বরফ জমে ওঠে ধীরে ধীরে। প্রকৃতির তুলির টানে ফালুটের ক্যানভাসে এভাবেই চলে সারাবছর ছবি আঁকা। ছবির মতো প্রকৃতি। পথে পথে ছড়িয়ে আছে নানা চিত্র।

সান্দাকফু থেকে ফালুট যাওয়ার পথে রডডেনড্রনের অরণ্য আরেক চোখজুড়ানো দৃশ্য। শীত দেখায় আরেক ফালুট। আর এপ্রিল-মে-র সান্দাকফু ফালুটের পথ ফুলের হোলিতে মাতায় পর্যটককে।

সাদা বরফের গায়ে কালো চমরী গাই

শীতের শেষে ফুটে আছে রডডেনড্রন

পোষ-না মানা এই সাদা চমরী গাইটি ওই অঞ্চলের

মানেভঞ্জন থেকে সান্দাকফু—ফালুট—সিঙ্গালীলা পর্বতের এই অঞ্চল ট্রেকারদের স্বর্গরাজ্য। এখানে বছরের বেশ কয়েকমাস বেশ কিছু অঞ্চল বরফে ঢাকা থাকে। তাই স্থায়ী বসতি অনেক জায়গাতেই নেই। পর্যটক সমাগমকে ভিত্তি করেই স্থানীয় মানুষদের হোমস্টে, হোটেল ও অন্যান্য কাজকর্ম। সান্দাকফু এ রাজ্যের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। দার্জিলিং জেলার দার্জিলিং মহকুমায় এই পার্বত্যঞ্চল। সান্দাকফুর উচ্চতা ১১,৯২৯ ফুট।

সান্দাকফুতে বড়ো ভিড়। তবু দলে দলে লোক চলেছে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে কাছ থেকে দেখতে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। থাকার ব্যবস্থা যথেষ্টই। ওদিকে নেপাল বর্ডারেও বড়ো বড়ো হোটেল। নেপালের মধ্যে দিয়ে মাঝে মাঝেই পথ চলেছে। সীমানা বোঝা বড়ো দায়। ছোটো ছোটো গ্রামের মধ্যে দিয়ে পথ। দু-একটি বাড়ি। কোথাও বা সারি সারি ঘর। দু-একটা দোকান। আর দু-পারে বন্দুক হাতে পাহারাদার। আমার-আপনার বাড়ির ছেলেরা, সীমান্তের পাহারাওলা। যেন পাথরের মূর্তি। মনে মনে ওদের কুর্নিশ জানাই। যে দেশেরই হোক—ওদের জন্যই তো আমরা নিরাপদে ঘুমোতে যাই। ওরা জেগে থাকে।

ওরা জেগে থাকে। অরণ্য বাংলায় অথবা অরণ্য-বাংলা লাগোয়া কোনও দেশে। শুধু তো মানুষ নয়, যুদ্ধ নয়। আরও কতো বড়ো দায়িত্ব ওদের। অরণ্যসম্পদের সংরক্ষণ ও রক্ষণের দায়িত্বও তো ওদের পালন করতে হয়।

সান্দাকফু থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা

আপনমনেই ফুটে থাকে এমন সব ফুল

প্রকৃতি নিজের মতো করে বিস্তার খোঁজে। দেশনেতারা সীমানা বানায় প্রকৃতির খেয়ালকে মাথায় রেখে। ওই নদী পর্যন্ত আমার। ওই অরণ্যের ওই দিকটি তোমার। ওই পাহাড়ের ওপারে তোমার সীমানা। এইভাবেই ভাগ-বাঁটোয়ারা চলে। তবু একই অরণ্য কত টুকরোই না হয়। একই নদী কতো দেশে-প্রদেশে বয়ে চলে। নানা নামে। নানা গতিতে। নানা মতিতে। পাহাড়ের উচ্চতাতেই কত-না রকমফের। ফলে ভূ-প্রকৃতি ভিন্ন হয়ে যায়। তাপমাত্রা আলাদা হয়। বৃষ্টির পরিমাণে হেরফের ঘটে। গাছের বৈশিষ্ট্য আলাদা হয়।

দার্জিলিং-এ এইসব কারণে অরণ্য আশ্চর্যরকম সুন্দর। সান্দাকফু-ফালুটের এই অরণ্য পথেই রোমাঞ্চ প্রিয় মানুষের আনাগোনা।

সান্দাকফু নামের মানে Hill of poison plants। সর্বোচ্চ চূড়ার থেকে ২০০০ ফুট নীচে অ্যাকোনাইট জাতীয় গাছের ঘন সন্নিবেশ। হেমলকের অরণ্য দেখা যায় এখানে।

সান্দাকফুতে নেপাল সীমান্তে হোটেল শেরপা চ্যালেট

নৈসর্গিক কালিপোখরি

কালিপোখরি। একটি নৈস্বর্গিক পরিবেশ তৈরি করেছে এই ট্রেকিং রুটে। টংলু বা টমলুং থেকে সান্দাকফু যাওয়ার পথে কালিপোখরি। এখানে বেশ কিছু স্থানীয় মানুষের বসবাস। তাই ট্রেকাররা স্বচ্ছন্দে এখানে থেকে যেতে পারে। থাকা-খাওয়ার যথেষ্ট ব্যবস্থা এখানে আছে। টংলু থেকে ১৫ কিলোমিটার। কালিপোখরির কালো রঙের পুকুরটা এই নামের উৎস। এই জল কখনো জমে যায় না। সারা বছরই এখানে জল থাকে। এই জলকে ঘিরেই এখানে ছোট্ট গ্রামটি গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলের মানুষেরা এটিকে একটি পবিত্র পুকুর বলে মনে করে। কালিপোখরি থেকে সান্দাকফু মাত্র ৬ কিলোমিটার।

পাহাড়ি গার্হস্থ জীবন

পথে পথে ফুটে আছে ফুল

টংলু—১০,০৭৪ ফুট উচ্চতার সিঙ্গলিলার আরেক শৃঙ্গ। নেপাল সীমান্তের এই গ্রাম দার্জিলিং শহর থেকে ২৩ মাইল দূরে। এখান থেকে দেখা যায় নেপালি উপত্যকা, উত্তরবঙ্গের সমভূমি, পূবে তিস্তা, পশ্চিমে কোশি এবং মাঝে অনেক ছোটো ছোটো নদী। টংলুর টঙের বাংলো থেকে আজও হয়তো পর্যটকরা সেই অপরূপ দৃশ্য দেখবেন, স্যার জোসেফ হুকার (Sir Joseph Hooker) হিমালয়ান জার্নালে যেমন লিখেছিলেন, "From the summit of Tonglu I enjoyed the view... In the early morning the transparency of the atmosphere- readers this view one of astonishing grandeur, Kinchinjunga bore nearly due north, a dazzling mass of snowy peaks, interested by blue glaciers, which gleamed in the standing rays of the rising sun, like aquamarines set in frosted silver."

টংলু থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা

টংলুর জিটি-এ বাংলো

ধোত্রে গ্রামের দুই প্রজন্ম—প্রবীণ ও নবীন

পথের বাঁকে বাঁকে সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়ে আছে এই অঞ্চলের মানুষের যাপনচিত্রের কত বর্ণময় বাহার।

সান্দাকফু-ফালুট ট্রেকিং রুটে ছড়িয়ে আছে মনোরম সব পাহাড়ি গ্রাম। চিত্রে, মেঘমা, টংলু, টুমলিং, জৌবাড়ি, গৈরিবাস, বিকেভঞ্জন, শ্রীখোলা, রাম্মাম, রিমবিক, গোর্খে, ধোত্রে—কত-না গ্রাম। পথের বাঁকে বাঁকে সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়ে আছে এই অঞ্চলের মানুষের যাপনচিত্রের কত বর্ণময় বাহার। শুধু প্রকৃতি নয়, প্রকৃতি লগ্ন মানুষের সান্নিধ্যও এই যাত্রা পথের উপরি পাওনা। ছোট শিশুরা খেলার ছন্দে তৈরি করে অসাধারণ চিত্রপট। তেমনি প্রায় শতবর্ষের কাছাকাছি বয়সি বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হয়, আলাপ জমে ওঠে। শোনা যায় কত না-জানা ইতিহাস।

এই অচেনা অজানা বাংলাকে খুঁজে নেবার জন্য সিঙ্গলীলা রেঞ্জের এই গভীর অরণ্যে বারবার পাড়ি জমাতে হয়। হয় হেঁটে। নয় গাড়িতে। ফালুট-সান্দাকফু এখন তাই আমাদের ঘরের কাছের পাহাড়-অরণ্য।

লেখা - সুপ্রিয়া রায়
ছবি - কাজল বিশ্বাস

হাঁটাপথে

ফালুট-সান্দাকফু

১

সান্দাকফু ট্রেকিং শুরু করা যায় দার্জিলিং জেলার মানেভঞ্জন থেকে। সাত হাজার চুয়ান্ন ফুট উচ্চতার এই ছোট্ট শহরকে সিঙ্গলীলা ও সান্দাকফু-এর গেট-ওয়ে বলা হয়। এনজেপি স্টেশন থেকে গাড়িতে চার ঘণ্টায় এখানে পৌঁছে যাওয়া যায়।

বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে মাত্র কয়েক কিমি দূরত্বে হলেও ঘুর পথে যেতে হয়, পাড়ি দিতে হয় অনেকটা পথ। মিরিকের মধ্য দিয়ে এই পথ চলেছে। দার্জিলিং থেকে ছাব্বিশ কিমি দূরে মানেভঞ্জন। গাড়িতে সময় লাগে এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট।

২
মানেভঞ্জনের বনবাংলো

অনেকেই মানেভঞ্জন-এ গিয়ে একদিন থাকে। এখন রেজিস্টার্ড গাইড/ পোর্টার কাম গাইড ছাড়া এই পথে ট্রেক করার অনুমতি দেওয়া হয় না। দুপুর বারোটার মধ্যে পৌঁছতে হয় মানেভঞ্জনে। তারপর পৌঁছলে সেইদিন আর কাজ না হওয়ার সম্ভাবনা।

মানেভঞ্জন থেকে অভিযাত্রীরা/ ট্রেকাররা প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কেনে। মানেভঞ্জন হল শেরপাদের গ্রাম। এখানে হোটেল ছাড়াও অনেক হোম-স্টে আছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও চোখ জুড়িয়ে দেয়। সহজ-সরল পাহাড়ি মানুষ। এদের সঙ্গে ট্রেকারদের সহজেই আত্মীয়তা বা অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। তাঁদের আন্তরিক আতিথেয়তায় ঘর-ছাড়া ট্রেকার ঘর পেয়ে যায়।

মানেভঞ্জন থেকে সান্দাকফু ৩২ কিমি। প্রতিদিন ৮-৯ কিমি হেঁটে ৩ বা ৪ দিনে ট্রেক করে। সান্দাকফু থেকে ফালুট ২১ কিমি। এই পথ যেতে আরও ১দিন সময় লাগে। ৪ থেকে ৫ দিনে পুরো ট্রেক করে ফেরা যায়। অনেকেই এক পথে যায়, আর ফিরতি পথে অন্য রুট ধরে। অভিজ্ঞ

সান্দাকফু থেকে ফালুটের পথে
৩

ট্রেকারদের কাছে এই সান্দাকফু ট্রেকিং যেন কিছুই না। কিন্তু উৎসাহী সাধারণ পর্যটকদের কাছে কোনও কোনও জায়গা বেশ কঠিনই মনে হয়।

এই পথে ট্রেক করতে গেলে ট্রেকিং রুটটার মানচিত্র ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার। এই ম্যাপ দেখেই দূরত্ব এবং উচ্চতার ধারণা তৈরি করে নিতে হবে। ভারত এবং নেপালের সীমান্ত দিয়ে চলেছে এই ট্রেক রুট। অনেক জায়গাতেই নেপালের মধ্য দিয়ে যেতে হয় হেঁটে বা গাড়িতেও।

৪

মানেভঞ্জন

অনেক জায়গাতেই একাধিক রুটে যাওয়া যায়। ভারত অথবা নেপাল যেকোনও দেশের মধ্যে দিয়েই যাওয়া যায়। এর জন্য কোনও পাসপোর্ট বা ভিসা লাগে না। এটা একেবারেই ফ্রি জোন। বিদেশিরাও যেতে পারে। তবে বিদেশিদের কাছে পাসপোর্ট ও ভিসা অবশ্যই থাকতে হবে, অন্যদের কাছে আইডেনটিটি-প্রুফ কিছু থাকা বাঞ্ছনীয়। যে কোনও সময়েই চেক করা হতে পারে। সিঙ্গলীলা জাতীয় উদ্যানের মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য অনুমতি ও টিকিট লাগে। মানেভঞ্জন থেকে যাত্রা শুরু করার ১০-১২ মিনিটের মধ্যেই সিঙ্গলীলা বন্যপ্রাণ বিভাগের কার্যালয়। এখান থেকেই পারমিট পাওয়া যায়।

৫

সান্দাকফু পর্যন্ত বোল্ডার বিছানো যে পথটা চলে গিয়েছে, যাতে চার চাকাও যায় সেই পথেই ট্রেক করা হত। ২০০১ সালে গোর্খা হিল কাউন্সিল

অন্যান্য পথ দিয়ে ট্রেক করার ব্যবস্থা করেছে। কখনও তা মাটির, কখনও উপত্যকা, কখনও অরণ্যর সরু পথ, কখনও বা পাথর কেটে ধাপ। যার যেমন ইচ্ছে চলতে পারে। কোথাওবা শুধু একটাই রাস্তা।

চিত্রে- মানেভঞ্জন থেকে ৩ কিমি দূরে চিত্রে। ছোট্ট গ্রাম। খুব চড়াই পথ। হেঁটে যেতে সময় লাগে দেড় ঘণ্টা। পাইন, ফার, বার্চ আর বাঁশের ঝাড় দু'পাশে। পথশোভা মন জুড়িয়ে দেয়। নির্মল প্রকৃতির মাঝে কাঞ্চনজঙ্ঘাও দেখা যায়। থাকার জন্য আছে হোম-স্টে কাম রেস্টুরেন্ট।

চিত্রেতে আছে বৌদ্ধ মনাস্ট্রি। বৌদ্ধ উৎসবের জন্য এর খ্যাতি আছে। সারি সারি লুংদার টাঙিয়ে রেখেছে। পরিবেশ হয়ে উঠেছে পবিত্র। খোলা আকাশের নীচে এই বৌদ্ধ মনাস্ট্রি যেন বাংলার সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়ের কথাই বলছে। বুদ্ধদেবের শান্তির বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছে আকাশে বাতাসে।

চিত্রে যাওয়ার পথে কষ্টকর চড়াই আছে। অনেকেই এটা এড়াতে মানেভঞ্জন থেকে লামেধুরা হয়ে চলে। লামেধুরার দূরত্বও ৩ কিমি। উচ্চতা ৮,৭৯২ ফুট। দেড় ঘণ্টা হাঁটতে হয়। খাওয়া ও থাকার কিছু ব্যবস্থা আছে। রাস্তার একদিকে নেপাল, একদিকে ভারত। পথ গিয়েছে নেমে। তাই হাঁটাও সুবিধাজনক। লামেধুরা থেকে মেঘমার দিকে পথ আবার চড়াই। চিমল আর ম্যাগনোলিয়ার অরণ্য এই যাত্রাপথকে রমণীয় করে তুলেছে। এপথে রেড পান্ডারও দেখা মিলতে পারে।

মেঘমা- লামেধুরা থেকে প্রায় ঘণ্টা দেড়েকে ৩ কিমি হেঁটে ভারত-নেপাল সীমান্তে ৯৫১৪ ফিট উচ্চতায় মেঘমা।

মেঘমা ঢোকার পথেই আছে বৌদ্ধ মনাস্ট্রি। সশস্ত্র সীমান্ত রক্ষীদের ক্যাম্পও আছে। ছোট্ট হোটেল কাম রেস্টুরেন্টও আছে।

মেঘমা থেকে দুটি পথ গিয়েছে। একটি টংলু-র দিকে আরেকটি টুমলিঙের দিকে। টুমলিঙের দূরত্ব ৪ কিমি। নেপালের অংশ। থাকার জায়গা আছে। এই দুই জায়গা

মেঘমার বৌদ্ধ মনাস্ট্রি ৭

সান্দাকফু-ফালুটের যাত্রাপথের দৃশ্য ৮

থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। টংলুতে জিটিএ-র থাকার জায়গার পাশে জেলাশাসকের বাংলো আছে। টুমলিং ও টংলু দু'দিক থেকেই পথ গিয়ে মিলেছে একই দিকে। টংলু-র দিকে গেলে ২ কিমি বেশি পথ চলতে হবে।

শীতে মেঘমার পর থেকেই বরফে পথ ঢেকে যায়। অন্যসময় উপত্যকা, চারণভূমি, গর্জ এবং উষর ভূমি দেখা যায়।

মেঘমা থেকে টংলু ২ কিমি দূরে। ১০,১৩০ ফুট উচ্চতা। টংলু থেকে টুমলিং ২ কিমি দূরে। উচ্চতা ৯৬০০ ফুট। পথটা খুব খাড়াই। গৈরিবাসের দিকে নেমে গেছে রাস্তা। অনেকটাই সমতল।

টংলুর তুলনায় টুমলিং-এ অনেক প্রাইভেট হোটেল আছে। তাই ট্রেকার বা পর্যটকেরা টুমলিং-এ থাকতে চায়। এই পর্যন্ত বিদ্যুৎ আছে। সৌরালোক আছে সব পথেই।

টুমলিং থেকে ১ কিমি গেলে সিঙ্গলীলা জাতীয় উদ্যানের গেট। এইখানে চেকপোস্টে পারমিট দেখাতে হয়।

সিঙ্গলীলা জাতীয় উদ্যানে কয়েক গজ গেলেই পথ গিয়েছে তিন দিকে। বাঁদিকের পথ গিয়েছে নেপালের মধ্য দিয়ে। জৌবাড়ির দিকে। আরও গেলে গৈরিবাস। এই পথে নেপালের গড়ানো তৃণভূমি/ চারণভূমি

ঝরা রডোডেনড্রনের
রক্তিম পথে চলেছে অভিযাত্রী

১০

টংলু—নিবিড় একাকিত্বে ডুবে যায় পর্যটক

ম্যাগনোলিয়া আকাশ ছেয়েছে

১১

বিকেভঞ্জন

চোখ কেড়ে নেয়। অন্য পথটি গিয়েছে অরণ্যের মধ্যে দিয়ে গৈরিবাসের দিকে। এই পথ ভারতীয় সীমানাতেই। এখন এই পথ কংক্রিটের। এই পথে বেশি চলে গাড়ি। তৃতীয় পথটা চলেছে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গৈরিবাস।

জৌবাড়ি পর্যন্ত পথ অনেকটা সমতল। জৌবাড়ি থেকে পথ নেমে গিয়েছে। খুব খাড়াই ও পিচ্ছিলও। এখান থেকে ১ কিমি গেলে ৮৬০০ ফুট উচ্চতার গৈরিবাস। এখানে জিটিএ বাংলো অসাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশে। আগে থেকে বুকিং করতে হয়। বাঁশের গভীর জঙ্গলের এই পথ বসন্তে লাল রডোডেনড্রনে সেজে ওঠে। এই রূপের মোহে বিশ্বের পর্যটক ছুটে আসে।

গৈরিবাস থেকে ৬ কিমি দূরে কালিপোখরি। ওক, রডোডেনড্রন, বাঁশের অরণ্যে ৩ ঘণ্টায় হেঁটে এখানে পৌঁছানো যায়।

বিকেভঞ্জন হয়ে সান্দাকফু এখান থেকে ৬ কিমি দূরে। শেষ ৪ কিমি খুব চড়াই। কষ্টকর। লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথটুকু যাকে বলে কারও কারও কাছে প্রাণান্তকর হয়ে ওঠে। তারপর অপরূপ সান্দাকফু। এখান থেকে ১৮০ ডিগ্রি কোণে পৃথিবীর অপরূপ শৃঙ্গগুলি নিয়ে জেগে থাকা তুষারমৌলি হিমালয়-কে দেখা যায়। এরই টানে মানুষ ছুটে আসে এখানে।

থাকার জন্য জিটিএ-র লজ আছে। নেপাল সীমান্তে হোটেল শেরপা চ্যালেট-এর অবস্থান সবচেয়ে ভালো। অনেক প্রাইভেট হোটেলও গড়ে উঠেছে।

গৈরিবাসের জিটিএ বাংলো

১৪

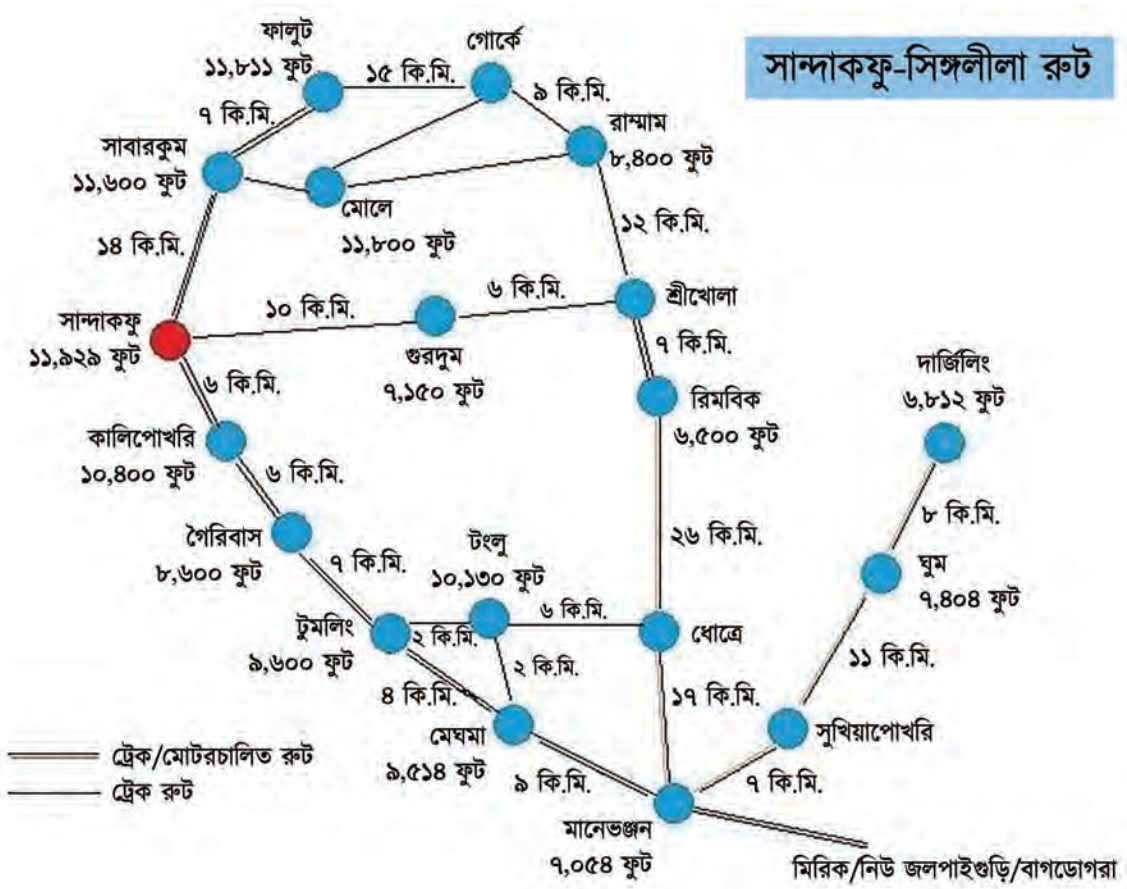

সান্দাকফু-সিঙ্গলীলা রুট
ফালুট
১১,৮১১ ফুট
গোর্কে
১৫ কি.মি.
৯ কি.মি.
৭ কি.মি.
রাম্মাম
৮,৪০০ ফুট
সাবারকুম
১১,৬০০ ফুট
মোলে
১১,৮০০ ফুট
১২ কি.মি.
১৪ কি.মি.
৬ কি.মি.
শ্রীখোলা
সান্দাকফু
১১,৯২৯ ফুট
১০ কি.মি.
গুরদুম
৭,১৫০ ফুট
৭ কি.মি.
৬ কি.মি.
রিমবিক
৬,৫০০ ফুট
দার্জিলিং
৬,৮১২ ফুট
কালিপোখরি
১০,৪০০ ফুট
৬ কি.মি.
গৈরিবাস
৮,৬০০ ফুট
৭ কি.মি.
টংলু
১০,১৩০ ফুট
২৬ কি.মি.
৮ কি.মি.
ঘুম
৭,৪০৪ ফুট
টুমলিং
৯,৬০০ ফুট
২ কি.মি.
৬ কি.মি.
ধোত্রে
২ কি.মি.
১১ কি.মি.
৪ কি.মি.
১৭ কি.মি.
মেঘমা
৯,৫১৪ ফুট
সুখিয়াপোখরি
৯ কি.মি.
৭ কি.মি.
ট্রেক/মোটরচালিত রুট
ট্রেক রুট
মানেভঞ্জন
৭,০৫৪ ফুট
মিরিক/নিউ জলপাইগুড়ি/বাগডোগরা

১৫

সান্দাকফু থেকে ফালুট যেতে অনেক সময় সবরগ্রাম বা সবরকুম থেকে মোলেতে গিয়ে বিশ্রাম নেন ট্রেকাররা। পরদিন ওখান থেকে ফালুট। তারপর ফেরার পালা। ফালুট থেকে গোর্খে হয়ে রাম্মাম, শ্রীখোলা, রিম্বিক। কেউ বা সান্দাকফু থেকে গুরদুং হয়ে শ্রীখোলা যাচ্ছে। সেখান থেকে রিম্বিক।

সান্দাকফু থেকে শ্রীখোলা পায়ে হেঁটে চলে আসা যায়। শিলিগুড়ি থেকেও সরাসরি গাড়িতে আসা যায় শ্রীখোলা। নদী, পাহাড়, অরণ্য, পাহাড়ি গাঁও, শান্ত জনজীবন— সব মিলিয়ে শ্রীখোলা অনবদ্য। যে কোন সময়ে এখান থেকেও পাড়ি জমানো যায় সান্দাকফু-ফালুটে। মায়াময়, গা-ছমছমানো জঙ্গলের পথে হেঁটে। সঙ্গে অবশ্যই গাইড। মাল বওয়ার জন্য মিলতে পারে ঘোড়া।

ফালুট থেকে গোর্খে গ্রাম হয়ে ফেরা যায়

১৬

১৭

শ্রীখোলার পথে

১৮

শান্তির দূত যেন

১৯

শ্রীখোলায় থাকার হোটেল

লেখা - সুপ্রিয়া রায়
ছবি - কাজল বিশ্বাস
২, ৫, ৯, ১১, ১৩, ১৬ সংখ্যক ছবিগুলো অন্য সূত্র থেকে নেওয়া

ডেস্টিনেশন
জঙ্গলমহল

চলুন লং ড্রাইভে জঙ্গলমহল

বাংলার ইয়ং জেনারেশনের কাছে জঙ্গলমহল উইক এন্ডের লং ড্রাইভের নেশা ধরিয়েছে।

জঙ্গলমহলকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে চলে গিয়েছে মসৃণ রাস্তা। মনের সুখে গতির সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়া ছুটির আমেজ উপভোগ করার সুযোগ এসেছে।

ঘরের পাশেই জঙ্গলমহল।

বামনি ঝরনার জল গড়িয়ে চলেছে (পুরুলিয়া)

প্রকৃতির টানটান আকর্ষণ। যে কোনো ঋতুতেই রাজ্যের নানা প্রান্তের বাইকাররা ছোট্ট অভিযানে বেরিয়ে পড়ছেন। একটি কী দুটি রাতের গল্প। বেরিয়ে পড়ছেন নিজস্ব বা ভাড়ায়, চারচাকা নিয়ে।

গত আট বছরে জঙ্গলমহল হয়ে উঠেছে এতটাই নিরাপদ গন্তব্য। ঝিম ধরানো একটা নেশা আছে জঙ্গলমহল ভ্রমণের।

এর আরণ্যক মাদকতা উত্তরের অরণ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর রুক্ষতার মধ্যেই এর সৌন্দর্য। এর নীরবতার ভাষায় অন্য এক তাৎপর্য ধরা দেয়।

জঙ্গলমহলের সব দুয়ার আগল করে দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। বাংলায় পরিবর্তনের প্রথম সিলমোহর এখানেই পোঁতা হয়েছে।

তিনি এখানে পথ তৈরি করেছেন, যে পথ বাইরের জগৎকে টেনে আনছে জঙ্গলমহলের কাছে।

দূর হয়েছে অন্ধকার। সব অর্থেই, নিন্দুকেরাও স্বীকার করছেন একবাক্যে সে কথা।

মার্বেল লেক (পুরুলিয়া)

শুধু কি গাড়ি ছুটিয়ে পাড়ি দেবেন জঙ্গলমহলে, তাই বা মন্দ কি?

পথের তো অন্ত নেই। যে দিক দিয়ে খুশি ঢুকে যান। মন যেমন চাইবে, তেমনভাবে পরিভ্রমণ করুন।

অবাধে জঙ্গলমহলের বিস্তৃত সীমানায় অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড, বিহার বা ওড়িশায় বেরিয়ে পড়তে পারেন, আবার

এক চক্কর দিয়ে ফিরে আসতে পারেন।

চাকা ঘুরতে থাকবে। কলকাতা থেকে কাঁকড়াঝোড়। কাঁকড়াঝোড় থেকে মনপসন্দ ছুট। হয় ঘাটশিলা, গালুডি, নয় অযোধ্যা পাহাড়। শুধু আপনার ডিসিশান। সত্যি বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। আপনার মুঠোফোনে বা স্মার্টফোনে একের পর এক জঙ্গলমহল ট্যুরের ইউটিউবগুলো চালান।

আপনিও সঙ্গী হয়ে পড়বেন ওদের সঙ্গে। যাদবপুর থেকে বাইক নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ল। খড়গপুর থেকে সঙ্গী হল আরও কয়েকজন। চলল ঝাড়গ্রাম। বেলপাহাড়ি হয়ে কাঁকড়াঝোড়। তারপর পাড়ি দিল অযোধ্যা পাহাড়। উদ্দাম গতিতে যেন উড়ছে ওরা।

সাঁঝবেলাতে অযোধ্যা পাহাড়ে, পথের ধারে ক্যাম্পে একটা রাত। আবার আলো ফুটতে না ফুটতেই ফিরতি পথে একের পর এক অচেনা দর্শন। অন্ধকার নিবিড় হওয়ার আগেই বেশ কিছুদিনের জন্য মন ভালো করার রসদ নিয়ে আপন কুলায় ফেরা।

এইরকম কতই না ইউটিউবে জঙ্গলমহলকে পাবেন। এই ইউটিউব দেখতে দেখতে আপনিও চাঙা হয়ে উঠবেন।

প্রকৃতির কাছে এই যে একটু ঘুরে আসা, এটা যে আজকের নাগরিক জীবনের কাছে কতটা, সেকথা বলে বোঝানো যাবে না।

কিন্তু এটা খুব প্রয়োজনীয়। প্রয়োজনীয় সমস্ত বয়সের মানুষের কাছে।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমদিকে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম—মূলত এই চারটি জেলাই জঙ্গলমহলের মূল সীমানার অন্তর্ভুক্ত। বীরভূম, বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুরের কিছু অঞ্চলও এর আওতায় চলে আসে।

ছোটনাগপুর মালভূমির উষর প্রকৃতিতে শাল-পলাশের মিঠে মৌতাতের ঝিম ধরানো লাল মাটির এই দেশ। ক'দিন আগেও ভুল করে ফিরে এসেছিল বৃদ্ধ বাঘমশাই। অর্থাৎ এহেন জঙ্গলের চরিত্র যে ঠিক কিরকম সেকথা আর নতুন করে বলার কি আছে।

হাতির পাল তো অহরহ অতিষ্ঠ করে তুলছে গ্রামজীবন। স্নান সেরে গৃহস্থের গোলাঘর, চাষের খেত সব জায়গায় ঢুঁ মারছে খাবারের সন্ধানে। হাতি সামলাতে ব্যস্ত প্রশাসন। হিমশিম খাচ্ছে সর্বদা। ক্ষতিপূরণ দিতে

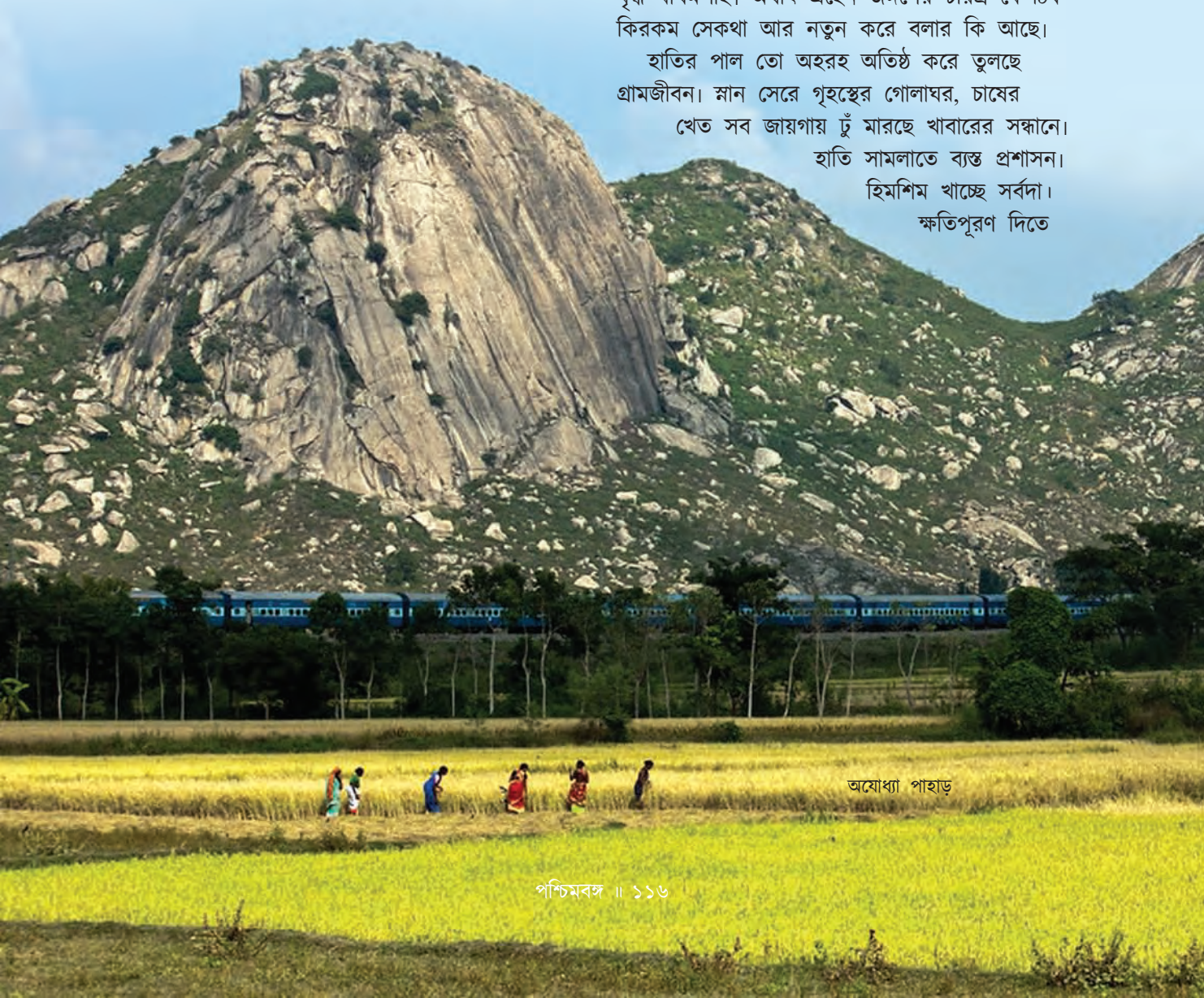

অযোধ্যা পাহাড়

পুরুলিয়ার জয়ন্তী পাহাড়ের গায়ে সদ্যনির্মিত রাজ্য সরকারের যুব আবাস

বাঁকুড়ার ঝিলিমিলিতে নতুন ঠাঁই

সরকারের কোষাগার ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। মরছে মানুষ। আতঙ্কিত অরণ্যবাসী।

বাধছে দ্বন্দ্ব। হাতির বসতিতে মানুষ ঘর বেঁধেছে, না মানুষের বসতিতে হাতি হানা দিচ্ছে।

পরিবেশবিদদের গম্ভীর ভাষ্য কেউ কানেও তুলছে না। ওদিকে বনবিভাগের সাজ সাজ রব সর্বদা। কর্মীরা সন্ত্রস্ত, সজাগ, আশঙ্কিত, আতঙ্কিত। তাঁদের ওপর যেন খাঁড়া ঝুলছে। হাতির পাল কখন কোনদিকে গেল, সামলাও, তাড়াও, হল্লা পার্টি জড়ো করো।

অর্থাৎ আপনার নিরুপদ্রব লং ড্রাইভে হাতির পাল যেন সামনে এসে দাঁড়িয়ে না পড়ে, সরকার কিন্তু সে ঝক্কি সামলাচ্ছে। জেলা জুড়ে জুড়ে বনদপ্তরের কর্মী-আধিকারিকরা নীরবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। তাঁদের একটু সাধুবাদ জানাবেন কিন্তু।

নিশ্চয়ই হাতির পাল দেখতে ইচ্ছে করবে। স্বাভাবিক। নয়তো জঙ্গল ট্যুরের মজা কোথায়। ভাগ্য ভালো থাকলে মিলে যেতে পারে। শুধু হাতি কেন, আরও অনেক কিছুই।

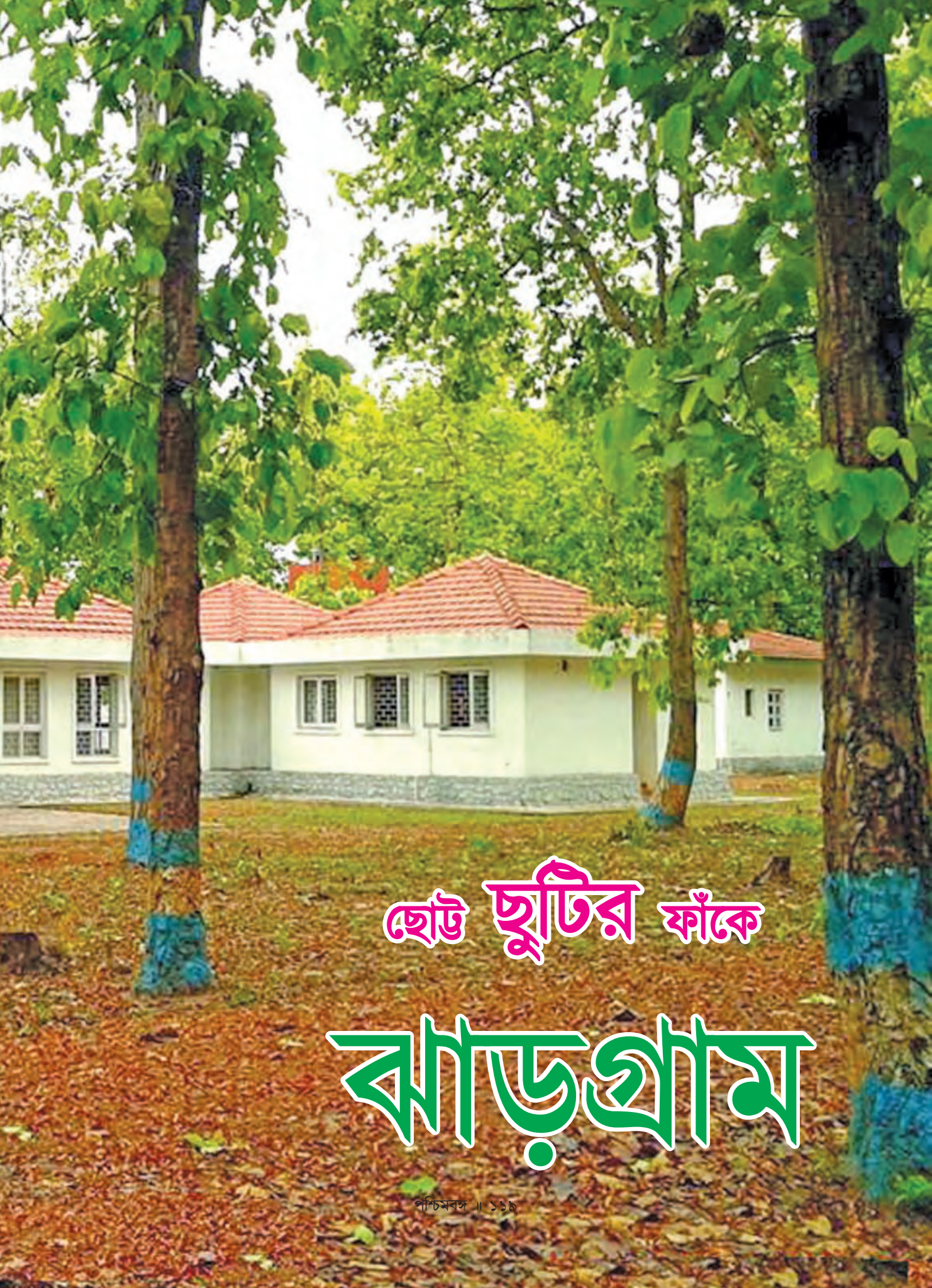

ছোট্ট ছুটির ফাঁকে

ঝাড়গ্রাম

দু'দিনের ছুটি। বেরিয়ে পড়ুন। চলুন ঝাড়গ্রাম। রাজবাড়িতে থাকার সাধ থাকলে আগে থেকে ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে থাকার অভিজ্ঞতা আলাদা। থাকতে পারেন রাজবাড়ি লাগোয়া নবনির্মিত সরকারি টুরিস্ট লজে।

আজও জঙ্গলের গন্ধ গায়ে মেখে আছে পরিবেশটা। এটাকেই হয়তো ঐতিহ্য বলে। এখানে থেকে বা পার্শ্ববর্তী কোনো হোটেলে থেকে কটা দিন জঙ্গলবাসের স্বাদ নিতে পারেন। লোধাশুলিতে গড়ে উঠেছে বন দপ্তরের সুসজ্জিত কটেজ। আরণ্যক পরিবেশ। রাজ পরিবারের মন্দিরে গিয়ে পুজো দিন। চলে যান চিলকিগড়ের কনকদুর্গার মন্দিরে। জঙ্গলের আরেক রূপ দেখবেন।

এই দেশ বা রাজ্যে কত ঘটনাই তো ঘটেছে, কিন্তু এইসব অরণ্য আজও নিজস্বতায় ভরপুর। নদী, অরণ্য, টিলার মধ্যে একা একা ঘুরে বেড়ান। দিনের বেলায়ও রাতের আঁধার যেন। দুর্লভ ওষধির সংরক্ষণ চলছে। সর্বদা প্রহরা তাই। তাছাড়া জঙ্গল-সীমান্তের কড়া নিরাপত্তার ব্যাপারও আছে।

মন্দিরে ঘুরতে ঘুরতে শুনে নিন মন্দিরের ইতিহাস। রাজবাড়ির গল্পকথা। মোলাকাত হতে পারে রাজবাড়ির লোকেদের সঙ্গেও। দুর্গাপুজোর সময়। নবমীর ছাগ ও মোষ বলি বিখ্যাত। দেখা মিলবে গ্রাম উজাড় করে আসা স্থানীয় আদিবাসীদের সঙ্গে। সারাটা দিন কাটাতে পারেন তাঁদের সঙ্গে। জঙ্গলমহলের সে যেন আরেক রূপ। ভেবে নিন কি করবেন, সামনেই শারদীয় উৎসব। প্রোগ্রাম ঠিক করে নিন।

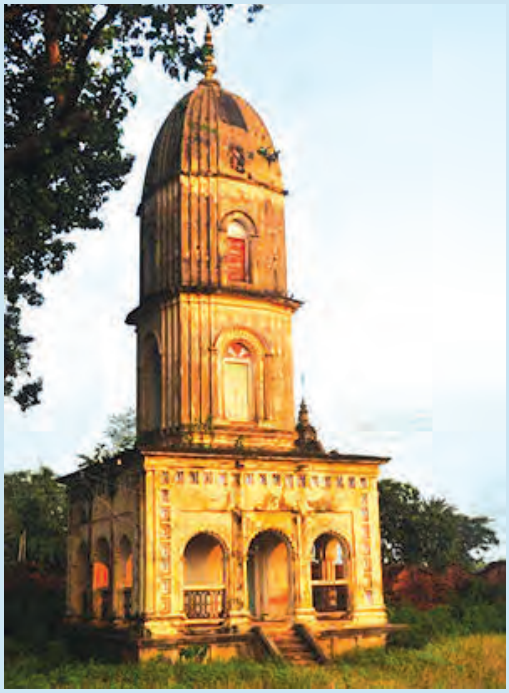

চিলকিগড়ের মন্দির

ডুলুং নদী

চিলকিগড়ের অরণ্য—দুর্লভ ঔষধি গাছের আকর

চিলকিগড় রাজবাড়ি

চিলকিগড়ে কনকদূর্গা মন্দিরের সামনের দিক

হাতিবাড়ির রোমান্টিক আবাস

ঝাড়গ্রামে আরও অনেক কিছুই আছে।

চিলকিগড় থেকে চলে যান গিধনি। আরণ্যক পরিবেশের স্বাদ নিতে নিতে দেখে নিতে পারেন আদিবাসী গ্রামগুলো আর অনুকূল ঠাকুরের আশ্রম। যে কোনো আশ্রমই আমাদের মানসিক প্রশান্তি দেয়।

চলে যেতে পারেন গোপীবল্লভপুরের শ্রীপাট। মহন্ত মহারাজের কাছে শুনে নিতে পারেন রসিকানন্দের অলৌকিক কথকতা। জঙ্গলমহলের আরেক রূপ ধরা দেবে। আপনার ভ্রমণকে অন্য তৎপর্য দেবে। দেখে নিন, ভাঙা মঠের অপূর্ব কারুকাজ। জেনে নিন, এদের উৎসবের দিনপঞ্জি। ইচ্ছে হলে আবার যান। উৎসবে অংশ নিন।

যদি চললেন গোপীবল্লভপুর, তবে চলুন হাতিবাড়ি।

শুধু হাতিবাড়িতে চলে যেতে পারেন দু'দিন থাকার জন্য। আছে বন বাংলো, পর্যটন দপ্তরের ঘরও। আগাম বুকিং দরকার। দলবেঁধে চলে যান। হাতিবাড়িকে কেন্দ্র করে বাংরিপোসীও ঘুরে আসতে পারেন।

কলকাতা থেকে বাস যাচ্ছে ৬নং জাতীয় সড়ক ধরে হাতিবাড়ি। তিনরাজ্যের সীমানায় হাতিবাড়ি। সুবর্ণরেখার ধারে। ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, মনে চাইলে ঘুরে আসুন। সীমানার বাধা মানবেন না। তবে নদীর ধারে বসে থাকতে চাইবে মন। পাহাড়, অরণ্য, নদী আপনার প্রকৃত জীবন আনন্দের কাব্য তো বটেই। সুখবিলাসের বা দুখবিলাসের এ সুযোগ ছাড়বেন না কিছুতেই। নিজেকে উপহার দিন একেবারে নিজস্ব কিছু মুহূর্ত। তবে সতর্ক থাকবেন, এসব ট্যুরে কিন্তু সঙ্গী হবে শুধু মনের মানুষেরা। যাঁরা নিরিবিলি ভালবাসেন, আবার হইচই-এও মাততে পারেন সমান তালে। তবেই মজবে ছুটির দিনগুলো বা মুহূর্তরা।

এখনই যাবার জন্য মন উশখুশ করছে। স্বাভাবিক তো সেটাই।

গাড়ি ঘুরিয়ে চলে যেতে পারেন নয়াগ্রামেও। পুরোনো রাজবাড়ি আছে। আছে জঙ্গলের ভিতরে ভিতরে অনেক গ্রাম। জনজাতির বাস। তাঁদের সঙ্গে কিছু সময় কাটান। তাঁদের জীবনভাষ্য শুনতে শুনতে মনটা অন্যরকম হয়ে যাবে।

হাতিবাড়ি

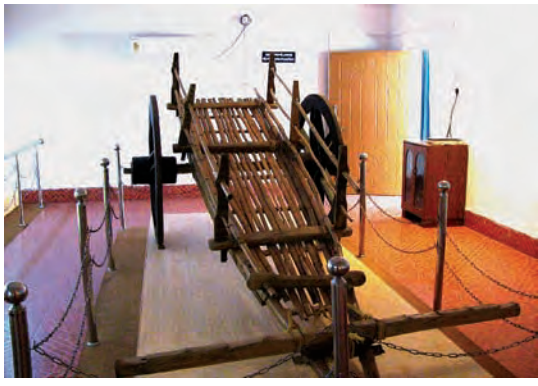

ভসরাঘাট সেতু পেরিয়ে চলে যেতে পারেন খড়গপুর। অথবা হাতিবাড়ি যাবার আগে বা ফিরতি পথে গোপীবল্লভপুর ১/২-এর নতুন পর্যটন কেন্দ্র ঘুরে আসুন। দেখে নিতে পারেন ঝিল্লি পাখিরালয়। জল দেখে মন ভরে যাবে।

লং ড্রাইভে চলতে চলতে বিশ্রাম নিয়ে নিন। গ্রামের মানুষজনের সঙ্গে টুকিটাকি আলাপচারিতা করতে ভুলবেন না। এই ধরনের ভ্রমণে এটাই আসল সংগ্রহ। বুঝে যাবেন আর্থ-সামাজিক পারদের উচ্চতা। তবে একটু সতর্কভাবে সব জেনে নিতে হবে। কথায় কথায় জেনে নিন ইতিহাস, ভূগোলও। খুঁটিনাটি নানান তথ্য, যা আপনার মন জানতে চায়। নোটবন্দি করুন। নিজের বা অন্যের জন্য। FACEBOOK বা WHATSAPP-এর বন্ধুদের জন্য। যেকোনো সঠিক তথ্যই সংগ্রহ করা ও সংগ্রহে রাখা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

ঝাড়গ্রাম থেকে চলে যেতে পারেন লালগড়। বিখ্যাত সব জঙ্গল। দেখে নিন। দেখুন লালগড়ের, রামগড়ের প্রাচীন রাজবাড়ি। কথায় কথায় শুনে নিন ইতিহাস। জঙ্গলমহলের এইসব কাহিনি না জানলে জঙ্গলমহল অধরা থেকে যাবে। লালগড়, রামগড়ের প্রত্যন্ত গ্রামগুলো নিজের চোখে দেখুন। জঙ্গলের মধ্যে শবরদের বাস। আরও নানা জনগোষ্ঠীর মানুষেরা আছেন। তাঁদের সঙ্গে মিশে যান কিছুক্ষণের জন্য। তাঁদের সরল জীবনযাপন, কিছুটা সেকেলে জীবনচর্যা, প্রকৃতির মাঝে প্রকৃতিময় জীবন আপনার নাগরিক ভাবনাকে প্রশ্নকাতর করে তুলবে ঠিকই। বাড়ি ফিরে এসেও মনে পড়বে হাতিবাড়ি বা চিলকিগড়ের জঙ্গলের সঙ্গে ওদেরও কথা। তবেই না সত্য হয়ে উঠবে জঙ্গলমহল যাত্রা।

প্রকৃতি পর্যটন কেন্দ্র

শিলদার ভৈরবের থান

ছবি : কাজল বিশ্বাস

দেখে নিতে পারেন ঝাড়গ্রাম থেকে শিলদার হাট। পুজোর ছুটিতে গেলে দেখে নিন দশমীতে ভৈরবের মেলা, পাঁঠাবলি, দিন-রাত পুজো। আদিবাসী ও স্থানীয় হিন্দুরা পরপর দু'দিন উৎসবে মাতে। দলে দলে গাড়ি করে আদিবাসী মানুষেরা ধুলো উড়িয়ে আসে ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, বিহার বা আরও দূরদূরান্ত থেকে। সারা রাত নাচ, গান, নাটক চলে। আদিবাসী সংস্কৃতির এক সাড়া জাগানো সম্মিলন। ভাবনা-চিন্তা-মতামতের আদান-প্রদান, পুজো-পরব, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, সাহিত্য চর্চা-র পাশাপাশি ঘর গেরস্থালির টুকিটাকি জিনিস থেকে আধুনিক সামগ্রীর বিকিকিনির হরেক পসরা নিয়ে জমে ওঠে মেলা।

থাকার জায়গা নেই। ঝাড়গ্রাম বা বেলপাহাড়ি থেকে আপনাকে যাতায়াত করতে হবে। তবে ভিড় থইথই মেলায় সামলাতে হবে অনেক কিছুই। দেখা হবে নানা আদিবাসী মানুষের সঙ্গে। এক জায়গায় এত মানুষ। এটাই উপরি পাওনা। কত অচেনা মুখ, রঙিন সাজ, কত না-শোনা ডাক। ভেঁপুর আওয়াজ, বাঁশির সুর, মাদলের বোল, হাসির ঝলক, পসারির হাঁক, শিশুর কান্না—খোলা আকাশের মাঝে 'একতান' হয়ে বহুদিন কানে বাজবে। নিরালা মধ্যাহ্নে ভেসে উঠবে মনে। মন বলবে আবার যাব ভৈরবের মেলায়।

ভৈরবের থানে পুজোর সমারোহ

থানের ভাঙা পিলারগুলো বলবে—এর একটা ইতিহাস আছে। জানার জন্য আপনিও ছটফট করবেন। শিলদা থেকে চলে যান বাঁকুড়ার সবুজদ্বীপ অথবা বেলপাহাড়ি।

আজও অনাঘ্রাতা। নামের মধ্যেই আছে মাদকতা।

এইসব অঞ্চল বহু প্রাচীন। নদী, ঝোরা, টিলা নিয়ে মন ভালোলাগার নিদান দেওয়া বেলপাহাড়ি। বেলপাহাড়ি ঝাড়গ্রাম থেকেও ঘোরা যায়। আবার

টাটানগরের দিকের ট্রেন ধরে নেমে ট্রেকারে আসা যায়। থাকার জন্য আছে বিডিও অফিস সংলগ্ন দোতলা বাড়িতে থাকার ঘর। হয়েছে নতুন কটেজ। দেখে নেবেন মনে করে ব্রিটিশ আমলের বিডিও বাংলোটি।

বেলপাহাড়ি বাজার বেশ জমজমাট। অনেক দোকানপাট। বাজার ছাড়িয়ে, থানা ছাড়িয়ে বড়ো মাঠে এখন দূরপাল্লার বাসের ডিপো। ব্রিটিশ আমল থেকে এখানে দশেরার অনুষ্ঠান হয় আজও। মাঠের ধারে মাস্টারমশাই-এর দোকান। থাকার ও খাওয়ার সুবিধা আছে। আছে নতুন হোম-স্টে। পঞ্চায়েতের অধীনে বেসরকারি মালিকানা। থাকার পরিচ্ছন্ন নিরিবিলি জায়গা। এইরকম আরও কয়েকটি থাকার ব্যবস্থা করেছে বেলপাহাড়ি পঞ্চায়েত।

বেলপাহাড়ি জঙ্গলমহলের পর্যটন ভাবনায় অন্যতম প্রধান জায়গা নিচ্ছে। পর্যটকেরা আসছেন দলে দলে। এখানে থেকে দু-তিন দিনে জঙ্গলমহলকে নিবিড়ভাবে খুঁজে নেওয়া যায়।

বেলপাহাড়ি থেকে—প্রথম দিন বেলপাহাড়ি থেকে ২২ কিমি দূরে কাঁকড়াঝোড়। বেলপাহাড়ির ইন্দিরা চক থেকে ডানদিকের রাস্তা চলে গিয়েছে কালীমন্দির। কালীমন্দির থেকে হাইস্কুলের দিকে পথ চলেছে। দুপাশে চোখ জুড়ানো টিলা টিলা পাহাড়। কিছুটা গিয়ে পথ যাচ্ছে বাঁ-দিকে চিড়াকুঠি। চিড়াকুঠি থেকে বাঁ-দিকের পথে ঢাঙিকুসুম। স্থানীয়রা বলে ঢাইকুসুম। ডান-দিকের পথ চলেছে কাঁকড়াঝোড়। চিড়াকুঠি থেকে বাঁ-দিকে পাহাড় লাগোয়া নিরালা-নির্জন আদিবাসী গ্রাম। অরণ্য জীবনের চলন্ত ছায়াছবি দেখতে পারেন। কর্মব্যস্ত গ্রামের মানুষেরা। দিনযাপনের কাজে তারা মগ্ন। মুখে কোনো কথা নেই। চোখও যেন কিছুটা নিশ্চল অথবা ভ্রূক্ষেপহীন। তবে ব্যতিক্রমী মানুষও মিলবে পথের সঠিক সন্ধান দিতে।

পথ চলেছে হুদহুদির দিকে

বেলপাহাড়ির কাঁকড়াঝোড়

হুদহুদির ঝরনা যাবার পাথর বিছানো পথ

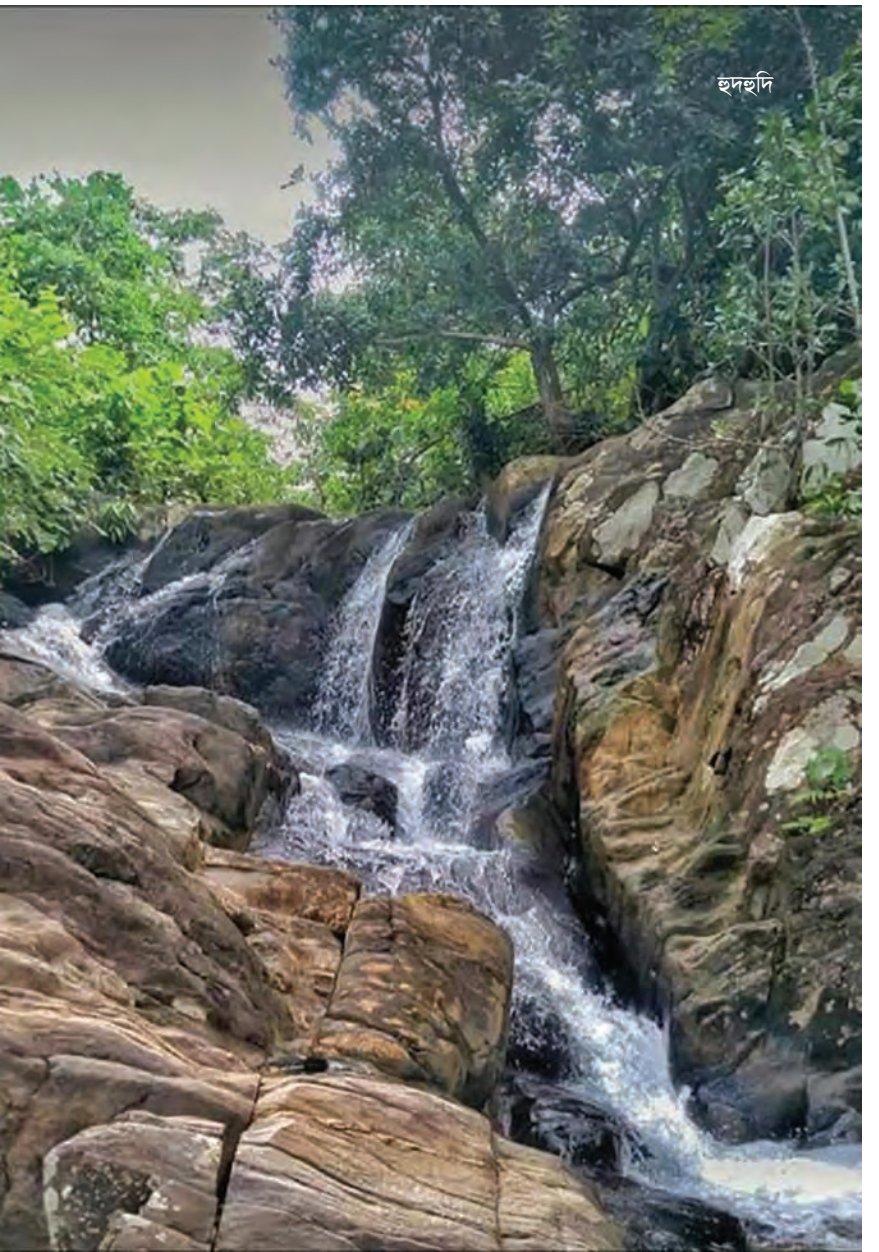

হুদহুদি

ডাঙ্গিকুসুম বা ঢাঙিকুসুম গ্রামে পৌঁছে যান। এখানে পাহাড়ের পাথর কেটে থালা-বাসন তৈরি হয়। গ্রামের বাঁ-দিকে পথ গিয়েছে বাঁ হাতে। হুদহুদির ঝরনা দেখতে নিয়ে যাবে বাচ্চা ছেলেরা। এপথে ওরাই গাইড। অরণ্যের মধ্যে দিয়ে, পাথর বিছানো পথে ওরাই সঙ্গী। পারলে অনেকটা নামুন। উপলখণ্ডের ওপর দিয়ে জল আসছে অনবরত। মন চাইবে একটু বসে থাকি। অনুভব করি, প্রকৃতির কবিতা। কবে থেকে যে এই জল বয়ে যাওয়া, কখনো তিরিতিরি, কখনো বা প্রবলভাবে হুড়মুড়িয়ে। ছোট্ট-খাট্ট ট্রেকিং-এর সুন্দর জায়গা।

দূরে পাথর ভাঙার আওয়াজ। আসলে পাহাড় কাটার আওয়াজ। এইভাবে ধীরে ধীরে পাহাড় নিশ্চিহ্ন হবে। অরণ্যও। থাকবে না হুদহুদির এই সৌন্দর্য। কথা হল পাথর শিল্পীর সঙ্গে। এক খুদে গাইডের বাবা এই সিংজি।

জঙ্গল বাঁচাতে বিকল্প অর্থনীতির কথা ভাবতেই হবে। পাথর এমনিতেই যথেষ্ট পাওয়া যায়। অনেক পরিবারই পাথরের থালা-বাসন ও অন্যান্য জিনিস তৈরি করত একসময়। শিলদার হাট বিখ্যাত ছিল পাথরের এইসব সামগ্রীর জন্য।

হুদহুদির জল এসে জমছে

কলকাতার বড়বাজার থেকে মহাজনরা মাল নিতে আসত। শিলদার হাটের সেই রমরমা আর নেই। চাহিদা কমেছে এই সামগ্রীর। অনেক পরিবারই আয়ের অন্যপথ খুঁজে নিয়েছে। দু-একটি পরিবারই ঢাঙ্গিকুসুমে এ কাজে যুক্ত। কিন্তু প্রকৃতির ক্ষতি না করেই পুনরুজ্জীবিত হোক এই শিল্প, এটাই চাইব।

হুদহুদি থেকে ফিরে কেটকি ঝরনার পথ ধরা যায়। এখানের পরিবেশ মনোরম। পর্যটকদের কথা ভেবে কিছু টুকিটাকি খাবারের ব্যবস্থা করা গেলে ভাল হয়। এটিকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে নেওয়া যায়। ঝরনা সংলগ্ন আদিবাসী গ্রামে ঘুরলে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। প্রাচীন জীবনচর্যার কয়েক ঝলক দেখতে পাওয়া যাবে।

পথে খাবার মেলার সম্ভাবনা কম। তবে মিলবে আদিবাসী জীবনের অমূল্য ছবি। বড়ো বড়ো জাল দিয়ে পিঁপড়ের ডিম পেড়ে ফেরার দৃশ্য মিলতে পারে। পিঁপড়ের ডিমের বাজারে অনেক দাম। এই ডিম সংগ্রহ করে অনেকেই অর্থোপার্জন করে।

একের পর এক গ্রাম পেরিয়ে কাঁকড়াঝোড়। ভিতরে প্রবেশের অনুমতি নেই। জঙ্গল পাহারা চলছে ওখান থেকে।

কাঁকড়াঝোড়ের বাংলোয় থাকার স্মৃতি যাঁদের আছে তাঁরাই জানেন কত সুন্দর উপভোগ্য একটি

কাঁকড়াঝোড়-এর বন্ধ পথ

লালজল

জায়গাকে আমরা হারিয়ে বসে আছি। ওপারে দলমা পাহাড়ের জঙ্গল থেকে ভাল্লুকও নেমে আসত। এই তো কুড়ি বছর আগের কথা। তখনও স্থানীয় মানুষেরা রাত পাহারায় থাকত।

আমঝরনা, ময়ূরঝরনা, আমলাশোল কত না গ্রাম। কত না গল্প এইসব গ্রামকে নিয়ে।

কাঁকড়াঝোড় থেকে ময়ূরঝরনা হয়ে পথ গিয়েছে বান্দোয়ান, অযোধ্যাপাহাড়। আমলাশোল হয়ে চাকাডোবা, শিয়রবেন্দা হয়ে পথ চলেছে লালজল।

পথ হয়েছে মসৃণ। আলো এসেছে, পানীয় জল এসেছে। কিন্তু জঙ্গলের যে রহস্য-রোমাঞ্চ ছিল পাহাড়ি-পাথুরে এবড়ো-খেবড়ো পথে, তা আর নেই। চড়াই-উতরাই ছিল। সবুজ গাছের মাথার ঢেউখেলানো ছন্দ ছিল, কুদলুং-এর জলে নামার হাতছানি ছিল, বন্য হিংস্র জন্তু ও হাতির ভয় ছিল। অরণ্যবাসী মানুষদের সম্পর্কেও হয়তো বা কিছুটা আতঙ্ক ছড়ানো গল্পগাথাও ছিল। তাই কাঁকড়াঝোড় যেন এক অনন্যতার আহ্বানে ভরপুর ছিল। নয়ের দশকের সেই কাঁকড়াঝোড় হারিয়ে গিয়েছে। বেঁচে আছে কিছু মানুষের স্মৃতিতে।

জঙ্গি কার্যকলাপ বারবার বিধ্বস্ত করে চলেছে এই অরণ্য অঞ্চলের পর্যটন পরিকাঠামোকে। বহুদিন এইসব অঞ্চল ছিল সাধারণ মানুষের প্রবেশের বাইরে।

গত কয়েক বছর ধরে ধীরে ধীরে আবার ছন্দে ফিরছে কাঁকড়াঝোড় সহ সমগ্র জঙ্গলমহল। বর্তমান সরকার স্থানীয় উন্নয়নের মাধ্যমে এই অঞ্চলকে আবার তুলে আনছে পর্যটনের মানচিত্রে। এখানে থাকার জায়গা নেই। ঝাড়খণ্ড সীমান্ত লাগোয়া এই অঞ্চল থেকে চলে যাওয়া যায় ঘাটশিলা, ধলভূমগড়। ঘাটশিলা হয়ে বান্দোয়ান।

বেলপাহাড়ি

লালজল

গ্রামের নাম লালজল। এখানে একসময় ঝরনার জলে তামা ও লোহার উপস্থিতির কারণে জল লালাভ। সেই কারণেই গ্রামের এই নাম।

বেলপাহাড়ি থেকে বাঁশপাহাড়ি যাওয়ার পথে ১৯ কিমি দূরে লালজল মোড়। এই মোড় থেকে ডান দিকে পাহাড়ি উতরাই পথে ২ কিমি দূরে লালজল গ্রাম। চারদিকে পাহাড়। পশ্চিমদিকের দেওপাহাড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে আদিম মানবের গুহা। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সিংলহর পাহাড় শ্রেণি। উত্তরের পাহাড়ের নাম রানিপাহাড়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, হাজার হাজার বছর আগে এখানে এক সমৃদ্ধ প্রাচীন সভ্যতার ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব ছিল।

প্রাচীনতা ও অসাধারণ নৈসর্গিক পরিবেশের কারণে লালজল ক্রমশ জঙ্গলমহলের আরণ্যক পর্যটনে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে।

পাহাড়ে চড়ার রোমাঞ্চের সঙ্গে আছে হামাগুড়ি দিয়ে গুহায় প্রবেশ। গুহার দেওয়ালে দেওয়ালে আদিম মানুষের খোদাই করা নানা ছবি দেখা যায়। এমনকি ছবিতে একাধিক রঙের ব্যবহারও উল্লেখ করা যায়।

স্থানীয় মানুষদের কাছ থেকে শোনা যায় নানা কথা। এই গুহার বিভিন্ন স্তর থেকে বিভিন্ন প্রস্তর যুগের নানা নিদর্শন মিলেছে বলে জানা যায়।

জঙ্গলমহলের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় এখান থেকে।

লালজলের উপর থেকে

দ্বিতীয় দিন ইন্দিরা চক থেকে পথ গিয়েছে ঘাঘরা। মেন রাস্তা থেকে অরণ্য পথ ধরে ঘাঘরায় পৌঁছতে হয়। ঝাড়গ্রাম থেকেও ঘুরে ফেরা যায়।

ঘাঘরার সুন্দর পরিবেশে থাকার ব্যবস্থা নেই। তারাফেনির জল বয়ে চলেছে। জল বইতে বইতে পাথর ঘষে ঘষে গর্জ তৈরি হয়েছে।

প্রকৃতি-পর্যটনের নতুন ঠিকানা হয়ে উঠতে পারে ঘাঘরা। গড়ে তোলা যেতে পারে অস্থায়ী ক্যাম্প। হাতির করিডর হিসেবেও চিহ্নিত এই অঞ্চল। তবে দিনের বেলায় পর্যটকদের সুবিধার্থে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাতে স্থানীয় মানুষের কিছু আয়ও হবে।

ঘাঘরা থেকে তারাফেনি পৌঁছে যাওয়া যাবে। তারাফেনি নদীতে ব্যারেজ তৈরি করে স্থানীয় চাষের কাজে জল ব্যবহার হচ্ছে। তারাফেনি থেকে বাঁধের রাস্তা ধরে রাইপুর হয়ে চলে যাওয়া যাবে সবুজদ্বীপ, সারেঙ্গা, মুকুটমণিপুর। ওড়গন্দা, শিলদা, পারিহাটি, গিধনী হয়ে চিলকিগড়, হাতিবাড়ি অথবা শিলদা থেকে ঝাড়গ্রাম বা খড়গপুর। আবার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, কখনো বা পথ হারিয়ে বারিকুল, রানিবাঁধ হয়ে লং ড্রাইভের মজা নিতে নিতে খাতড়া, মুকুটমণিপুর, বিষ্ণুপুর....। চলে চলুন। নয়তো বা ফিরে যেতে হবে বেলপাহাড়ি, তৃতীয় দিনের প্রোগ্রামের জন্য।

এই প্রোগ্রাম একটু অপরিচিত। বদাডি থেকে মাছকাঁদনা অর্থাৎ চিতিপাহাড়, বালিচুয়া হাইস্কুলের পাশ দিয়ে পথ গিয়েছে। ঠাকুরানি পাহাড়ের ঢালে আমবাগান। এই পাহাড়ের পাথর দিয়ে থালা-বাসন ও নানা সামগ্রী হয়। শিল্পী সমবায়ের ঘরও আছে। এই পাহাড়ের একটা আলাদা লুক আছে।

ঘাঘরা

ছবি : কাজল বিশ্বাস

ওখান থেকে চলুন শিমুলপাল। পাথরের সামগ্রী প্রস্তুতকারী মিস্ত্রিরা ওখানে থাকে। হলুদ পাহাড়, লাল পাহাড় দেখতে পাওয়া যাবে ওখান থেকে লবণি, পাথরচাকরি, শাখাভাঙায় গেলে। নতুন নতুন পর্যটন-স্থল খুঁজে বের করছেন স্থানীয় পর্যটন-ব্যবসায়ীরা। আবার শিমুলপাল থেকে ডাকাই হয়ে কানাইশোর পাহাড়, ক্যান্দাপাড়ায় শ্বেতপাথরের পাহাড় দেখে নিতে পারেন।

খান্দারানি বা গারড়াসিনি পাহাড়ও ঘুরে নিতে পারেন।

সবুজদ্বীপ থেকে ছবি : কাজল বিশ্বাস

গিধিঘাটি, চন্দনপুর, তালপুকুরিয়া, কুন্তলপাহাড়ি, শ্যামনগর, চাঁদাবিলা হয়ে ঘাঘরা, তারাফেনিও যাওয়া যায়।

নতুন জেলা ঝাড়গ্রাম পর্যটনের নতুন ঠিকানা হয়ে উঠেছে। চেনাজানা ঝাড়গ্রাম ক্রমশঃ ডানা মেলছে অচেনা অজানার ছন্দে। আদিমতা, প্রাচীনতা, বন্যতা—ঝাড়গ্রামকে জারিয়ে রেখেছে। আর সেই জারণে জারিত হতে মন ছুটছে অবিরত।

—সুরা

খান্দারানি ড্যাম

জঙ্গলমহল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানচিত্রে অরণ্য

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মানচিত্র

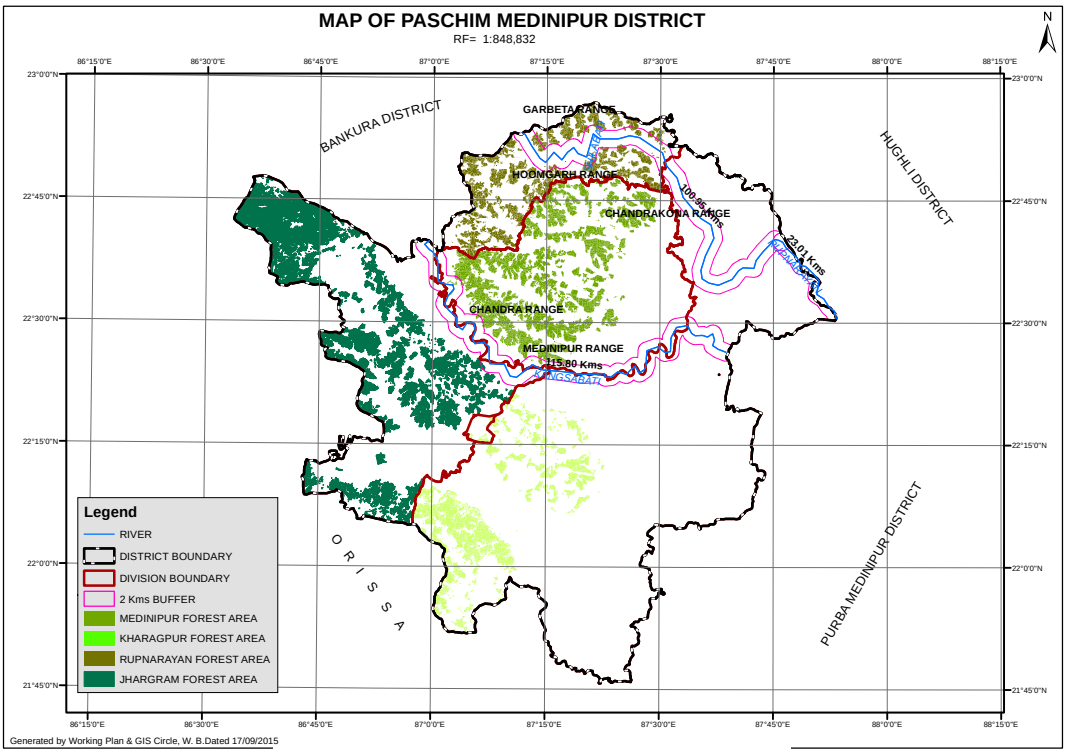

পঞ্চেট বিভাগের মানচিত্র

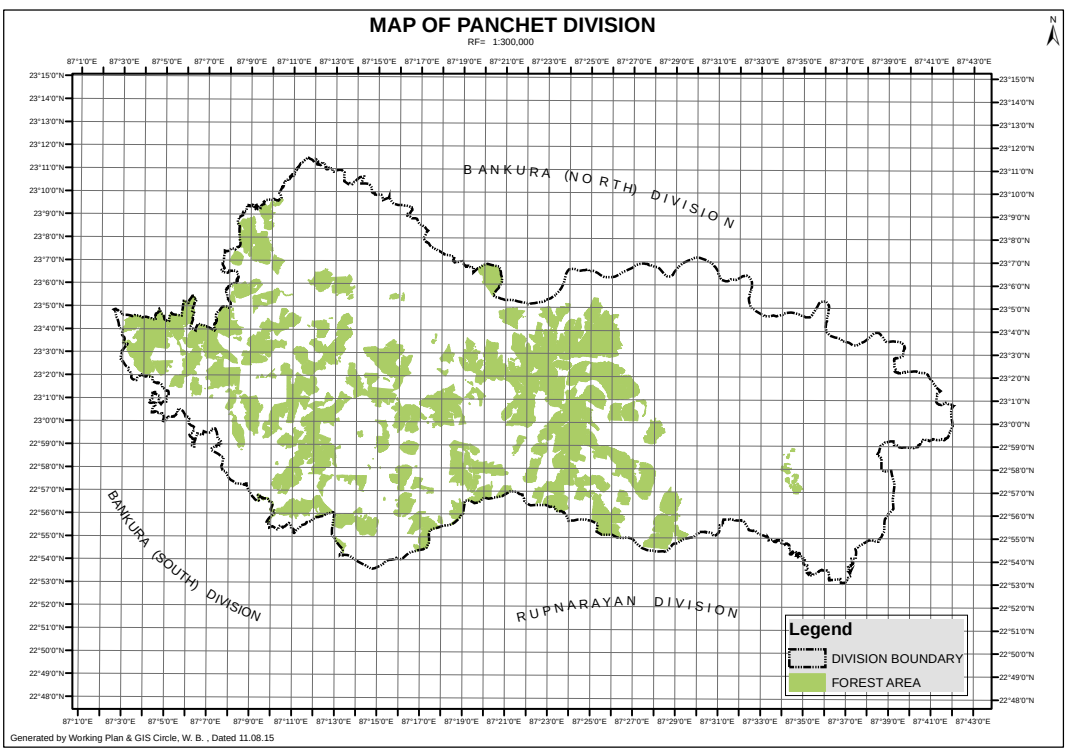

পুরুলিয়া জেলার মানচিত্র

RF= 1:684,091

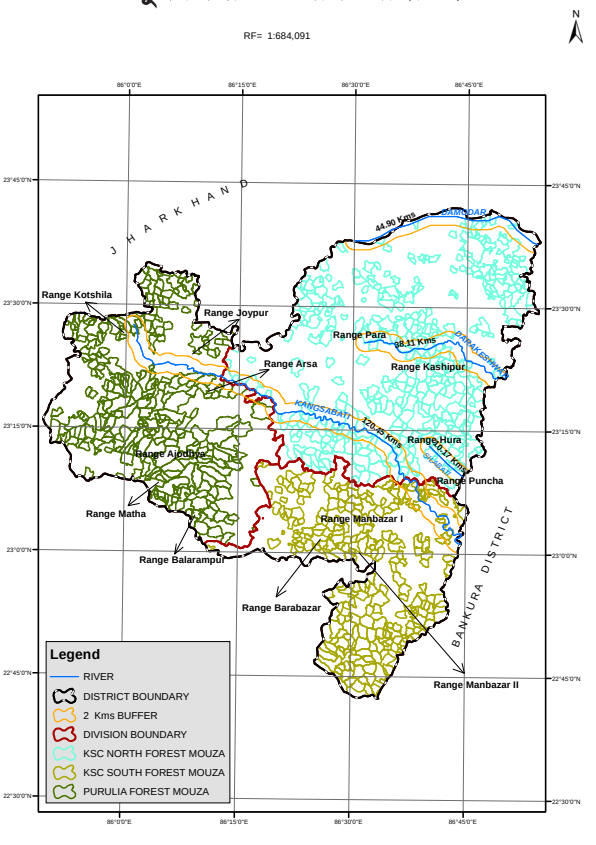

রূপনারায়ণ বিভাগের মানচিত্র

RF= 1:244,440

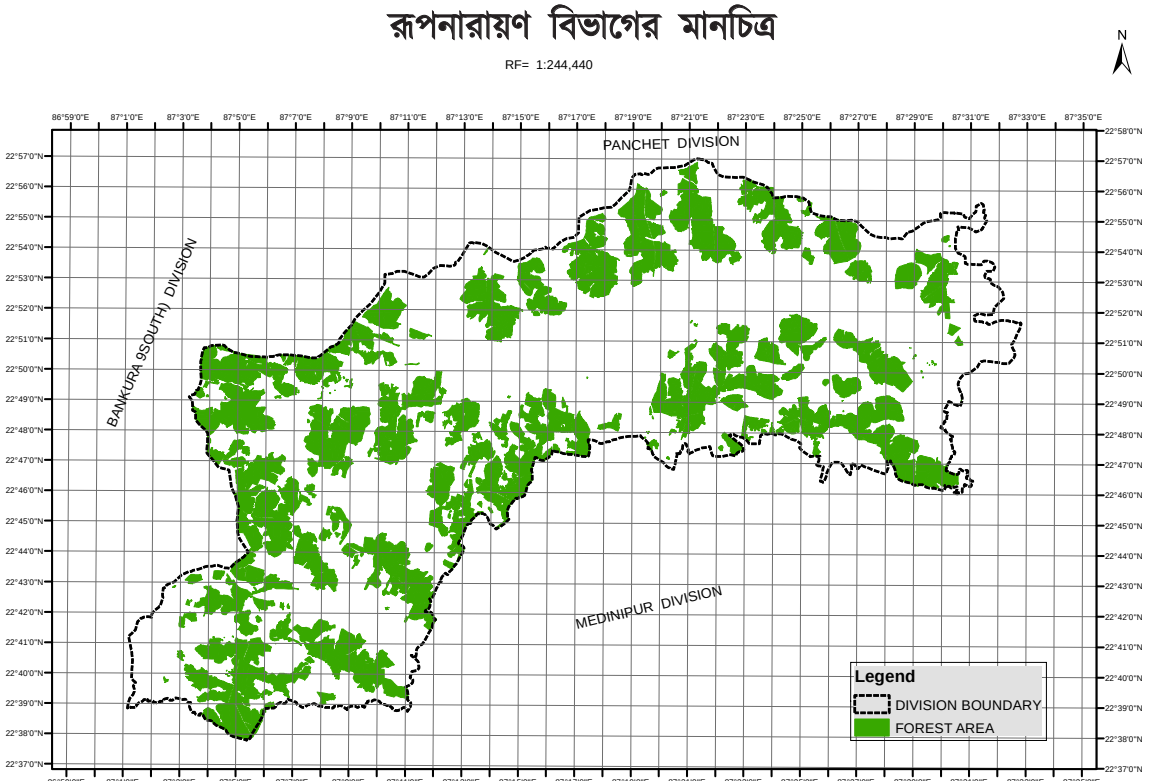

Generated by Working Plan & GIS Circle, W. B. , Dated 11/08/2015

ঝাড়গ্রাম বিভাগের মানচিত্র

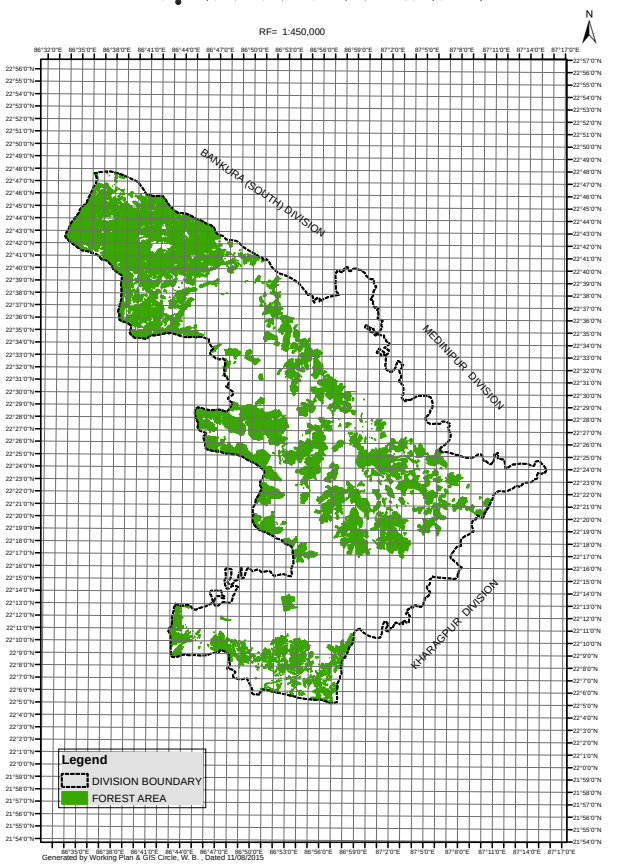

মেদিনীপুর বিভাগের মানচিত্র

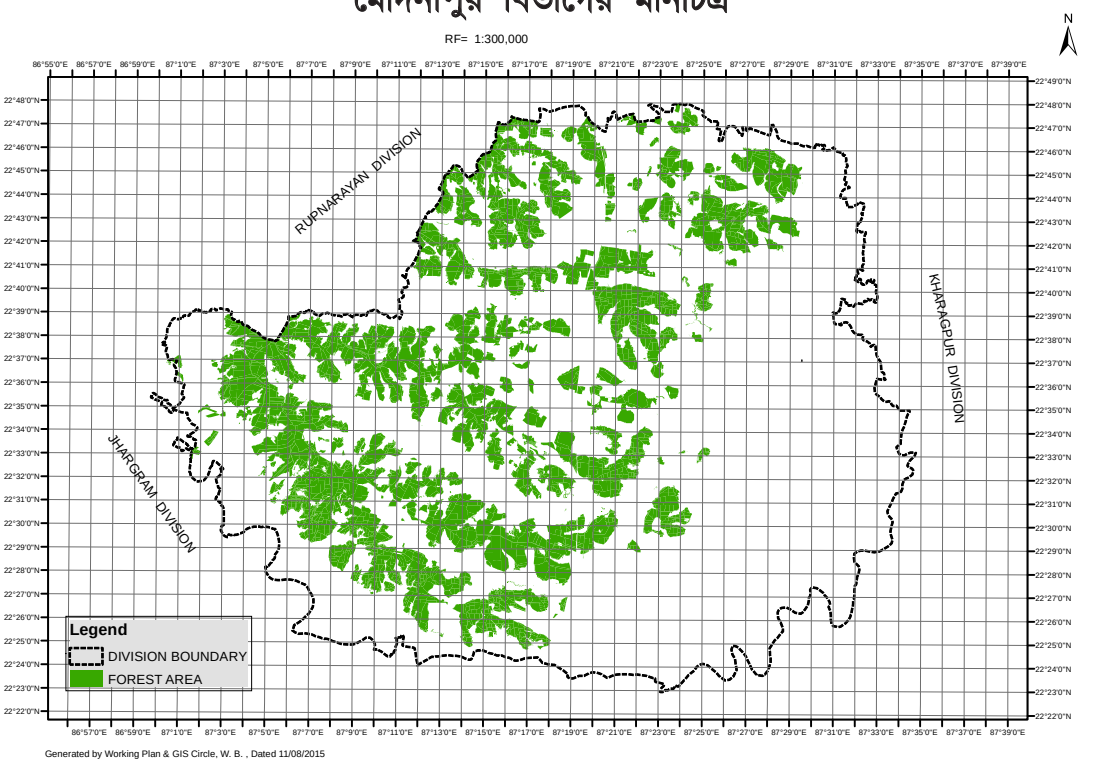

বর্ধমান বিভাগের মানচিত্র

RF= 1:680,000

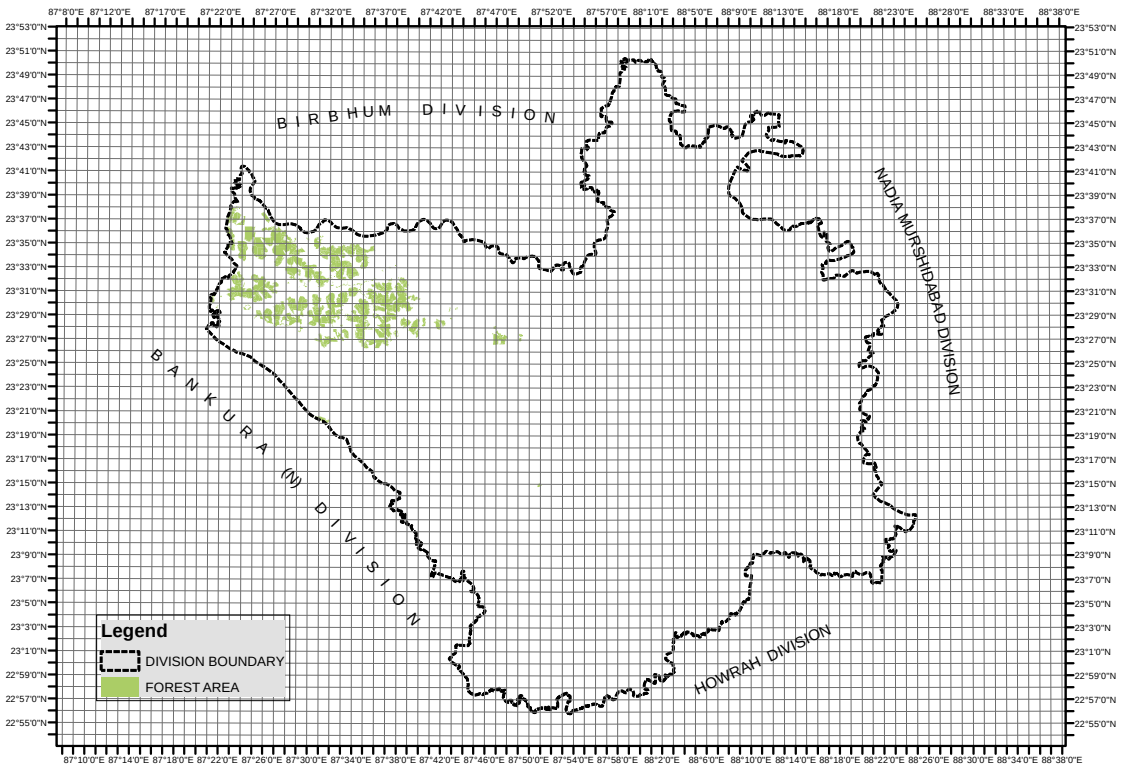

Generated by Working Plan & GIS Circle, W. B. , Dated 11/08/2015

বর্ধমান জেলার মানচিত্র

RF= 1:750,000

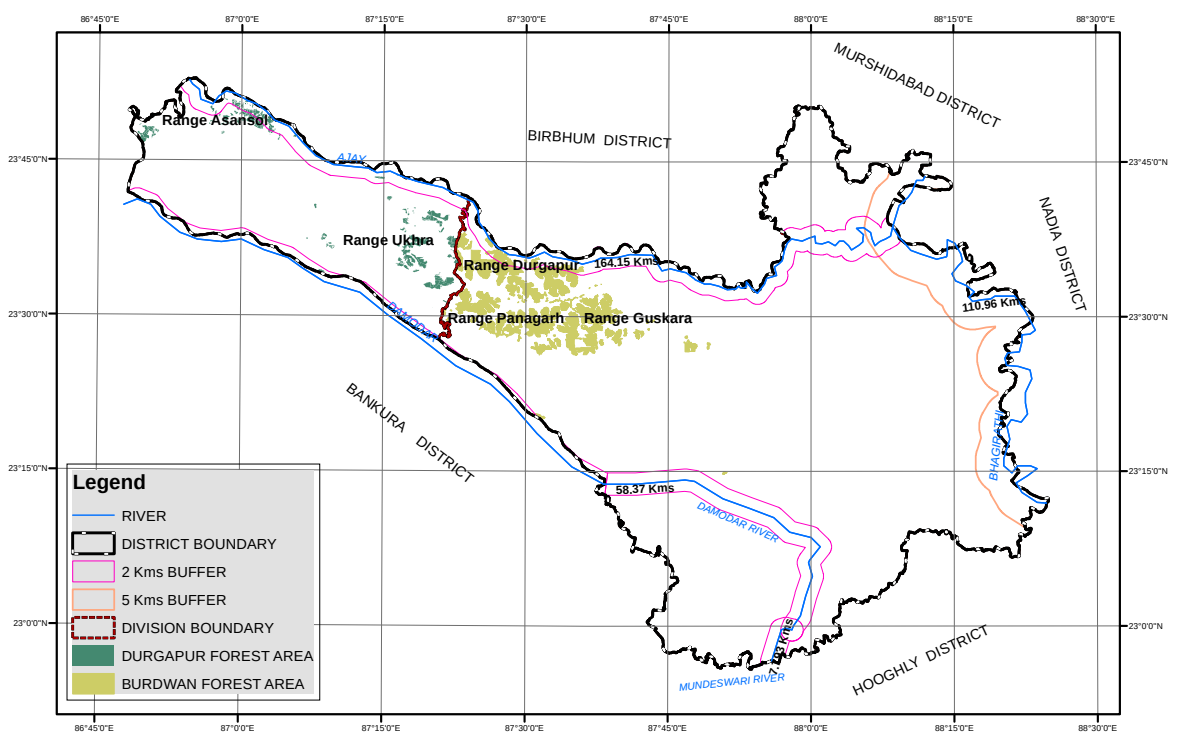

Generated by Working Plan & GIS Circle, W. B. , Dated 18/09/2015

বীরভূম জেলার মানচিত্র

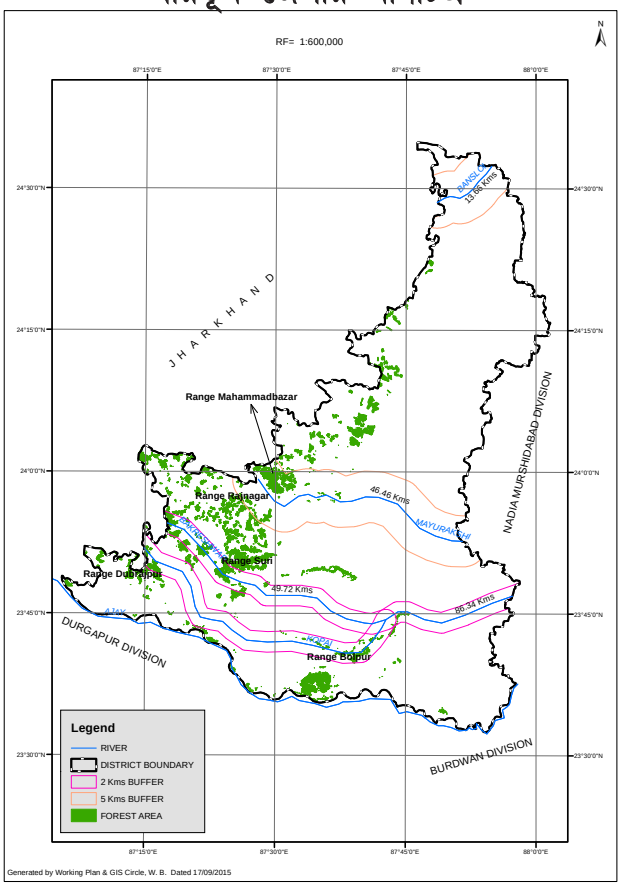

বাঁকুড়া বিভাগের মানচিত্র

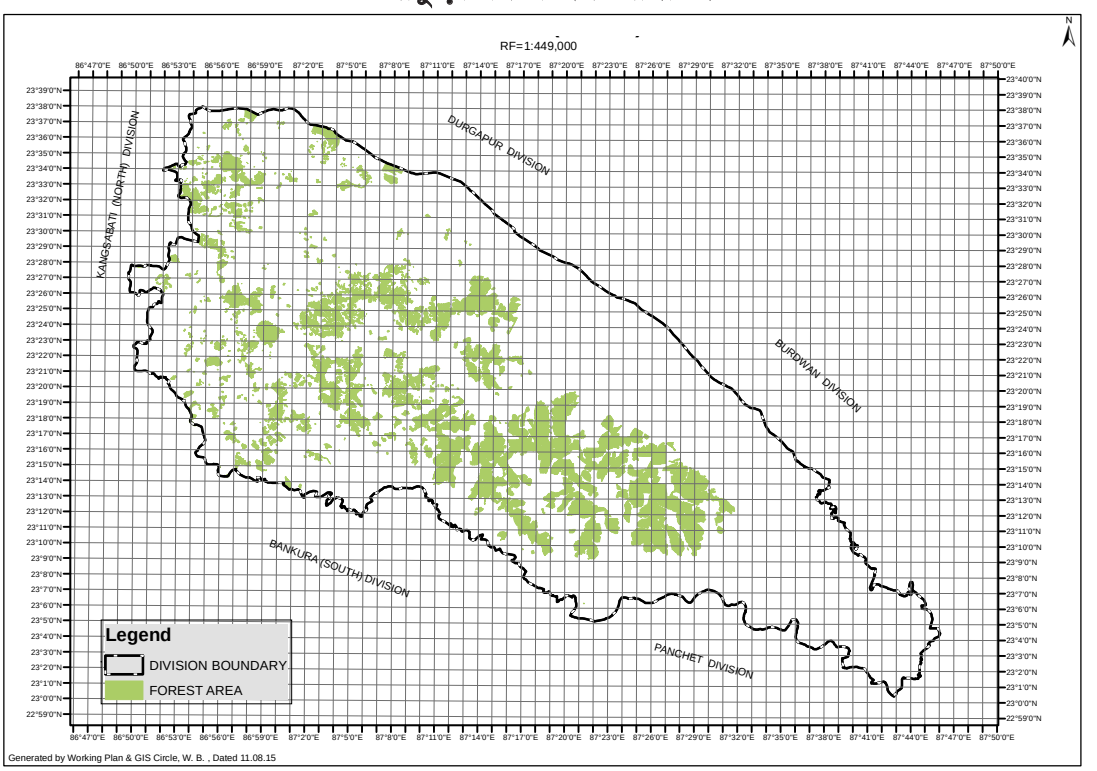

বীরভূম বিভাগের মানচিত্র

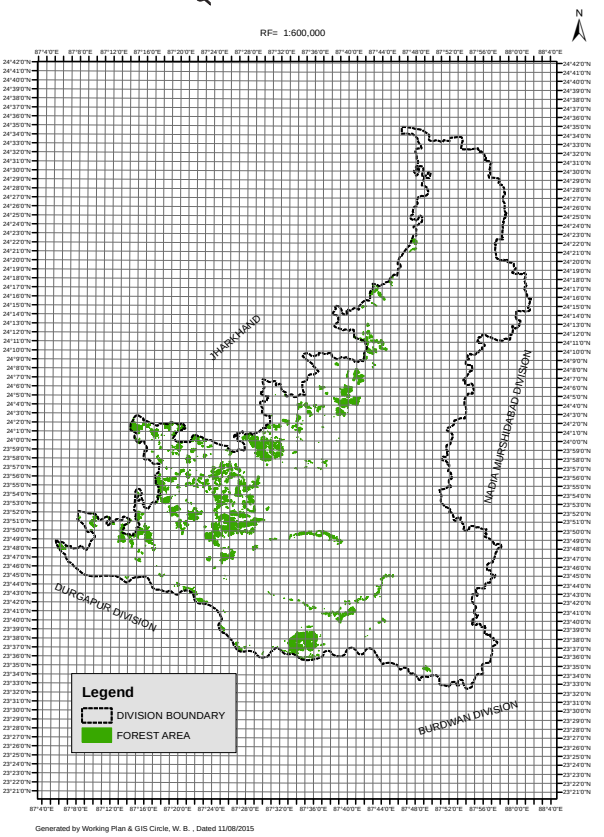

বাঁকুড়া জেলার মানচিত্র

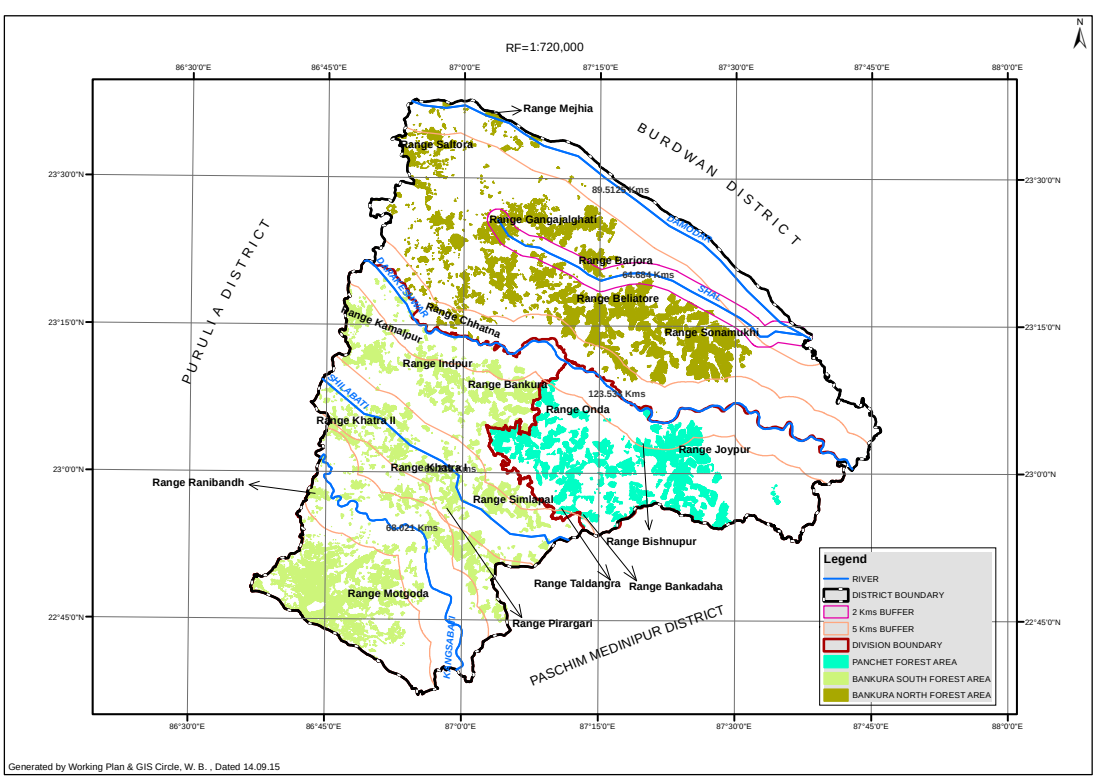

বাঁকুড়া (দক্ষিণ) বিভাগের মানচিত্র

RF= 1:400,000

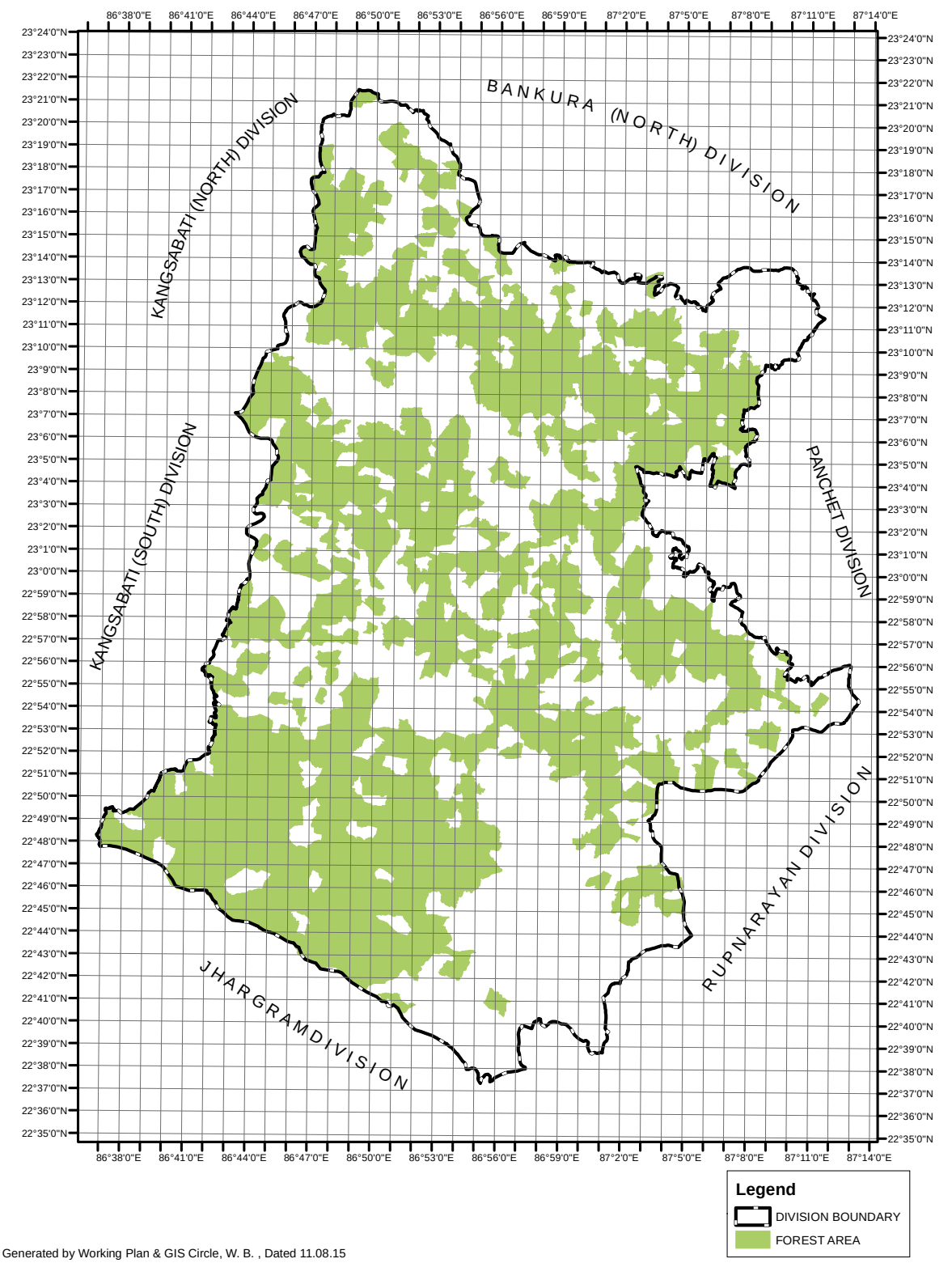

Generated by Working Plan & GIS Circle, W. B. , Dated 11.08.15

খড়গপুর বিভাগের মানচিত্র

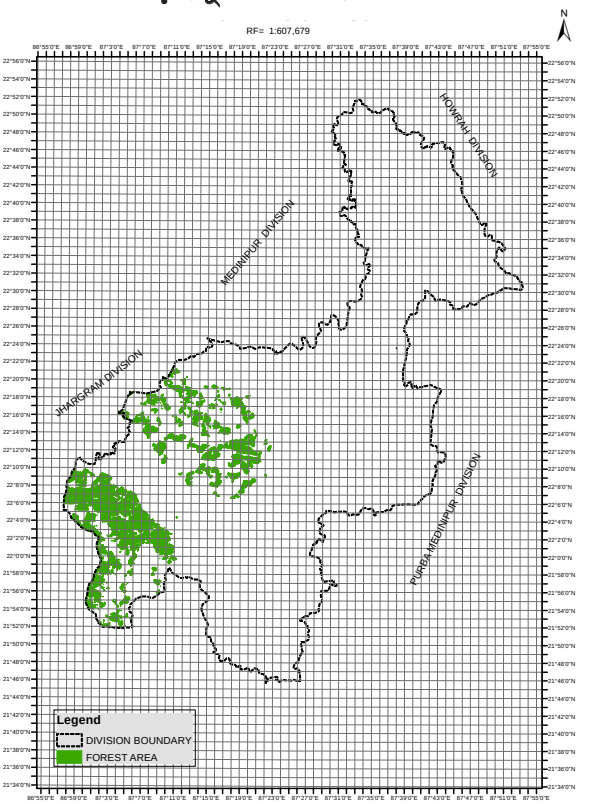

Generated by Working Plan & GIS Circle, W. B. , Dated 11/08/2015

দূর্গাপুর বিভাগের মানচিত্র

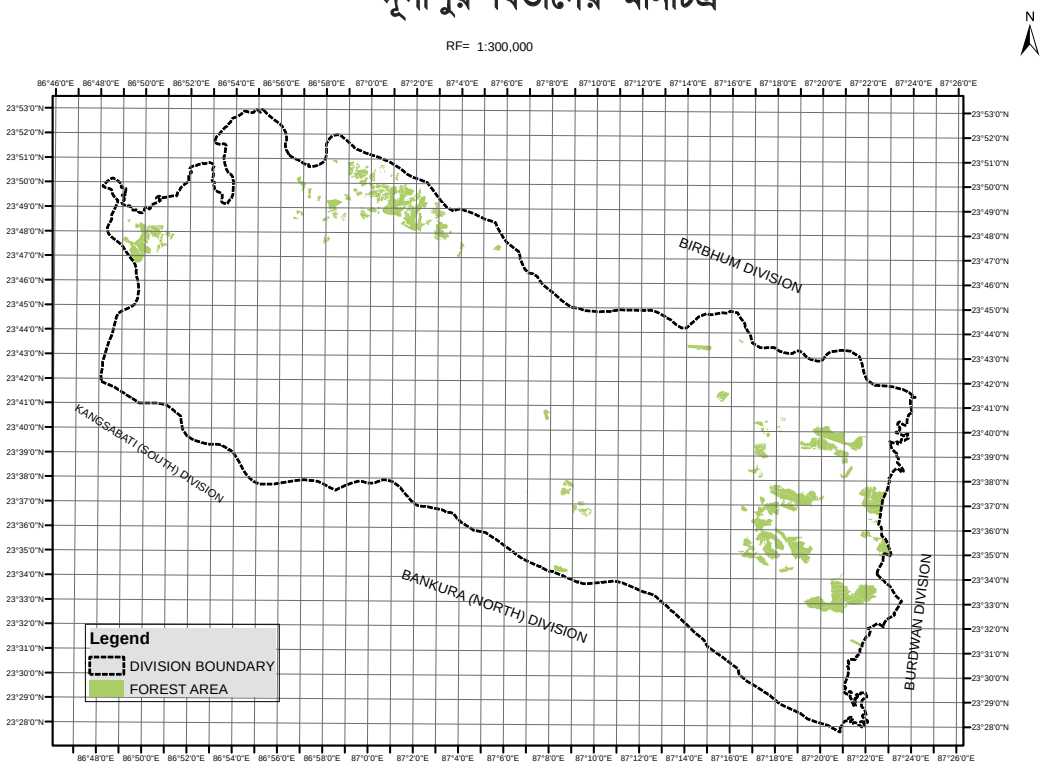

Generated by Working Plan & GIS Circle, W. B. , Dated 11/08/2015

ডাকছে
সুন্দরবন

রাতুল দত্ত

লোনা মাটির সুন্দরী, গরান, গেঁওয়া, হোগলা পাতার বনের অভয়ারণ্য। উপকূলের পেছনে বিশাল ম্যানগ্রোভ বনভূমি যেন দু'হাত দিয়ে ডেকে চলেছে পর্যটকদের। মাতলা, বিদ্যাধরী, গোসাবা নদীর জল যেখানে মিলে মিশে একাকার। একের পর এক ব-দ্বীপ খাল। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার কিংবা কুমিরের প্রতিনিয়ত আক্রমণ।

এটাই সুন্দরবন।

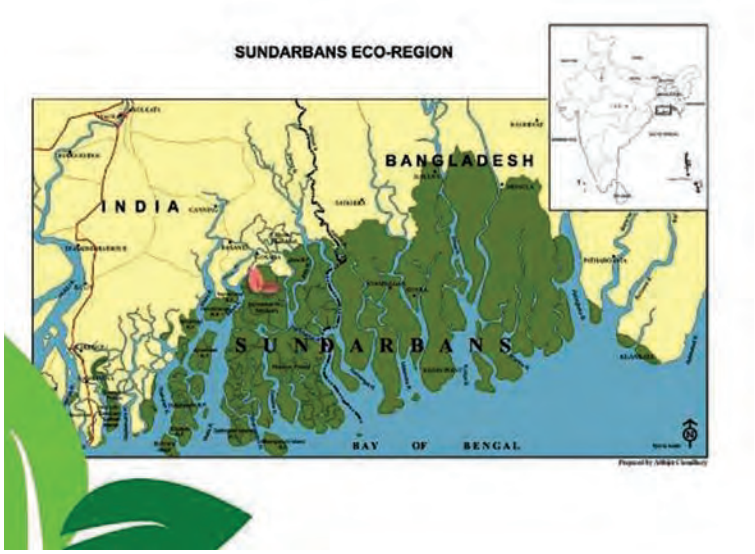

আসলে বাংলার ব-দ্বীপ অঞ্চল এবং সুন্দরবন—দুটি ক্ষেত্রকে অনেকে গুলিয়ে ফেলেন। গঙ্গা বা ভাগীরথী যেখানে মুর্শিদাবাদের ধূলিয়ানের কাছে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করছে, সেখান থেকেই শুরু হয়েছে বাংলার ব-দ্বীপ অঞ্চল।

এই সম্পূর্ণ ব-দ্বীপ অঞ্চলের উত্তর দিকে মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া জেলা নিয়ে তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ অঞ্চল। হুগলি ও ভাগীরথী নদীর স্থানীয়ভাবে গতিপথ পরিবর্তনের ফলে নতুন করে পলি সঞ্চয় করে আর নতুন ভূমিরূপের পরিবর্তন হয় না। একে বলে মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ অঞ্চল। সম্পূর্ণ ব-দ্বীপ অঞ্চলের মধ্যভাগের জেলাগুলি হল বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, পূর্ব-মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনার অংশবিশেষ। সম্প্রতি এর ভূমিরূপ গঠন পরিবর্তন শেষ হয়েছে এবং কোথাও এখনো সামান্য পরিবর্তন চলছে। সম্পূর্ণ ব-দ্বীপ অঞ্চলের শেষ ভাগ হল সক্রিয় ব-দ্বীপ অঞ্চল—সুন্দরবন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে তৈরি এই ক্ষেত্র। এর ভূমির গঠনের নিত্য পরিবর্তন হচ্ছে এবং মাতলা, পিয়ালি, বিদ্যাধরী, গোসাবা নদীর পলি সঞ্চয়ের ফলে এই ভূমি তৈরি হয়েছে।

সুন্দরবনের জমি মূলত দুই ধরনের। বাদা এবং আবাদ। এখানে বহু জমি জোয়ারের সময় জল ঢুকে ভেসে যায়। ফলে মাটি সারাবছর ভেজা এবং লোনা। ফলে এই অঞ্চল বনভূমিতে ঢাকা এবং লবনাম্বু উদ্ভিদ বেশি দেখা যায়। অন্যদিকে কিছু জমি রয়েছে, বেশ উঁচু। এখানে শক্ত মাটির বাঁধ তৈরি করে চাষাবাদ চলে। জোয়ারের জলে এখানে প্লাবন হয় না। বরং দীর্ঘদিন জোয়ারের জল ঢোকে না বলে লবণাক্ত নয় এবং চাষ-বাস ভাল হয়। সুন্দরবনের মানুষের চাষের জীবিকা চলে এইসব জমি থেকেই।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মানচিত্র

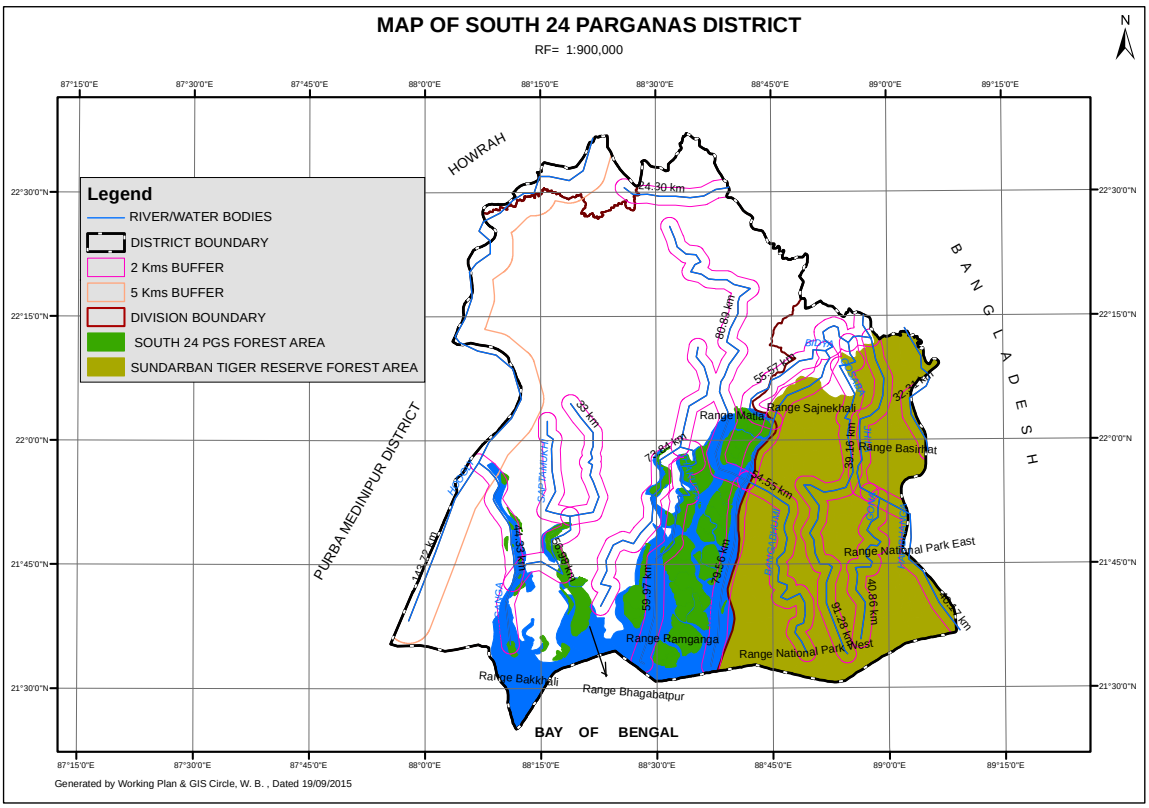

সুন্দরবন ব্যাঘ্র সংরক্ষণ মানচিত্র

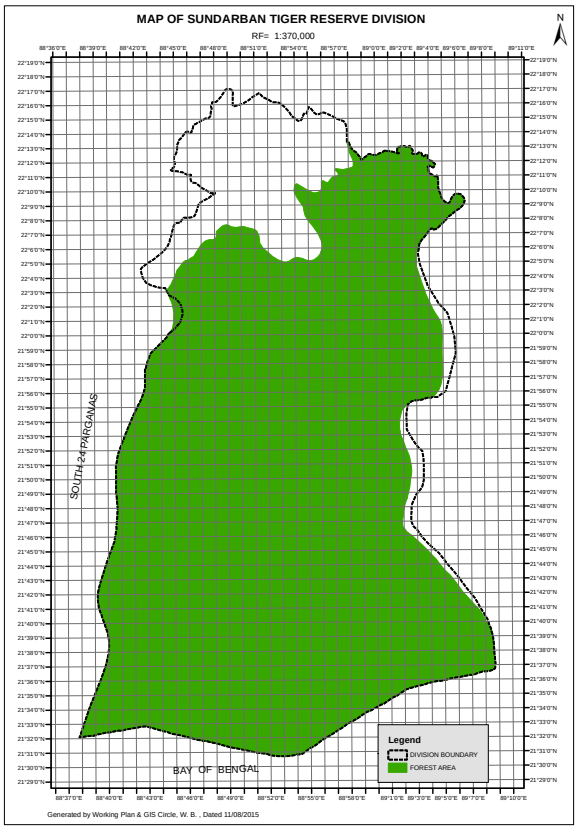

একের পর এক শাখানদী এবং উপনদী মাকড়শার জালের মতো ঘিরে রেখেছে সুন্দরবনকে। মাতলা, গোসাবা, বিদ্যাধরী, পিয়ালি, ইছামতী, কালিন্দী, রায়মঙ্গলের মতো ভাগীরথীর শাখানদী যেমন রয়েছে; তেমনই ভৈরবী, জলঙ্গী, মাথাভাঙার মতো পদ্মার শাখানদী আবার এখানেই এসে মিশেছে ভাগীরথীতে। সমুদ্রের জল সরাসরি ঢুকে আসে বলে এদের জল লবণাক্ত। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে দিনের পর দিন পলি জমে জমে নদীগর্ভ ক্রমশ ভরাট হয়ে উঠছে। তৈরি হয়েছে বহু চওড়া খাড়ি। সুন্দরবনের লোনা মাটিতেই তৈরি হয়েছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ অরণ্য অর্থাৎ লবণাক্ত মাটির বনাঞ্চল।

সুন্দরবন সত্যিই সুন্দর। সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান পর্যটকদের স্বাগত। ১৯৮৪ সালের ৪ মে এটি প্রথম জাতীয় উদ্যানের মর্যাদা পায়। সুন্দরবন পর্যটনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সময় মে এবং সেপ্টেম্বর মাস। তবে পর্যটকেরা শীতকালে বেড়াতে এলে সমুদ্রোপকূলে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের মিষ্টি আলো গায়ে মেখে, রোমাঞ্চকর ভ্রমণের মৌতাত নিতে আসতে পারেন। সার্বিক সহযোগিতার অবশ্যই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ছাড়াও এখানে নানা ধরনের ম্যাকাও, লেপার্ড ক্যাট, ভারতীয় নকুল, সামুদ্রিক কচ্ছপ, জঙ্গল ক্যাট, খ্যাঁকশিয়াল, বন্য ভল্লুক, চিতল, প্যাঙ্গোলিন ইত্যাদি নানা ধরনের প্রাণির দেখা মেলে। সঙ্গে রয়েছে প্রচুর মৌমাছি এবং সুন্দরবনের বিখ্যাত মধু।

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা নদীর পলিতে তৈরি সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ-সহ মোট অরণ্যের পরিমাণ প্রায় ১০ হাজার বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে বাংলাদেশের খুলনায় পড়েছে ৬০১৭ বর্গকিলোমিটার এবং পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে প্রায় ৪২৬০ বর্গ কিলোমিটার। সুন্দরী এবং গেঁওয়া গাছ ছাড়াও এখানে রয়েছে ৪৫০টির নানা ধরনের গাছ, ২৯০ ধরনের পাখি, ১২০ ধরনের মাছ, ৪২ ধরনের স্তন্যপায়ী, ৩৫ ধরনের সরীসৃপ এবং ৮ ধরনের উভচর প্রজাতির প্রাণী। ইউনেস্কো সুন্দরবনকে সংরক্ষণের জন্য 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, ১৯৯৭ সালে।

সুন্দরবন বরাবরই রহস্যময়। এখানে একদিকে যেমন বনবিবি, দক্ষিণরাই, মনসা, চাঁদ সদাগরের মতো স্থানীয় দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। তেমনি দীর্ঘদিন ধরে নানা গল্প উপন্যাসে রয়েছে সুন্দরবনের বহু নদ-নদীর উল্লেখ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', শিবশঙ্কর মিত্রের 'সুন্দরবনে আর্জান সর্দার', সলমন রুশদির 'মিডনাইটস্ চিলড্রেন', অমিতাভ ঘোষের 'দ্য হাঙরি টাইড' ইত্যাদি গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে সুন্দরবনকে ঘিরে। সব মিলিয়ে সুন্দরবন বরাবরই পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

কীভাবে পৌঁছবেন সুন্দরবন?

অন্য রাজ্য থেকে বিমানে পৌঁছতে পেলে দমদম অর্থাৎ নেতাজি সুভাষচন্দ্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমে গাড়িতে প্রায় ৩ ঘণ্টা।

ট্রেনে শিয়ালদা থেকে সুন্দরবনের নিকটতম রেলওয়ে স্টেশন হল ক্যানিং। সেখান থেকে গাড়িতে গোদাখালি বন্দর, যেখান থেকে শুরু হচ্ছে মূল সুন্দরবন এলাকা।

বাসে, কলকাতা থেকে ক্যানিং বা সরাসরি গদখালি পৌঁছেও সেখান থেকে সুন্দরবনের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করা যায়।

প্যাকেজ ট্যুর

(১) কলকাতা-সুন্দরবন-কলকাতা

(২ দিন/১ রাত্রি)

প্রথম দিন কলকাতা থেকে সোজা গোদাখালি জেটি। এরপর শুধুই জল। বলা যায়, শুরু হল সুন্দরবন ভ্রমণ। লঞ্চে গোমর, হুগলি, দুর্গাদুনি, গুমদি নদী ঘুরে রিসর্ট বা হোটেলে ফিরে লাঞ্চ। সন্ধেবেলা সজনেখালি ওয়াচ টাওয়ার কিংবা নানা ধরনের ছোটো ছোটো প্রাণী, পাখির সঙ্গে সময় কাটানো। পরদিন চলে যাওয়া যায় বালিগ্রামে। এখানে গ্রামবাসীদের সঙ্গে অরণ্যে কাটানোর অভিজ্ঞতা নিজে শুনে নিতে পারেন। এরপর চলে যান সুধন্যখালি ওয়াচ টাওয়ার—যেখান থেকে প্রায়শই বাঘ দেখা যায়। দেখা মিলবে বন্য ভল্লুক, হরিণ কিংবা কুমিরের। রয়েছে মিষ্টি জলের পুকুর, যেখানে প্রায়ই নানা প্রাণি জলপান করতে আসে। সুন্দর স্মৃতি নিয়ে ফিরে আসুন কলকাতায়।

(২) কলকাতা-দিঘা-সুন্দরবন-কলকাতা

(৩ দিন/২ রাত্রি)

একই সঙ্গে সমুদ্রের হাতছানি, অন্যদিকে রয়াল বেঙ্গলের ডাক শুনে যাঁরা রোমাঞ্চিত হত চান—তাঁদের জন্য এই ট্যুরটি আকর্ষণীয়। প্রথম দিন পৌঁছে যান কলকাতা থেকে দিঘা, গাড়িতে বা ট্রেনে। দিঘার রোমান্টিক সমুদ্র সৈকতে আপনাকে স্বাগত। ঘুরে নিন অমরাবতী পার্ক, শঙ্করপুর সমুদ্রতট, মন্দারমণি, চন্দ্রেশ্বর মন্দির, নিউ দিঘার সায়েন্স সেন্টার, এশিয়ার বৃহত্তম মেরিন অ্যাকোরিয়াম, স্নেক ফার্ম। পরদিন ভোরে পৌঁছে যান পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য সুন্দরবনে। লঞ্চ ভাড়া করে একের পর এক বদ্বীপ খাল পেরিয়ে সজনেখালি এবং সুধন্যখালি ওয়াচ টাওয়ার। বাঘের সঙ্গে আরও নানা ধরনের প্রাণী এবং পাখির রোমাঞ্চকর উপস্থিতির চাক্ষুস দর্শন যেন কাঁটা দেবে গায়ে। পরদিন বালিগ্রাম ঘুরে, লঞ্চে কয়েকটি নদী পেরিয়ে রাতে কলকাতা প্রত্যাবর্তন।

(৩) সুন্দরবন টাইগার ট্যুর
(৩ দিন/২ রাত্রি)

কলকাতা থেকে গদখালি জেটি। এরপর বিশ্বের বিস্ময় ম্যানগ্রোভ অরণ্যের মধ্য দিয়ে সুন্দরবনের অরণ্যে। সেখান থেকে দুপুরে সজনেখালি ব্যাঘ্র প্রকল্প। সন্ধ্যায় সজনেখালি ওয়াচ টাওয়ার থেকে নানা ধরনের পশু-পাখি দেখে সজনেখালি মিউজিয়াম ঘুরে রাতে হোটেল বা বোটে সময় কাটানো। পরদিন অরণ্যের গহন গভীরে ঢুকে পড়া। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল বুড়িদাবি ব্যাঘ্র প্রকল্প এবং মরিচঝাঁপি দেখা। পরদিন সুধন্যখালি এবং দোবাঙ্কি ব্যাঘ্র প্রকল্প। রাতে ফিরে আসুন কলকাতায়।

রাজ্যের সম্পদ। দেশের গর্ব। বিশ্বের পর্যটন এবং বনভূমি অঞ্চলের মানচিত্রে দীর্ঘদিন ধরে ঠাঁই করে নেওয়া সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এবং জাতীয় উদ্যান পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। দক্ষিণ এশিয়ার তো বটেই, পৃথিবীতেই এই ধরনের অরণ্য-বনাঞ্চল-তৃণভূমি-ব্যাঘ্রচারণ ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া বিরল। এই বদ্বীপ অঞ্চল ভারত-বাংলাদেশের সীমানা জুড়ে প্রায় ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ অরণ্য। একদিকে গঙ্গা, অন্যদিকে ব্রহ্মপুত্র পলিসমৃদ্ধ এই বদ্বীপ, বাংলার বিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের চারণভূমি। একদিকে অহরহ সমুদ্রে লোনা জলের ঢেউতে ক্ষয়ে যাচ্ছে বনভূমি, অন্যদিকে হয়ত ভেসে উঠছে নতুন দ্বীপ—নতুন অরণ্য—নতুন জনপদ। তৈরি হচ্ছে কুমির আর মৎস্যজীবীদের লড়াইয়ের নতুন জীবনগাথা।

ম্যানগ্রোভ ও ম্যান-ইটারের
সুন্দরবন

জল-জঙ্গলের সুন্দরবনের মোট এলাকা ১৬,৯০০ বর্গ কিমি। পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভূক্ত সুন্দরবন বর্গ কিমি। সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান সমুদ্র-তল থেকে গড় ৭.৫ মিটার উঁচুতে অবস্থিত। ৫৪টি ছোটো দ্বীপ নিয়ে এই উদ্যান। বঙ্গোপসাগরের তীরে এই উদ্যানের বৃষ্টিপাতের পরিমাণও বেশি। জুনের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত বৃষ্টি চলে। আদ্রর্তাও প্রায় ৮০ শতাংশ। তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি থেকে ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মে থেকে অক্টোবর—এই সময় ঝড়-ঝঞ্ঝার যথেষ্ট প্রকোপ থাকে। এমনকি সাইক্লোনও দেখা দেয়। সাতটি প্রধান নদী এবং এইসব নদীর অজস্র খাঁড়ি মিলে মিশে এই নদী মোহনার ব-দ্বীপ। সব নদীর উদ্দেশ্য সাগর-মিলন। নদীগুলি তাই দক্ষিণমুখী।

এই অঞ্চলের ইকো-জিওগ্রাফি অর্থাৎ প্রাকৃতিক-ভূগোল জোয়ার-ভাঁটার ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। সারা দিনে অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় এখানে দু-বার জোয়ার এবং দু-বার ভাঁটা আসে। জোয়ারে জলোচ্ছাস প্রায় ৩ থেকে ৫, কখনও বা ৮ মিটার উঁচুও হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন গভীরতা। খাঁড়ি-গুলোতে এই জোয়ারের ফলে ক্রমশ পলি (SILT) জমছে। ফলে নদী বা খাঁড়ির তলদেশ বা গর্ভের গভীরতা ক্রমশ কমছে। ফলে এইভাবে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন দ্বীপ ও খাঁড়ির। সর্বদা ভূতত্ত্বের আঙ্গিকগত পরিবর্তন ঘটছে। জিও-মরফোলজির দিক থেকে এই অঞ্চল আজও তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জলময় অরণ্য। সুন্দরবন। সমুদ্র-লগ্ন গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যময় আরণ্যক বাস্তুতন্ত্রের কারণে সুন্দরবনকে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কোর ১১তম সেশনে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ৫১৩.৬ বর্গ মাইল এলাকাকে এই 'সাইট' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০১৯-এর ৩০ জানুয়ারি 'রামসর জলাভূমি'-র মর্যাদা দেওয়া হয় সুন্দরবন জলাভূমিকে।

ব্রিটিশরা দার্জিলিঙের মতো দক্ষিণের এই অঞ্চলকেও বিশেষভাবে নজর দিতে শুরু করে। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সুন্দরবন অঞ্চলের ওপর বন পরিচালন ডিভিশনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাঘের পায়ের ছাপ

মাডফ্লাডস্

১৮৬৫-র বন আইনের আওতায় এই অরণ্যের এক বিরাট অংশ ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে সংরক্ষিত অরণ্য হিসেবে ঘোষিত হয়। পরের বছর বাকি অংশও সংরক্ষিত অরণ্যের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করার পাশাপাশি এই অরণ্য জেলা প্রশাসনের আওতাধীন রাখা হয়, বন দপ্তরের নিয়ন্ত্রনাধীন হয়।

প্রাথমিক বন পরিচালনা এবং প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে একটি অরণ্য ডিভিশন ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে গড়ে তোলা হয়, বাংলাদেশের খুলনা হয় প্রধান কার্যালয়। ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৮ এই পাঁচ বছরের জন্য প্রথম পরিচালন পরিকল্পনা লিখিত হয়।

হুগলি নদীমুখ থেকে মেঘনা নদীমুখ—২৬৬ কিমি বিস্তৃত এই অঞ্চল ২৪-পরগনা, খুলনা এবং বাখেরগঞ্জ—এই তিন জেলায় অবস্থিত। শেষ দুই জেলা বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্ত, অর্থাৎ বলা যায়, এই ব-দ্বীপের বেশিরভাগ অংশই ওই দেশের মধ্যে। এই কারণে সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের ২১০০ থেকে ২১২২ অক্ষাংশ-এ জলের গভীরতা হঠাৎই পরিবর্তিত হয়। ২০ মিটার থেকে ৫০০ মিটার পর্যন্তও গভীরতার পরিবর্তন ঘটে। এই প্রাকৃতিক গর্তের কারণে, যাকে বলে 'SWATCH OF NO GROUND' পলি ক্রমশ দক্ষিণ দিকে সরে আসছে অথবা আরও পূব দিকে সরে গিয়ে নতুন দ্বীপ গড়ে উঠছে।

আশ্চর্য ভূ-প্রকৃতি—জোয়ার-ভাটার খেলা

বাঘের জন্য মিষ্টি জলের পুকুর

নিরাপত্তাবলয়ের মধ্যে নজরমিনার থেকে বাঘ দেখতে উদ্‌গ্রীব দর্শকেরা

বাঘ দেখার এমনই আয়োজন সুন্দরবনে

সজনেখালি ওয়াচ টাওয়ার, সুন্দরবন

এখানের ভূমিরূপের এই অনবরত ভাঙনগড়নের খেলা এক আশ্চর্য অরণ্যের সৃষ্টি করেছে। সে অরণ্য ম্যানগ্রোভ-অরণ্য। ম্যানগ্রোভ অরণ্যের গাছের বৈশিষ্ট্য হল—শ্বাসমূলগুলো মাটির উপরে উঠে আসে। এইরকমই এক গাছের নাম সুন্দরী। এই গাছের জন্যই এই অরণ্য 'সুন্দরবন'—সুন্দরীগাছের অরণ্য।

এমনকী একটি জোয়ার-ভাঁটাতেই এখানে জল-কাদার আশ্চর্য ভূমিরূপ তৈরি হয়। এখানে ব-দ্বীপের ওপর, নদী-মোহনায়, যেখানে নদীর নিম্ন গতি এবং জোয়ার-ভাঁটা খেলে, সেখানেই সুন্দরবনের এই কর্দমাক্ত ভূমিরূপ তৈরি হয়। ভাঁটার সময় এই ভূমি দেখা যায়, জোয়ারে জলের তলায় চলে যায়। এই কর্দমাক্ত ভূমির ভিতরের দিকের অংশই ম্যানগ্রোভ অরণ্যের জন্য উপযুক্ত।

এইরকম অনেক কর্দমাক্ত পথ বা মাডফ্ল্যাটস্ ছড়িয়ে আছে সুন্দরবন জাতীয় উদ্যানের বাইরে, যেগুলিতে এখন পর্যটকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভাঁটার সময় এইসব অঞ্চল থেকে সুন্দরবনকে উপভোগ করা যায়।

সুন্দরবনের জীব পরিম্ডল সংরক্ষণের জন্য তিনটি বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য তৈরি করা হয়। সজনেখালি, হ্যালিডে এবং লোথিয়ান অভয়ারণ্য। বর্তমানে পশ্চিম সুন্দরবন নামে একটি অভয়ারণ্য তৈরি হয়েছে। ৬ বর্গ কিমি-র হ্যালিডে দ্বীপই হ্যালিডে অভয়ারণ্য। বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী এই

সুন্দরবনের কুমীর

দ্বীপটি মাতলা নদীর তীরে। স্পটেড ডিয়ার, বন্য বার্কিং ডিয়ার এবং রেহসাস ম্যাকাওর জন্য এই দ্বীপ বিখ্যাত।

নানা ধরনের পাখি এবং বিলুপ্তপ্রায় বা নথিবদ্ধ করা হয়নি এমন অনেক ধরনের প্রাণীও এখানে আছে। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সাঁতরে সাঁতরে মাঝে মধ্যে এখানেও কচিৎ চলে আসে।

লোথিয়ান—৩৮ বর্গ কিমির এই দ্বীপে পৌঁছে যাওয়া যায় নামখানা হয়ে। এই দ্বীপে বাঘেরা আসে না। পর্যটকেরা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায় ম্যানগ্রোভ অরণ্যে। আছে নানা ধরনের সাপ, আছে পাখী, কুমির, হরিণ, আর ডলফিন।

চুলকাটি এবং ধূলিভাসানি বনাঞ্চলের কলস দ্বীপের কাছে ৪৬২.৩৯ বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে কলস বন্যপ্রাণ এলাকা। বিভিন্ন নদীর এক অত্যাশ্চর্য পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এখানে সুন্দরবন অরণ্যের রামগঙ্গা রেঞ্জের মধ্যে ৫৩ ফুট উঁচু একটি ওয়াচটাওয়ার অর্থাৎ নজরমিনার থেকে এই দ্বীপের অসাধারণত্ব উপভোগ করা যায়। চুলকাটিতে ৭টি এবং ধূলিভাসানিতে ৯টি বাঘ আছে—এমন কথা শোনা যায়। এছাড়া আছে নানা ধরনের বন্যপ্রাণ। এখানে মাতলা এবং ঠাকুরান নদীর বিশাল ব্যাপ্তি যেমন চোখ জুড়িয়ে দেয়, তেমনি কুমীরেরা প্রতি বছর এই নদীর পাড়ে পাড়ে আসে সন্তানের জন্ম দিতে। সৌন্দর্য আর ভয়ংকরতা এখানে পাশাপাশি অবস্থান করে।

প্যাঙ্গোলিন

সুন্দরবনে রিসাস ম্যাকাক (Rhesus Macaque)

বনবাস

অভ্যস্ত জীবনের বাইরে, গৃহ-স্বাচ্ছন্দ্যের বেড়া ডিঙিয়ে অচেনা, অজানা অরণ্যে অরণ্যে ঘুরে বেড়ানোর মানে জীবনকে চেখে চেখে দেখা, জানা, বোঝা। প্রকৃতির কোলে কয়েকটা দিনের জন্য সব ব্যস্ততা সরিয়ে রেখে চলে যেতে হবে। সেখানেও আছে সাজানো ঘর-বাড়ি। বনবাসে বনাবাসের দিশা দেখাতেই এই সচিত্র তথ্যের উপস্থাপনা।

বরদাবাড়ি

হাসিমারা থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে, মাদারিহাট ব্লকে অবস্থিত এই এলাকা। কাছেই রয়েছে বক্সা ব্যাঘ্র অভয়ারণ্য, হাসিমারা থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ খয়রাবাড়ি লেপার্ড পুনর্বাসন ও সংরক্ষণ কেন্দ্র, রসিকবিল চিড়িয়াখানা, কোচবিহার অভয়ারণ্য, চিলাপাতা ফরেস্ট সাফারি, বক্সা ফরেস্ট সাফারি ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গ অরণ্য উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের মালঙ্গি লজে পৌঁছতে গেলে নামতে হবে আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে। বরদাবাড়ি অরণ্যের খুব কাছে অবস্থিত এই লজের ঘরের জানলায় বসেই অরণ্যের পাখিদের কলকাকলি শুনতে পাওয়া যায়। পর্যটকেরা এখানে থাকলে স্থানীয় সংস্কৃতির ছোঁয়া পাবেন।

বনরিনি, বনতিথি-সহ ১০টি ঘরের ভাড়া ২২০০ টাকা থেকে ২৫০০ টাকা।

যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর : বরদাবাড়ি, হাসিমারা, আলিপুরদুয়ার, শহর—বরদাবাড়ি, পিন-৭৩৪১২১। পর্যটকেরা লজে বুকিং-এর জন্য ৯৯৩২৫-৮৮১৯৭/৮৫০৯৩-১৮৯৮৫ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। অনলাইনে বুকিং-এর ব্যবস্থা আছে।

ঝোলাং

জলঢাকা নদীর তীরে অবস্থিত ঝালং বা ঝোলাং-এর প্রাকৃতিক নয়নাভিরাম সৌন্দর্য দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এখানকার উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান হল বিন্দু বাঁধ, ডালগাঁও ভিউ পয়েন্ট, চাপরামারি এবং ভুটান সীমান্ত। নিকটতম রেল স্টেশন—নিউ মাল। নিকটতম বাস স্ট্যান্ড—ঝোলাং।

পশ্চিমবঙ্গ অরণ্য উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের ঝোলাং রিভার ক্যাম্প রিসর্টটি তৈরি হয়েছে জলঢাকা নদীর তীরে। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রমণীয়।

চারটি কটেজের প্রতিটি দ্বিশয্যা বিশিষ্ট। ভাড়া ২৫০০ টাকা করে।

যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর : ঝোলাং বাজার, রঙ্গ ফরেস্ট, শহর-ঝোলাং, পিন-৭৩৪৫০৩। ফোনে বুকিং-এর জন্য ৯৪৭৬৩-৯২০২৬/৯৪৩৪৮-৩৪৩৪৪ নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে। অনলাইনে বুকিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে।

লাভা

২৩৫০ মিটার উঁচুতে প্রকৃতির কোলে জেগে ওঠা এক শহর লাভা। শব্দবন্ধনীর মালায় যে শহরের বর্ণনা করা যায় না। একদিকে বরফে ঢাকা হিমালয়ের একের পর এক শৃঙ্গ, অন্যদিকে গভীর নীল আকাশের হাতছানি। সূর্যাস্ত দেখার সবথেকে সুন্দর জায়গা সানসেট পয়েন্টের সৌন্দর্য কখনও ভোলা যায় না। উত্তরবঙ্গের গেটওয়ে হিসেবে চিহ্নিত শহর কালিম্পং থেকে লাভার দূরত্ব ৩২ কিলোমিটার। নিকটতম বিমানবন্দর-বাগডোগরা। নিকটতম রেল স্টেশন-নিউ জলপাইগুড়ি।

১৩টি কটেজের ভাড়া ১১০০, ১৪০০ এবং ১৫০০ টাকা।

যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর : লাভা অরণ্য অঞ্চল, শহর-কালিম্পং, পিন-৭৩৪৩১৯। এখানে ফোনে বুকিং-এর জন্য ৮৯৭২০-০০২৭৮/৮০১৬১-০৫২২১/৯৭৩৪১-৬৪১১৩/৯৬৩৫২-৪২০১৪ নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে। অনলাইনেও বুকিং-এর ব্যবস্থা আছে।

লোলেগাঁও

শহরের ক্লান্তি আর হইচই থেকে একধাক্কায় শত যোজন দূরে। স্থির শান্ত অথচ প্রাণচঞ্চল পাহাড়ের সামনে ধ্যানমগ্ন প্রকৃতি। দার্জিলিং জেলার কালিম্পং মহকুমার লোলেগাঁও।

উত্তরবঙ্গগামী যে কোনও ট্রেনে চেপে পৌঁছে যান নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন। সেখান থেকে কালিম্পং, রেলি হয়ে ১০৩ কিলোমিটার দূরে এই লোলেগাঁও। আবার গরুবাথান, লাভা হয়েও পৌঁছনো যায় এখানে।

বখিম, জ্যাবলিং, অর্কিড-সহ ১২টি কটেজ এবং দুটি সুইট এক কথায় অসাধারণ। ভাড়া ২২০০ থেকে ৩৫০০ টাকা। টিভি, অ্যাটাচড বাথ আর ক্যান্টিন-এর সুবিধা রয়েছে।

প্রকৃতিপ্রেমিকদের জন্য আদর্শ। পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা শান্ত সমাহিত এলাকা। ৮০ মিটার দীর্ঘ ঝুলন্ত ফুটব্রিজ পর্যটকদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। লোলেগাঁও থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে লেপচা আদিবাসীদের গ্রাম কাফের। সেখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা অপরূপ। কপাল ভালো থাকলে ঝান্ডিদারা ভিউ পয়েন্ট থেকে সূর্যোদয় উপভোগ করে নিতে পারেন।

যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর : লোলেগাঁও, কালিম্পং-৭৩৪৩১৪। ফোন নম্বর—৯৪৩৪১-১৫৪৫৫/৬২৯৪৪-৩৯১৮৯।

লেপচাজগৎ

দার্জিলিং শৈল শহর থেকে মাত্র ১৯ কিলোমিটার দূরের ছোট্ট এক গ্রাম লেপচাজগৎ। নিজস্ব সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ এই স্থানটি ৬৯৫৬ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। প্রকৃতিপ্রেমী যেকোনও মানুষকে এখানে অন্তত ২টি দিন কাটাতেই হবে। ঘুম পর্বতশৃঙ্গ মাত্র ১.৫ কিলোমিটার দূরে। দার্জিলিং ঘুরতে গেলে সঙ্গে অবশ্যই লেপচাজগৎ ঘুরে আসা যায়। নিকটতম বিমানবন্দর-বাগডোগরা, নিকটতম রেল স্টেশন-নিউ জলপাইগুড়ি।

৫টি নন-এসি ঘরে থাকার ব্যবস্থা আছে। ভাড়া ৩০০০ থেকে ৩৫০০ টাকা।

যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর : লেপচাজগৎ। শহর-দার্জিলিং, পিন-৭৩৪১০২। ফোনে ৯৪৩৪৩-২৮৯৭৯/৯৪৭৪৫-৮৪৯২৫ নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

মংপং

পূর্ব হিমালয়ে প্রকৃতির কোলে অনবদ্য এক পর্যটনকেন্দ্র। সূর্যের হালকা আভা আর ঠাণ্ডা বাতাস যেন সৌন্দর্যে নতুন মাত্রা যোগ করে প্রতিক্ষণ।

তিস্তার তীরে বনভোজনের স্বাদ নিতে পারেন। অথবা ঘন অরণ্যানির মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে কাছ থেকে ছুঁয়ে দেখতে অংশ নিতে পারেন ট্রেকিংয়েও। উদার প্রকৃতির কোল ছুঁয়ে হেঁটে আসুন নদীর তীর ধরে অথবা খানিকটা জঙ্গলের ভিতরে। জাতীয় সড়ক পার হয়ে গাছগাছালিতে ঘেরা রাস্তা ধরে পৌঁছে যান ছোট্ট এক নদী-উপত্যকায়। দেখে নিতে পারেন ব্রিটিশ আর্কিটেকচারের অনন্য নিদর্শন-সেবক ব্রিজ। গাড়িতে চেপে আরও ১০ মিনিট—পৌঁছে যান সেবকে।

নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশন নিউ জলপাইগুড়ি। শিলিগুড়ি থেকে সড়কপথে ৩২ কিলোমিটার।

চারটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ইকো টুরিজম কটেজ—কালিজ, মুনাল, ট্রাগোপান আর কাক্কু (cuckoo)। প্রতিটির ভাড়া দৈনিক ২০০০ টাকা। আছে আরও চারটি দ্বিশয্যাবিশিষ্ট ঘর। ভাড়া ২৫০০ টাকা করে।

যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর : মংপং, কালিম্পং-৭৩৪০০১। ফোন নম্বর—৯০০২৩-৭১৮৫০/৯৪৭৪০-৮৪৫৮২

মূর্তি

গরুমারা জাতীয় উদ্যান, চাপড়ামারি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি, লাটাগুড়ি অরণ্য, খুনিয়ার জঙ্গল, চুকচুকি বার্ড স্যাংচুয়ারি—এত কিছু যে গুনে শেষ করা যায় না। আর এই সবকিছুই মূর্তি ইকোটুরিজম সেন্টারের আশপাশে।

শিলিগুড়ি থেকে দূরত্ব ৭৩ কিলোমিটার আর নিউ মাল জংশন থেকে ১৮ কিলোমিটার। এছাড়া বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকেও মূর্তি পৌঁছে যেতে পারে।

এখানকার বনানীতে কটেজ ও দ্বিশয্যা বিশিষ্ট ঘর মিলিয়ে ১৬টি ইউনিটে রয়েছে থাকার ব্যবস্থা। ভাড়া ২০০০ টাকা থেকে ২৮০০ টাকা। টিভি, বাতানুকূল ব্যবস্থা, অ্যাটাচ্‌ড বাথ, ইন্টারকম ছাড়াও রয়েছে ওয়াইফাই এবং ক্যানটিনের সুবিধা।

যোগাযোগ: গ্রাম-উত্তর ধূপঝোরা, পোস্ট অফিস-বাতাবাড়ি, থানা-মাটিয়ালি, জেলা-জলপাইগুড়ি, মালবাজার-৭৩৫২০৬, ফোন-৯৭৩৪৯-২৭৮৭৯

প্যারেন

উইক-এন্ডে বেড়াতে যেতে চান? প্রকৃতির আলোয় শান্তির সন্ধান করতে ঘুরে আসুন ডুয়ার্সের 'প্যারেন' থেকে। ঘন সবুজ বন, নদী, কৃষিজমি, ছবির মতো সুন্দর গ্রাম—আর কী-ই বা চাইতে প্যারেন? 'বিন্দু' যাওয়ার পথে ভুটান ও ভারত সীমান্তে অবস্থিত এই 'প্যারেন'। জলঢাকা থেকে গাড়িতে ১০ কিলোমিটার।

বিন্দুর দিকে যেতে অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আপনাকে মোহিত করে দেবে। প্রকৃতি এখানে অকৃপণ।

'প্যারেন' কটেজের পাশেই ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এখান থেকেই নেচার রিসর্ট ও 'পারেন' ফরেস্ট ভিলেজে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

'বিন্দু' যাওয়ার পথে এগিয়ে বাঁদিকের রাস্তা ধরলে ভারত-ভুটান সীমান্তের শেষ প্রান্তে 'প্যারেন'। জলঢাকা থেকে ভাড়ার গাড়ি মিলবে। শিলিগুড়ি থেকে জলঢাকা হয়ে 'প্যারেন' ১১৬ কিলোমিটার। 'প্যারেন'-এ রয়েছে ৪টি কটেজ। প্রতিটির ভাড়া দৈনিক ২০০০ টাকা।

যোগাযোগ :

জলঢাকা-৭৩৪৫০৩
ফোন নম্বর-৯৪৭৪৯-০৫২৮২

সামসিং

ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম সামসিং। সবুজ চা বাগিচা, পাহাড় আর জঙ্গলের সৌন্দর্য দিয়ে মোড়া।

নেওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক থেকে দূরত্ব ১৮ কিলোমিটার। সামসিং-এ বৃষ্টির পরিমাণ বেশি। অসংখ্য পিকনিক স্পট ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। লালি গুরাজ, রকি আইল্যান্ড, সানতালেখোলা। নেওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক এখান থেকে ১ ঘণ্টার দূরত্বে। চা-বাগান এলাকায় নেপালি ভাষাভাষী মানুষের প্রাধান্য রয়েছে। মেঘের ঘরে কাটিয়ে আসতেই পারেন কয়েকটা দিন।

রংবেরঙের অজানা নানা পাখির কলকাকলি এক ঝটকায় ভুলিয়ে দেবে শহরবাসের ক্লান্তি। পক্ষীপ্রেমীদের স্বর্গরাজ্য। শিলিগুড়ি থেকে চালসা হয়ে ৮১ কিলোমিটার এবং নিউ মাল জংশন থেকে ৩০ কিলোমিটার। নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশন নিউ জলপাইগুড়ি।

দ্বিশয্যার ৭টি ঘর—ভাড়া ২৫০০ থেকে ৩৫০০ টাকা।

যোগাযোগ :
সামসিং, কালিম্পং-৭৩৫২২২।
ফোন-৯৬৩৫৬-৬৬৮৪৬

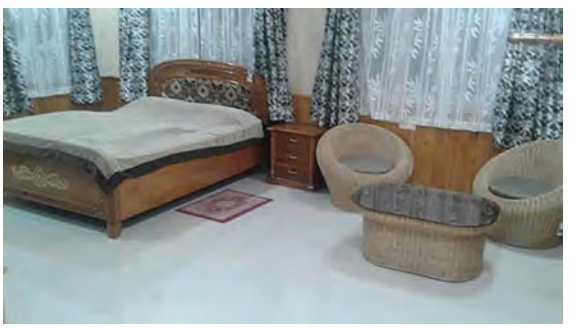

সানতালেখোলা

কালিম্পং-এর ছোট্ট গ্রাম সানতালেখোলা। নদীর নাম থেকেই গ্রামের নাম। নেপালি ভাষায় সানতালে মানে কমলা এবং খোলা মানে নদী। সামসিং থেকে দূরত্ব ৫ কিলোমিটার। পাখি আর প্রজাপতির বিচিত্র সম্ভার।

প্রকৃতিকে কাছ থেকে জানতে সামসিং থেকে ট্রেকিং করে পৌঁছে যেতে পারেন সানতালেখোলায়। এছাড়াও দেখুন রকি আইল্যান্ড, মৌ-চুকি।

শিলিগুড়ি থেকে দূরত্ব ৮৫ কিলোমিটার। ৭টি কটেজ ছাড়াও রয়েছে ২টি ঘর—অরেঞ্জ ও স্ট্রবেরি। কটেজের ভাড়া ১৮০০ টাকা আর ঘরপিছু দৈনিক ভাড়া ২৫০০ টাকা।

যোগাযোগ :

সামসিং, কালিম্পং-৭৩৫২২২।

ফোন নম্বর-৯৬৩৫৬-৬৬৮৪৬

রাজাভাতখাওয়া

আলিপুরদুয়ার থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে রাজাভাতখাওয়া বক্সা টাইগার রিজার্ভের অভ্যন্তরে অবস্থিত। টাইগার রিজার্ভ ছাড়াও জয়ন্তী নদী, হাতিপোতা, ফুন্টসলিং মুখ্য আকর্ষণ। শিলিগুড়ি থেকে ১৮৫ কিলোমিটার আর বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে ২০০ কিলোমিটার। রাজাভাতখাওয়া-বক্সা জঙ্গল লজের ১৩টি ঘরে রয়েছে ৩২টি শয্যা। ঘরপিছু ভাড়া দৈনিক ১৬০০ টাকা থেকে ৩৭০০ টাকা।

যোগাযোগ :

বক্সা টাইগার রিজার্ভ
আলিপুরদুয়ার-৭৩৫২২৭
ফোন-৭৯০৮৯-৮৫৭৫২

BUXA JUNGLE LODGE-II

রসিকবিল

আলিপুরদুয়ার থেকে ৩৪ কিলোমিটার এবং কোচবিহার থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত রসিকবিল বাংলার বনপর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ। রসিকবিল থেকে ২ কিলোমিটার দূরে রয়েছে জলদাপাড়া, প্রকৃতিপ্রেমীদের ভালবাসার জায়গা। পর্যটকরা এখানে এলে অরণ্যের সৌন্দর্য এবং বক্সা ব্যাঘ্র অভয়ারণ্যের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন। অন্যান্য দর্শনীয় জায়গা হল—কোচবিহার রাজপ্রাসাদ, বক্সা জঙ্গল সাফারি, রসিকবিল মিনি জু ইত্যাদি।

এখানে রয়েছে ২টি কটেজ। ভাড়া ১২০০ টাকা করে।

যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর : রসিকবিল, কোচবিহার, পিন-৭৩৪১২১। বুকিং-এর জন্য ৯৫৬৪২-৮৪০৪৭/৮৫০৯৩-১৮৯৮৫ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। অনলাইনে বুকিং-এর ব্যবস্থাও আছে।

গড়পঞ্চকোট

পুরুলিয়ায় পাঞ্চেত পাহাড়ের কোলে অবস্থিত গড়পঞ্চকোট হল এক প্রাচীন দুর্গে ঘেরা শহর। বাংলার বুকে অষ্টাদশ শতকে যে বর্গির আক্রমণ হয়েছিল, এখানকার প্রাচীন দুর্গগুলির ধ্বংসাবশেষ দেখলে বুঝতে পারা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৭৪০ সালের এপ্রিলে আলিবর্দি খাঁ বাংলার নবাব হন, সরফরাজ খানকে পরাজিত এবং হত্যা করে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান হল—পাঞ্চেত বাঁধ, জয়চণ্ডী পাহাড়, মাইথন বাঁধ, ব্রিঞ্চি ধাম ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গ অরণ্য উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের গড়পঞ্চকোট প্রকৃতি ভ্রমণ কেন্দ্রে পৌঁছতে ট্রেনে বা বাসে যাওয়া যায়। কলকাতা থেকে ২৫২ কিলোমিটার। আসানসোল থেকে ৩৪ কিলেমিটার এবং পুরুলিয়া থেকে ৬৫ কিলোমিটার। নিকটতম রেল স্টেশন বরাকর (পূর্ব রেলওয়ে) এবং আর্দ্রা (দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে)।

১৭টি কটেজের ভাড়া ১৮০০ থেকে ৪৫০০ টাকা। এছাড়াও রয়েছে ৬টি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ৩০০০ টাকা।

যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর : গ্রাম–বাঘমারা, পোস্ট অফিস—রামপুর, থানা–নেবুরিয়া, শহর–রঘুনাথপুর, পিন-৭২৩১২১। অনলাইন বুকিং ছাড়াও ফোনে বুকিং-এর জন্য ৮০১৬৩-০৪৭০৯/৯৪৩৪৯-৯০৩৭৮ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। অনলাইনে বুকিং-এর ব্যবস্থা আছে।

ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রাম পর্যটন কেন্দ্রটি বিখ্যাত ঝাড়গ্রাম রাজ প্রাসাদ, রাধাকৃষ্ণ মন্দির, কনক দুর্গা মন্দির, চিল্কিগড় রাজ প্যালেস-এর জন্য। ঝাড়গ্রাম শহর থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত জঙ্গলমহল জুলজিক্যাল পার্কটি পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। অন্যদিকে ঝাড়গ্রাম শহর থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বেলপাহাড়িতে ডুলুং নদীর ওপর খান্দারানী বাঁধ এবং বোখরা জলপ্রপাত-সহ সাবিত্রী মন্দির দেখতে প্রচুর মানুষ ভিড় করেন। সুবর্ণরেখার তীরে হাতিবাড়ি অরণ্যও অন্যতম আকর্ষণীয় কেন্দ্র।

বাসপথে কলকাতা থেকে ঝাড়গ্রামের দূরত্ব ১৭৮ কিলোমিটার এবং ট্রেনে ১৫৪ কিলোমিটার। কলকাতা থেকে সরাসরি ইস্পাত এক্সপ্রেস, স্টিল এক্সপ্রেস, হাওড়া-রাঁচি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ধরে সরাসরি এখানে পৌঁছনো যায়। পশ্চিমবঙ্গ অরণ্য উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের ঝাড়গ্রাম প্রকৃতি পর্যটন কেন্দ্র আসলে পর্যটকদের জন্য প্রকৃতির কোলেই ইকো-কটেজ তৈরি করা হয়েছে। বাঁদরভুলা কাঠগুদামের উল্টোদিকে তৈরি হয়েছে এগুলি।

যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর : বাঁদরভুলা ইকো-টুরিজম কমপ্লেক্স, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৫০৭। পর্যটকেরা লজে বুকিং-এর জন্য ৯০৯১৯-১৪৮২৮ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

লোধাশুলি

কলকাতা থেকে সড়কপথে ১৬৫ কিলোমিটার এবং ঝাড়গ্রাম জেলা সদর থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে এই লোধাশুলির জঙ্গল। ঘন শাল অরণ্যের সবুজ হাতছানি।

নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশন ঝাড়গ্রাম। কলকাতা থেকে যায় ইস্পাত এক্সপ্রেস, স্টিল এক্সপ্রেস, হাওড়া-রাঁচি ইন্টারসিটি সহ নানা ট্রেন। সেখান থেকে বাস বা ট্রেকারে পৌঁছে যান লোধাশুলি।

প্রকৃতি পর্যটন কেন্দ্রে কুসুম, পলাশ, অর্জুন, মহুলা, পিয়াশাল আর শাল এই ছটি ঘরের ভাড়া ১৬০০ থেকে ২০০০ টাকা। ঘরে বসে পাবেন টিভি, অ্যাটাচড বাথ, ইন্টারকম এবং বাতানুকূল ব্যবস্থা। এছাড়া আছে ক্যান্টিন-ও।

ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি, কনকদুর্গা মন্দির-সহ একগুচ্ছ পর্যটন কেন্দ্র ঘুরে সোজা চলে আসুন লোধাশুলি।

যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর : লোধাশুলি রেঞ্জ ও টিম্বার ডিপো, মেদিনীপুর ফরেস্ট কর্পোরেশন ডিভিশন, লোধাশুলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ফোন নম্বর—৯০৯১৯-১৪৮২৮।

গড়চুমুক

হাওড়া জেলায় হুগলি এবং দামোদর নদ যেখানে মিশছে, সেখানে পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হল গড়চুমুক। নিকটতম রেল স্টেশন উলুবেড়িয়া। একদিকে গঙ্গার সৌন্দর্য, অন্যদিকে নদীবাঁধ, যাকে ৫৮ গেটও বলা হয়। ওখানকার অন্যতম আকর্ষণ হরিণ পার্ক। গড়চুমুক থেকে কাছেই রয়েছে গাদিয়ারা—যেখানে দামোদর, হুগলি এবং রূপনারায়ণ নদ এসে মিশছে এবং সুন্দর পিকনিক স্পট তৈরি করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ অরণ্য উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের গড়চুমুক ইকো টুরিজম সেন্টারটি একেবারে নদীর ধারে। রয়েছে ডবল বেডের ডিলাক্স ঘর—সমস্ত সুযোগসুবিধাসহ এবং শিশুদের আলাদা খেলার জায়গা। পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্র।

রূপনারায়ণ, গঙ্গা, দামোদর ও সরস্বতী-এই ৪টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের প্রতিটির দৈনিক ভাড়া ২০০০ টাকা।

যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর : ঘুড়িগাছি, ইন্দিরানগর, ৫৮ গেট, ফেরি ঘাট, থানা-শ্যামপুর, শহর—হাওড়া, পিন-৭১১৩১৫। পর্যটকেরা লজে বুকিং-এর জন্য ৯৯০৩৪-১২১৪৭/৯৮৩১৫-১০৯৯৭/৯২৩১৬-৯৬১১৫/৮৬১৭৭-৬৪৭৫৮ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। অনলাইনে বুকিং-এর ব্যবস্থা আছে।

তাজপুর

সমুদ্রসৈকত বরাবরই সুন্দর। তাজপুর হল ভারতের অন্যতম আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম। দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুরের তাজপুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমুদ্রসৈকত। কলকাতা-দিঘা রুটের ওপর, দিঘা থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত তাজপুর। খুব কাছেই জনপ্রিয় মন্দারমণি এবং শঙ্করপুর। পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন বৃত্তে অন্যতম আকর্ষণীয়। একদিকে ধূ-ধূ বালুময় তটভূমি আর তার মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সারি সারি লাল কাঁকড়া। কাছেই উদয়পুর। রয়েছে নানা ধরনের জলক্রীড়ার সুযোগ। কলকাতা থেকে তাজপুর ১৮০ কিলোমিটার। ধর্মতলা থেকে বাসেও যাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ অরণ্য উন্নয়ন নিগমের তাজপুর প্রকৃতি পর্যটন কেন্দ্রটি এমন জায়গায়, যেখান থেকে দেখলে মনে হবে সমুদ্র আর সীমানা মিশে গেছে। আশপাশে রয়েছে গভীর অরণ্য।

দুটি দ্বিশয্যা বিশিষ্ট বাতানুকূল ঘরের দৈনিক ভাড়া ২৫০০ ও ৩৫০০ টাকা। দুটি সুইটের ভাড়া ৪০০০ টাকা করে।

যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর : তাজপুর আউট পোস্ট, বিট-শঙ্করপুর, রেঞ্জ-কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর ফরেস্ট ডিভিশন, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ। পিন-৭২১৬৫৬। বুকিং-এর জন্য ৯০৯১৯-১৪৮২৮ নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

মুকুটমণিপুর

মুকুটমণিপুরে সোনাঝুরির অরণ্যে বনবাস। বাঁকুড়া জেলার খাতড়া মহকুমা থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে রয়েছে অরণ্য। এখানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় হল কংসাবতী এবং কুমারী নদীর সঙ্গমস্থল। মুকুটমণিপুর বিখ্যাত কংসাবতী বাঁধের জন্য। রয়েছে ডিয়ার পার্ক এবং পরেশনাথ মন্দির। মুকুটমণিপুর থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে রয়েছে মা অম্বিকা মন্দির। উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ হল বোটিং। পর্যটকরা ইচ্ছে করলে মুকুটমণিপুর থেকে ৬৫ কিলোমিটার দূরে বিষ্ণুপুর ঘুরে আসতে পারেন। নিকটতম রেল স্টেশন বাঁকুড়া। কলকাতা থেকে দূরত্ব ২১০ কিলোমিটার।

৪টি বাতানুকূল ঘরের ভাড়া ২০০০ টাকা করে। ফ্যামিলি রুম ৩টি নন-এসি—৬ শয্যার। তাল, তমাল মাহুল। প্রথম দুটি ঘরের ভাড়া ৩৩০০ টাকা দৈনিক। মাহুলের ভাড়া ৪৪০০ টাকা। এছাড়া দুটি এসি কটেজ আছে। ভাড়া ২০০০ টাকা দৈনিক।

যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর :

গ্রাম-মুকুটমণিপুর, মহকুমা-খাতড়া, জেলা-বাঁকুড়া, শহর-মুকুটমণিপুর,
পিন-৭২২১৩৫। বুকিং-এর জন্য ৮২০৭২-০৪৬৩৫ নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

বঙ্গদর্শন

বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিশ্বে আজও বাংলার মাথা উঁচু করে রেখেছে। কখনও ধর্মকেন্দ্রিক শিল্পকলা, কখনও বা কুটিরশিল্প, কখনও বা সাহিত্য-দর্শন। তাছাড়াও আছে জনজাতীয় জীবন-সংস্কৃতির আদিমতার আধুনিক ধারাবাহিকতা।

জীবনের সবক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠতার প্রতি গভীর নিষ্ঠা বাংলাকে নতুন জীবনে প্রাণিত করে চলেছে। এই গতিশীলতাই ধরা পড়েছে এই সংখ্যার 'বঙ্গদর্শন'-এ একগুচ্ছ নিবন্ধে।

ছবি: কাজল বিশ্বাস

আদিবাসী সমাজ ও জঙ্গলমহল : বাংলার জীবনসংস্কৃতির উত্তরাধিকার

সুপ্রিয়া রায়

কোনো দেশের ইতিহাসের প্রধান কথাই হল সেই দেশের জনসাধারণের কথা। আর জনসাধারণের ইতিহাস হল সেই দেশের সমাজবিন্যাসের ইতিহাস। সমাজবিন্যাস অথবা বৃহত্তর সামাজিক ইতিহাসে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের মতো সন-তারিখ অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও একথা মনে রাখতে হবে যে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক বিপ্লব অনেক সময়ই সমাজের চেহারাটা একেবারে বা অনেকটাই বদলে দেয়। রাজা বা রাজবংশের হঠাৎ পরিবর্তন সমাজবিন্যাসকে রাতারাতি পালটে দেয় না। প্রাচীন বাংলা, ভারতবর্ষ এমনকি প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধারাই দেখা যায়। অনেকেই মনে করেন, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঘটনা ও বিপ্লবেও বহুদিন ধরে ধীরে ধীরেই বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সমাজবিন্যাসে বদল ঘটে।

দেখা যাচ্ছে, আর্যদের ভারতে আগমনের আগে যে সমাজবিন্যাস ছিল সেই সমাজবিন্যাসের সম্পূর্ণ পরিবর্তন আজও সম্ভব হয়নি। আর্য ও অনার্য—এই দুই সমাজবিন্যাসের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলেছে প্রায় হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে এবং তারই ফলশ্রুতি আজকের সমাজ।

আদিবাসী অর্থে আমরা 'আদিম বাসিন্দা' অর্থাৎ যারা এককালে এ দেশের প্রথম আদিবাসী, তাদের উত্তরসূরিদের বুঝি।

এই অর্থে 'আদিবাসী' বলতে কোনো একক গোষ্ঠীকে বোঝায় না। ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি সংবিধানের তফসিলভুক্ত গোষ্ঠী (Scheduled tribe)। তাঁদের জীবন-সংস্কৃতির বিশিষ্টতায় আজও তাঁরা সকলের নজর কাড়ে। তাঁরা সুপ্রাচীন ভারতজনের উত্তরসূরি। তাঁদের জীবনযাত্রা, দিন-চর্যা, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মবিশ্বাস, অশরীরী বা অতি-প্রাকৃত শক্তির কল্পনা একটা নির্দিষ্ট জীবন-ছক তৈরি করে দিয়েছে।

এই জীবন-ছককে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাঁরা সদা উদগ্রীব। তবুও এই 'ছকে' থেকেই অনেকেই পেরেছেন তথাকথিত 'উন্নত' জীবনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে। অর্থাৎ উন্নয়নের ডানায় উড়তে পেরেছেন তাঁরা। সেই উন্নয়ন এখনও চলছে। পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের সার্বিক উন্নয়নই রাজ্যসরকারের লক্ষ্য।

এ প্রসঙ্গে তুলে ধরা যেতে পারে বিশিষ্ট আদিবাসী গবেষক ও লেখক ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কের কথা — 'একটা কথা পরিকল্পনাকারীরা ভুলে যান যে, বহু যুগ হতে যাদের অন্ধকারে ফেলে রাখা হয়েছে, তাদের হাত ধরে প্রখর আলোকে টেনে আনা যায় না, আস্তে আস্তে আনতে হয়।'

জঙ্গলমহল

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ৮টি ব্লক নিয়ে 'জঙ্গলমহল'— প্রশাসনিক অঞ্চল।

এই অঞ্চল বিশেষভাবে পিছিয়ে ছিল—স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মানদণ্ডে। আদিবাসী-অধ্যুষিত এই অঞ্চলের দারিদ্র্য ও দুর্দশা অত্যন্ত প্রকট। মা-মাটি-মানুষের সরকার বিগত আট বছরে পরিকল্পিতভাবে এই প্রথম 'উন্নয়ন'-এর কাজ শুরু করে ওই অঞ্চলে। ২০১১ সালে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর 'জঙ্গলমহল' নিয়ে সকলেই আশান্বিত হয়ে ওঠে।

২০০১ সাল থেকেই ওই অঞ্চলে শুরু হয়েছিল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের নানা আতঙ্কজনক পরিস্থিতি। জঙ্গলমহলের পর্যটন কেন্দ্রগুলো তখন থেকেই বা তার আগে থেকেই পর্যটকদের কাছে নিরাপদ থাকছিল না। সরকারি অনুমতি পাওয়া যাচ্ছিল না বনাঞ্চলের বনবাংলোগুলোয় যাওয়ার। ধীরে ধীরে একের পর এক সরকারি কর্মীদের ওপর শুরু হল আক্রমণ। সরকারি নার্স বা থানার ওসি-র ওপর চরমপন্থী আক্রমণ প্রশাসনিক কাঠামোকে ক্রমশ দুর্বল করে দিতে লাগল। সরকারি পরিষেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে লাগল মানুষ। কারণ সরকারি কর্মী ও আধিকারিকদের সব জায়গায় পাঠানো যাচ্ছে না। এইভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল জনগণ ও সরকার তথা প্রশাসন।

এই বিচ্ছিন্নতার ফল হল মারাত্মক। একদল সুযোগসন্ধানী মানুষ কখনো রাজনৈতিক দলের কর্মী সেজে, কখনো বা রাজনীতির আদর্শের বুলি শুনিয়ে বুভুক্ষু, অসহায় মানুষকে কখনো বা খেপিয়ে তুলল, কখনো বা মিথ্যে স্বপ্ন দেখাতে লাগল।

এইসব অঞ্চলের সহজ-সরল আদিবাসীদের জীবনে ধীরে ধীরে নেমে এল ঘোর দুর্দিন।

শুরু হল লড়াই। দিন বদলের স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল তাঁদের। বহুদিন ধরে 'বঞ্চিত' হওয়ার ক্ষোভ তাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়কেও ধীরে ধীরে প্রতিবাদী করে তুলল। রাতের পর রাত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, নারী-শিশু-যুবক-যুবতীদের জড়ো করা হত। অসহায় মানুষগুলো বাধ্য হত, এইভাবে মাইলের পর মাইল অরণ্য-পাহাড়বেষ্টিত অঞ্চলে জড়ো হতে। চলত রাজনৈতিক আদর্শের নামে নেতাদের বক্তৃতা শোনা, তাঁদের কর্মকাণ্ডের শরিক হওয়া। সমান্তরাল প্রশাসন চালানো হতে লাগল যেন।

২০১৫-র ডিসেম্বরে যখন জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, কথা বলছিলাম গ্রামের মানুষের সঙ্গে, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা সেই সব মানুষ তাঁদের দুঃসহ স্মৃতি বলে চলছিলেন। সেইসব রাতের আতঙ্ক আজও ভুলতে পারেন না তাঁরা।

শিশুদের স্কুল বন্ধ। চাষ করার উপায় নেই চাষির। খেত পড়ে আছে ফাঁকা। লড়াই, লড়াই, লড়াই। প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রশমিত হয় তো আবার ক্ষোভ জন্মায় মাওপন্থী নেতাদের বিরুদ্ধে। দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনে অসহনীয় কষ্টের ধারাপাত তাঁদের স্বপ্নকে মুছে দেয় বারবার। ঘর, সংসার, গ্রামসমাজ—সব যেন ছন্নছাড়া, তারই মধ্যে নানারকমের নির্যাতন। সন্ধে হলে ঘরেও মেয়েরা নিরাপদে থাকতে পারে না। আচমকা নেমে আসে লোভের থাবা।

আন্দোলনের চরিত্র ও অভিমুখ বদলাতে লাগল ধীরে ধীরে। সকলেই বুঝলেন—এর থেকে মুক্তি চাই। মুক্তি এল অবশেষে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শপথ নিয়েই শুরু করলেন রাজ্যে 'পরিবর্তন'কে বাস্তবায়িত করতে। শক্ত হাতে মোকাবিলা করলেন তিনি 'জঙ্গলমহল'-এর আন্দোলন।

ইতিহাসের পাতা থেকে 'জঙ্গলমহল' নামটা পৌঁছে গেল বিশ্বের কোণে কোণে। বাংলার অনেক মানুষেরই জঙ্গলমহল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। একটা আন্দোলন জঙ্গলমহলকে চিনিয়ে দিল। মানুষ ক্রমশ কৌতূহলী হয়ে উঠল জঙ্গলমহল সম্পর্কে। জঙ্গলমহল আর অনুন্নয়ন যেন সমার্থক হয়ে উঠেছিল। আর আজ ? মাত্র আট বছরে 'জঙ্গলমহল' হাঁটছে উন্নয়নের পথে, উন্নয়নের সঙ্গে।

জঙ্গলমহল-এর মানুষকে 'দুর্দশা' থেকে মুক্তি দিতে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা সকলের কাছে দু-টাকা কেজি দরে চাল পৌঁছে দিতে হবে। ভেঙে যাওয়া গণবণ্টন ব্যবস্থাকে সাজিয়ে ফেলা হল। তিনি কয়েকমাসের মধ্যেই ঘোষণা করলেন তিনটি জেলা জুড়ে সকলের জন্যই খাদ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা। অর্থাৎ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের সব মানুষই পাবেন দু-টাকা কেজি দরে চাল।

জঙ্গলমহলের মানুষের মুখে হাসি ফুটল। অনাহারের আশঙ্কা আর থাকল না। শিশুরা যেতে লাগল স্কুলে। তাদের জন্য মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা হল। সরকারি কলেজ তৈরি হল প্রত্যন্ত লালগড়ে। আন্দোলনের মুখ্য কেন্দ্র ছিল যে লালগড়। তারই দিকে দিকে তৈরি হল নানা মডেল স্কুল। নয়াগ্রামে হল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। পুরুলিয়ায় সিধু-কানু-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে তৈরি হল মসৃণ রাস্তা, গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গেল পানীয় জল, বিদ্যুৎ। কিশোরী মেয়েদের অল্পবয়সে বিয়ে বন্ধ করতে চালু হল কন্যাশ্রী। সারা রাজ্য জুড়েই কিশোরীদের উন্নয়নে 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প সাফল্য পেল, সাড়া ফেলল। কিন্তু 'জঙ্গলমহল'-এ এই প্রকল্পের ভূমিকা একটু আলাদা। পিছিয়ে-পড়া অঞ্চল, পিছিয়ে-থাকা-জনজাতির কারণে অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার রীতি এখানে অনেক গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় ফলে নারী শিক্ষা ও নারী তথা প্রজনন স্বাস্থ্যের অবস্থা খুবই খারাপ। 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প বিদ্যালয়ে মেয়েদের নিয়ে আসতে পারছে আরও বেশি করে। বিদ্যালয়ে আসার ফলে তাদের মধ্যে সচেতনতা এল। জীবনকে দেখতে লাগল অন্যভাবে। তাদের দেওয়া হল সাইকেল। দূরদূরান্ত থেকে সহজ হল তাদের বিদ্যালয়ে আসা। বছরে এখন ১০০০ টাকা করে পাচ্ছে তারা। দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়লে অবিবাহিত মেয়েরা পাচ্ছে ২৫,০০০ টাকা। উচ্চতর শিক্ষার জন্য 'কন্যাশ্রী ৩' চালু হয়েছে। প্রশিক্ষণও শুরু হয়েছে তাদের জন্য কোথাও কোথাও। চালু হল 'সবুজ সাথী'। মেয়েদের পর এবার ছেলেরাও পেল সাইকেল। স্কুলে যাওয়াটা হল সহজ। পেল স্বাধীনতার মজা। সবমিলিয়ে পড়াশোনা হয়ে উঠল আনন্দপাঠ। ক্লাসে উঠতেই বিনা পয়সায় নতুন বই, নতুন পোশাক, তাছাড়া নানা বৃত্তি। আদিবাসী ছেলেমেয়েদের জন্য চালু হল—'শিক্ষাশ্রী'। তৈরি হল অনেক আদিবাসী ছাত্রাবাস, আশ্রম-বিদ্যালয়।

জঙ্গলমহলে লাগল পরিবর্তনের ছোঁয়া। দ্বিতীয় দফায় নির্বাচনে জিতে আবার সরকার গঠন করল মা-মাটি-মানুষের সরকার। এই 'মানুষের জয়'-এ জঙ্গলমহল নিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। উজাড় করে তারা ভোট দিয়ে ফিরিয়ে আনল এই সরকারকে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার ছুটে যান জঙ্গলমহলে। পৌঁছে যান প্রত্যন্ত মানুষের কাছে। তারাও জানেন—তিনি আমাদের 'আপনজন'। তিনি আছেন আমাদের জন্য। আর মুখ্যমন্ত্রীও জানেন—ওরা আছে সরকারের সঙ্গে। সরকার তো ওদেরই। ওদের নিয়েই তো সরকার গড়েছেন তিনি। রাজ্যের আর্থিক সংকট সত্ত্বেও বারবার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন তিনি কেন্দ্রের দিকে—১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ হলেও ওদের কাজ দেব, খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের টাকা না এলেও দুটাকা কেজি দরে চাল দেওয়া হবে।

না খেয়ে মরবে না জঙ্গলমহলের মানুষ। আমলাশোলের অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা আর ঘটবে না।

জঙ্গলমহলের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করলেন। বড়ো বড়ো সেতুর পাশাপাশি গ্রাম-গঞ্জে তৈরি হল অনেক সাঁকো, স্পিল ওয়ে। অরণ্য-পাহাড়ের জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থার চরিত্রটাই আলাদা। শুকনো নদী বর্ষায় প্লাবিত হয়ে যায়। আটকে পড়েন গ্রামের মানুষ। এই অসুবিধা একে একে দূর করার কাজ চলছে।

উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় জল, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ—পাল্টে দিচ্ছে জঙ্গলমহলকে।

ক্রমশ সকলের কাছেই সহজগম্য হয়ে উঠছে জঙ্গলমহল। পাহাড়-অরণ্য-নদী-ঝোরা-ঝরনা সকলকেই ডাকছে। মানুষের ভিড় বাড়ছে। তাই তৈরি হচ্ছে 'পর্যটন-সার্কিট', জঙ্গলমহলের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত—বেলপাহাড়ি, কাঁকরাঝোড় থেকে অযোধ্যাপাহাড়, রাণিবাঁধ, ঝিলিমিলি, সুতান যেমন আছে, তেমনি আছে সারেঙ্গা।

১৯৮০ সাল। বিশ্ব পর্যটন দিবস (২৭ সেপ্টেম্বর)-এর স্লোগানে গুরুত্ব পেল 'Cultural Heritage' সংরক্ষণের কথা।

২০১৯ সাল। জঙ্গলমহলের পর্যটনে 'Cultural Heritage'-এর গুরুত্বের কথা ভেবে দেখতে হবে নতুন করে। 'লোক-প্রসার' প্রকল্পের মাধ্যমে লোকসাংস্কৃতিক শিল্পীদের ভাতা দেওয়া হচ্ছে। প্রোগ্রাম দেওয়া হচ্ছে। দেওয়া হয়েছে লোকশিল্পীর কার্ড। দেওয়া হচ্ছে পেনশন।

লোকশিল্পের এই পুনরুত্থান শুধু কিছু মানুষকে আর্থিক সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য এই প্রকল্প নয়।

আরও গভীরে যেতে হবে। এই অঞ্চলের বিভিন্ন জনজাতির জীবনবিন্যাসকে বুঝতে হবে। জানতে হবে তাদের ইতিহাস, ভূগোল, ভারত তথা বাংলার ইতিহাসে এই অঞ্চল ও মানুষের অবস্থান কোথায়—একথা না বুঝলে জঙ্গলমহল-এর আন্দোলন বা উন্নয়ন বা শান্তি কিছুই বোঝা যাবে না। কয়েকটি সরকারি প্রকল্পের খতিয়ান ছাপিয়ে বোঝানো যাবে না—জঙ্গলমহল কেন হাসছে।

বাঙালির জনতত্ত্ব ও আদিবাসী সমাজ

বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণের প্রসঙ্গে বাংলার আদিবাসী সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা নতুন করে আলোচিত হওয়া দরকার। এই প্রসঙ্গেই উঠে আসে বাঙালির জনতত্ত্ব ও বাংলার আদিবাসী সমাজের কথা।

বাঙালির জনতত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় প্রাচীন ও বর্তমান বাস্তব সভ্যতা ও মানসিক সংস্কৃতির বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

প্রথমেই বলতে হয়, 'জন' অর্থে 'People'-কে বোঝায়।

বাস্তব সভ্যতা ও মানসিক সংস্কৃতিতে বিভিন্ন 'জন' বা জনগোষ্ঠীর 'সংমিশ্রণের ইতিহাস' লুকিয়ে থাকে। এই দুই 'বস্তু' একটি 'রূপ' গ্রহণ করে সেই জনের রীতি-অনুষ্ঠান, আদর্শ-বিশ্বাস, উপায়-উপকরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। যেমন প্রকাশিত হয় তাদের ভাষার মধ্যে দিয়ে।

এক জনগোষ্ঠী আরেক জনগোষ্ঠী দ্বারা প্রভাবিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। দেখা যায়, যে জনগোষ্ঠী বেশি শক্তিশালী সেই জনগোষ্ঠীই অপরকে প্রভাবিত করে বেশি, নিজে কম প্রভাবিত হয়। কিন্তু কম-বেশি প্রভাবিত হয় সকলেই। ফলস্বরূপ, সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে কমবেশি দেওয়া-নেওয়া চলতে থাকে। এইভাবে গড়ে ওঠে একটা 'সমন্বয়'-এর ধারা। এই সমন্বয়-ধারা একসময় গতিও পায়। বাংলায় প্রাচীন ও বর্তমান কালেও যে সমন্বিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির চেহারা দেখা যায় সেটা বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বাস্তব সভ্যতা ও মানসিক সংস্কৃতির কিছু পরিচয় সহজভাবে উঠে আসে।

জনতত্ত্ব নির্ণয়ে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। একটি হল ভাষা, অপরটি নৃতত্ত্ব।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা আজ আরো বিশেষভাবে দেখা দিচ্ছে। সংস্কৃতি বলতে সঠিকভাবে যা বোঝায় সেই সম্পর্কে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করা প্রয়োজন। ঠিক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ 'ঐতিহ্য' শব্দটির সঠিক বা যথার্থ অর্থ মনের মধ্যে উপলব্ধি করা।

বর্তমানে 'সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য'(Cultural Heritage) সর্বক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ।

'সংস্কৃতি' মানে ধর্ম ও মূর্তিতত্ত্ব এবং আচার-অনুষ্ঠানের বিশ্লেষণই নয়। বাঙালির জনতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই বিষয়ে কিছু কিছু কাজ যদিও হয়েছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের কাজ, লোকাচার ও লোকধর্মের কাজ সমাজের উঁচু ও নিচু দুই স্তরেই একটা সময় পর্যন্ত ততটা হয়ে ওঠেনি। এমনকি পুরাণ-অনুমোদিত ধর্মের ক্ষেত্রেও ততটা হয়নি। বর্তমানে এই সব কাজ যথাযথভাবে করা হলে জনতত্ত্ব সম্পর্কে অনেক দিকই আরও বেশি করে উন্মোচিত হতে পারে।

বাঙালির জনতত্ত্ব ও বাংলা ভাষা

বাঙালির জনতত্ত্ব নির্ণয়ে বাংলা ভাষার বিশ্লেষণও গুরুত্বপূর্ণ। দেখা যায়—কোনও জনগোষ্ঠীর ভাষা বিশ্লেষণ করলে সেই ভাষা-ব্যবহারকারীর জীবনচর্যার মূল শব্দগুলো, পদরচনারীতি, পদভঙ্গি, মানুষ বা স্থান নাম অন্য কোনও ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে বা উদ্ভূত হয়েছে। তাহলে ধরে নিতে হবে যেকোনোভাবে ওই দুই ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়েছে।

বাংলাদেশ ও বাংলার সংলগ্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলির ভাষার বিশ্লেষণের কাজে আচার্য গ্রিয়ারসন থেকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত কয়েকজন ভাষাবিজ্ঞানী পণ্ডিত 'বাংলা ভাষার জন্ম ও জীবনকথা' নির্ণয়ে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। জ্যাঁ পুশিলুস্কি, জুলব্লখ ও সিলভা লেভির গবেষণার পথকে বিস্তারিত করেছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচি। এই গবেষণার ফলশ্রুতিতে বাঙালির জনতত্ত্ব নির্ণয়ের কাজ সহজ করে তোলা সম্ভব হয়।

এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, নৃতত্ত্ববিদ্‌দের মতে, ভারতীয় জনতত্ত্বের ইতিহাসে প্রথম স্তরে নেগ্রিটো জনের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। হাটন, লাপিক, বিরজাশঙ্কর গুহ প্রমুখ নৃতাত্ত্বিকের গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে যে আসামের আঙ্গামী নাগা, দক্ষিণ ভারতের পেরাম্বকুলম এবং আন্নামালাই পাহাড়ের কাদার ও পুলায়ানদের মধ্যে নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু রক্তপ্রবাহ স্পষ্ট।

বিহারের রাজমহল পাহাড়ের আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও নেগ্রিটোর সাদৃশ্যবিশিষ্ট জন (people) দেখা গেছে। কেউ কেউ মনে করেন, অবিভক্ত বাংলার পশ্চিমপ্রান্তে রাজমহল পাহাড়ের বাগদিদের মধ্যে, সুন্দরবনের মৎসশিকারী নিম্নবর্ণের লোকেদের মধ্যে ও ঘন কালো বর্ণের প্রায় উর্নাবহ কেশ, পুরু উল্টানো ঠোঁট, খর্বকায়, অতি চ্যাপ্টা নাকের লোক দেখা যায়। একে 'নিগ্রোবটু রক্তের ফল' বলে মনে হয়। যদিও এ কথা মনে রাখতে হবে যে, কোনো কোনো পণ্ডিত ভারতে নিগ্রোবটুদের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। যেমন জার্মান পণ্ডিত ফন্ আইকস্টেডট। তাঁর মতে, এই দেশে নিগ্রোবটুদের মতো দেহলক্ষণ বিশিষ্ট কোনো একটি নরগোষ্ঠীর অস্তিত্ব আদিম স্তরে থাকলেও একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না যে, তারা নিগ্রোবটু নরগোষ্ঠীরই লোক। অনেকে আবার মনে করেন ভারত ও বাংলার নানা স্থানে একসময়ে নিগ্রোবটুদের অস্তিত্ব ছিল।

রাজমহল পাহাড়

আদি-অস্ট্রেলীয় (Proto-Astroloid)

বাংলার আদিম অধিবাসী ও নিম্নবর্ণের বাঙালিদের মধ্যে আদি-অস্ট্রেলীয় জনদের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায়। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের আদিম অধিবাসী, সিংহলের ভেড্ডা ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের দেহ বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন স্তরের সাদৃশ্য দেখেই এদের একই 'জন' বলে ধরা হয় এবং আদি-অষ্ট্রেলীয় নামকরণ করা হয়েছে।

মধ্য ভারত থেকে অষ্ট্রেলিয়া—বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তাদের বসবাস। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের আদিম আধিবাসীরা 'খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘমুণ্ড, প্রশস্তনাসা, তাম্রকেশ'। এদের আদি-অস্ট্রেলীয়দের বংশধর বলে অভিহিত করা হয়েছে।

পশ্চিম ও উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় প্রদেশের হিন্দু সমাজবিন্যাসের প্রান্তবাসী মানুষ, মধ্য-ভারতের কোল, ভীল, করোয়া, খারওয়ার, মুণ্ডা, ভূমিজ, মালপাহাড়ি প্রভৃতি জনগোষ্ঠী দক্ষিণ ভারতের আদি-অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীভুক্ত।

বেদ ও বিষ্ণুপুরাণে, ভাগবতপুরাণে উল্লিখিত নিষাদরাও এদেরই বংশধর। পুরাণের ভীল-কোল্লোরাও তাই। রাঢ় বাংলার সাঁওতাল, ভূমিজ, মুণ্ডা, বাঁশফোর, মাল পাহাড়িরাও আদি-অস্ট্রেলীয় বলেই অনুমিত হয়।

এই 'আদি-অস্ট্রেলীয়'-দের সঙ্গে 'নিগ্রোবটু'-দের কোথাও কোথাও রক্তমিশ্রণ ঘটেছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। তাঁদের মতে এর ফলেই বিস্তৃত অঞ্চলের 'আদি-অস্ট্রেলীয়'-দের দেহবৈশিষ্ট্যে পার্থক্য দেখা যায়।

ফন আইকস্টেডট মধ্য ও পূর্ব ভারতের এবং সিংহলের আদি-অষ্ট্রেলীয়দের নামকরণ করেছেন যথাক্রমে 'কোলিড' ও 'ভেড্ডিড''।

'কোলিড' অর্থাৎ কোলসম—এই নামকরণ 'ভারতীয় ঐতিহ্যের সমার্থক' বলে মনে করা হয়। ভারতের 'জনবহুল' সমতল স্থানগুলোয় 'দীর্ঘমুণ্ডজনের' বংশধরদের দেখা যায়। দক্ষিণ ভারত ও উত্তর ভারতের নিম্নতম শ্রেণির প্রায় সকলেই 'দীর্ঘমুণ্ডজনের' বংশধর। বাংলাদেশের উত্তম ও মধ্যম সংকর এবং অন্ত্যজ পর্যায়ে এই ধারা দেখা যায়।

বিরজাশংকর গুহ-র মতে, উত্তর-আফ্রিকা থেকে আরম্ভ করে ভারতের উত্তর-পশ্চিমের দেশগুলো পর্যন্ত এদের বিস্তার ঘটে। নতুন প্রস্তর যুগে এই 'জন' মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এই সব অঞ্চলে 'আদি-অষ্ট্রলীয়দের' সঙ্গে তাদের রক্ত 'মিশ্রণ' ঘটার সম্ভাবনার কথা অনেকেই বলে থাকেন।

আরও দুই 'দীর্ঘমুণ্ডজন' হল—

১. মাক্‌রান, হরপ্পা ও মহেন-জো-দড়োর নিম্নস্তরে প্রাপ্ত কঙ্কাল—সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ দেহ, মগজ বড়,...

২. মহেন-জো-দড়োর কোনো কোনো কঙ্কালের দেহ সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ নয়। দৈর্ঘ্যে ছোটো, নাসিকা তীক্ষ্ণ ও উন্নত, কপাল ধনুকের মতো। মনে করা হয় হরপ্পা ও মহেন-জো-দড়ো এদেরই সৃষ্টি। উত্তর ভারতের উচ্চ বর্ণের মধ্যে এই দীর্ঘমুণ্ড ধারা বইছে।

হরপ্পা ও মহেন-জো-দড়োতে যেসব মুণ্ড কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে সেগুলি উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আগত 'গোলমুণ্ড' জন-এর সবথেকে প্রাচীন প্রমাণ। এদের সঙ্গে পূর্ব ইউরোপের দীনারীয় এবং কিছুটা আর্মেনীয় জাতির সম্বন্ধ স্পষ্ট। রিজলি, লাপোং, লুসসান ও রমাপ্রসাদ চন্দ, এই নরগোষ্ঠীকে 'আলপাইন' নামে অভিহিত করেছেন, বিরজাশংকর গুহ এদের অ্যালপো-দীনারীয় নাম দিয়েছেন। ফন আইকস্টেডট দিয়েছেন পশ্চিম ও পূর্ব 'ব্র্যাকিড' বা গোলমুণ্ড। বাংলার উচ্চবর্ণ ও উত্তম সংকর বর্ণের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য দেখা যায়।

নীহাররঞ্জন রায়ের মতে—'বস্তুত বাংলাদেশের যে জন ও সংস্কৃতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাদের প্রায় সমগ্র মূল রূপায়ণই প্রধানত আলপাইন ও আদি আস্ট্রেলীয়, এই দুই জন-এর লোকদের কীর্তি।'

তিনি আরও বলেছেন—'পরবর্তীকালে আগত আর্যভাষাভাষী আদি-নর্ডিক নরগোষ্ঠীর রক্তপ্রবাহ ও সংস্কৃতি, তাহার উপরের স্তরে একটি ক্ষীণ প্রবাহ মাত্র, এবং এই প্রবাহ বাঙালির জীবন ও সমাজ বিন্যাসের উচ্চতর স্তরেই আবদ্ধ। ইহার ধারা বাঙালির জীবন ও সমাজের গভীর মূলে বিস্তৃত হইতে পারে নাই।'

পামীর মালভূমি, তাকলামাকাল মরুভূমি, আল্পস পর্বত, দক্ষিণ আরব ও ইউরোপের পূর্বদেশ থেকে আসা এই আলপাইন নরগোষ্ঠীর বংশধররা ভারতবর্ষের নানা অংশে ছড়িয়ে আছে। বাংলার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও উচ্চবর্ণের সকল লোকই—এই ধারার।

ফন আইকস্টেডটের মতে, এই নরগোষ্ঠী তিনটি শাখায় বিভক্ত এবং 'আর্যভাষী ইন্ডিড' নামে যে বৃহত্তর নরগোষ্ঠী আছে এই তিনটি শাখাই তার অন্তর্ভুক্ত। এই তিনটি শাখা হল—

১. পশ্চিম ব্র্যাকিড—বর্তমান মহারাষ্ট্র ও কুর্গের আধিবাসীরা এদের বংশধর।

২. দীর্ঘদেহ ব্র্যাকিড—গাঙ্গেয় উপত্যকায় এদের বংশধররা থাকে।

৩. পূর্ব ব্র্যাকিড—বাংলা ও ওড়িশায় এদের বংশধররা থাকে।

আদি-নর্ডিক (Proto Nordic)

বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি এরাই সৃষ্টি করেছে। আইকস্টেডট্ এদের নামকরণ করেছেন—ইন্ডিড। এদেরই আর্যভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করে বাংলাদেশে পুরানো সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত ও আত্মীকরণ করে নতুন রূপে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু বাঙালির রক্ত ও দেহ গঠনে এদের প্রভাব তেমন দেখা যায় না।

বাংলার ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ বর্ণের লোকেরা একটি বিশেষ ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। তারা একই গোষ্ঠীবদ্ধ (জনতত্ত্বের দিক থেকে।)

বৃহদ্ধর্মপুরাণ-এর উত্তম সংকর বর্ণের অনেক বর্ণের সঙ্গেই এই জনগোষ্ঠীর কমবেশি ঘনিষ্ঠতা দেখা যায়। বাঙালি সদ্‌গোপ ও কৈবর্তের সঙ্গে বাঙালি কায়স্থদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা দেখা যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এদের সৎ শূদ্র বলা হয়েছে।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ-এর মতে 'কায়স্থ, সদ্‌গোপ ও কৈবর্তরাই যথার্থ বঙ্গজন-প্রতিনিধি'। বাংলার সব বর্ণের সঙ্গে কায়স্থদের আত্মীয়তার সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি। কায়স্থ, সদ্‌গোপ ও কৈবর্তদের সঙ্গে সাঁওতাল, গারো, খাসিয়া বা বৃহদ্ধর্মপুরাণের অন্ত্যজ বর্ণের লোকদের কোনো রক্তসংমিশ্রণ ঘটেনি বলেই মনে করা হয়।

অন্যদিকে বলা হয়, ছোটোনাগপুর অঞ্চলের সাঁওতাল প্রভৃতিদের সঙ্গে বাংলার পোদ, বাগদি, বাওড় প্রভৃতি উপবর্ণের লোকদের প্রচুর রক্ত সংমিশ্রণ ঘটেছে।

নমঃশূদ্রদের সম্বন্ধে কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে এসেছে নরতাত্ত্বিক পরিমিতি গণনার গবেষণার ফলাফলে। নমঃশূদ্র অর্থাৎ যাদের চণ্ডাল বা চাঁড়াল বলা হয়, সমাজে একেবারে নিম্নস্তরে যাদের অবস্থান, দেহ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তারা উত্তর ভারতের বর্ণ ব্রাহ্মণদের গোত্রভুক্ত। বৃহদ্ধর্মপুরাণ নামক উপপুরাণ আনুমানিক খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে তুর্কি-বিজয়ের পরে রাঢ় দেশে রচিত হয়। ব্রাহ্মণ্য বাদ দিয়ে সেই সময়ের বাংলাদেশের জনসাধারণ ৩৬টি জাতে বিভক্ত ছিল বলে দেখানো হচ্ছে। ৪১টির নাম পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া কয়েকটি অবাঙালি ও বৈদেশিক ম্লেচ্ছ কোম (Tribe)-র নাম আছে—দেবল বা শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ, গণক, গ্রহবিপ্র, বাদক, পুলিন, পুককল্প, খশ, যবন, শুন্দ, কম্বোজ, শবর, খর ইত্যাদি।

৩৬ জাতের কথাই নানা সময়ে বলা হয়। বৃহদ্ধর্ম পুরাণের সমসাময়িক আর একটি পুরাণ বাংলাদেশে সম্ভবত রচিত হয় যাতে এই ৩৬ জাতের তালিকা আছে সেটি হল 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ'।

ভাষাতত্ত্ব

ভারতবর্ষ ও পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ও দ্বীপপুঞ্জগুলির অনেক অঞ্চলের মানুষেরাই যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষাগুলি অস্ট্রিক ভাষাপরিবারভুক্ত।

আনাম, মালয়, তালৈঙ, খাসিয়া, কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, নিকোবর মালাক্কা প্রভৃতি ভূখন্ডের অধিবাসীরা এইসব ভাষায় কথা বলেন। 'জন' হিসেবে এদের 'গোষ্ঠী' ভিন্ন কিন্তু এরা সকলেই একই ভাষা পরিবারের ভাষায় কথা বলেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, ওই সব ভূখণ্ডে আদিমতম স্তরে সর্বত্রই অস্ট্রিক ভাষার প্রচলন ছিল। এটাও প্রমাণিত হয় যে এই অস্ট্রিক ভাষা এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সুদীর্ঘ কাল ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই অস্ট্রিকভাষী মানুষেরা প্রায় সকলেই আদি-অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেমন মুণ্ডা, কোল ও সাঁওতালরা, ভূমিজ ও শবরেরা আছে, তেমনি মালয় ও আনাম অঞ্চলের অধিবাসীরা, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের লোকেরাও আছেন। এক বিস্তৃত আঞ্চল জুড়ে ছিল আদি-অষ্ট্রেলীয়দের বাসভূমি। ভাষা ছিল অষ্ট্রিক ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

দেখা গেল, নতুন 'জন' (People) আসায় রক্তমিশ্রণ ঘটেছে, কোথাও বা তাঁদের একেবারে আত্মসাৎ করে ফেলেছে কিন্তু পুরানো জনদের ভাষা তাঁরা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। মালয়ে, আনামে, নিম্ন ব্রহ্মে এঘটনা দেখা গেছে, কিন্তু পুরানো ভাষাপ্রবাহ অব্যাহত। একই ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হলেও বিভিন্ন ভাষার মধ্যে আত্মীয়তার হেরফের আছে।

যেমন তালৈঙ, মন-খমেরের সঙ্গে কোল ভাষাগোষ্ঠীর আত্মীয়তা আছে। কোল-মুণ্ডা খুব সম্পন্ন গোষ্ঠী—সাঁওতাল, মুন্ডারি, ভূমিজ, হো, কোড়ো, অসুরী, খাড়িয়া, জয়াং, শবর প্রভৃতি সকল বুলিই এই গোষ্ঠীর। মধ্য-ভারতের পূর্ব ভাগ জুড়ে এইসব বুলিভাষী লোকেদের বাস। কোনও কোনও ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে, 'আশ্চর্যের বিষয়, এঁরা সকলেই আদি-অষ্ট্রেলীয়, এই কারণেই অনুমান হয় আদি-অষ্ট্রেলীয়দের ভাষাই হয়তো ছিল যাহাকে আমরা এখন বলিতেছি অস্ট্রিক'।

উত্তর ও পূর্ব ভারতের সর্বত্রই আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহন আর্যভাষার প্রাবল্য দেখা যায়। বাংলা, বিহার, ওড়িশা, আসাম সর্বত্র এই ভাষা প্রাধান্য লাভ করেছে, এর প্রধান রূপ সংস্কৃত। প্রাকৃত জনের ভাষা প্রাকৃত। এই প্রাকৃত-সংস্কৃতের অপভ্রংশ থেকে উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলির উৎপত্তি হয়েছে। এদের অন্যতম বাংলা ভাষা।

এই বাংলা ভাষায় অনেক অস্ট্রিক ভাষার শব্দ ও পদ রচনারীতি দেখা যায়। প্রাকৃত-সংস্কৃতের মধ্যেও এই ব্যাপারটি চোখে পড়ে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, আর্যভাষী লোকদের আদিমতর স্তরে অস্ট্রিকভাষী লোকেদের বাস ছিল এবং তাদের বিস্তৃতির গভীরতা ও ব্যাপকতাও আরো বেশি ছিল। এই তথ্য প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশিষ্ট গবেষক ও পণ্ডিতদের সুদীর্ঘ গবেষণায় (পলিলুস্কি-ব্লক-লেভী-বাগচী-স্টেন-কোনো-চট্টোপাধ্যায়)। এই অস্ট্রিক ভাষার অনেক কিছুই বাংলায় বহুল প্রচলিত। বাঙালির প্রতিদিনের জীবনে ব্যবহৃত অনেক শব্দই অস্ট্রিক ভাষা থেকে নেওয়া।

আজকাল আমাদের গণনারীতি অনেক পাল্টে গিয়েছে। কিন্তু কিছুদিন আগেও আমরা এককুড়ি, দুই কুড়ি করে গুনতাম। মানব দেহে কুড়িটি আঙুল। তাই সহজে মনে রাখার জন্য আদিম মানুষেরাও কুড়ির হিসেবে গুনতেন। অস্ট্রিক ভাষাভাষী মানুষেরাও 'কুড়ির হিসেবে গুনতেন। চারকুড়ি(৮০)-তে এক পণ। সাঁওতালি ভাষায় উপণ বা পুণ থেকে পণ শব্দটি এসেছে।

বাংলায় এভাবে হাট-বাজারে বেচাকেনা চলত কুড়ি, পণ, গোণ্ডা বা গণ্ড (বাংলায় গন্ডা) — এই সবের হিসেবে। এক গোণ্ড বা গণ্ডতে হয় চার। কুড়ি গণ্ডতে (২০x৪=৮০) এক পণ। পাঁচ গণ্ডতে এক কুড়ি।

উল্লেখ্য, খ্রিস্টপূর্ব ১ম-২য় শতকে প্রাকৃত মহাযান শিলালিপির গণ্ডকমুদ্রা এই 'গণ্ডা' থেকে এসেছে। ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এই 'গণ্ডকমুদ্রা' বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল।

'গণ্ডক' শব্দের আভিধানিক অর্থ—ভাগ, একপ্রকার গণনানীতি, চার সংখ্যার এক মান ধরে গণনা রীতি, চার কুড়ি মূল্যের এক প্রকার মুদ্রা।

অস্ট্রিকভাষাভাষী লোকেরা এই পদ্ধতিতেই গণনা করতেন। আদিম ভারত ও বৃহত্তর ভারতে সামুদ্রিক বাণিজ্য -সমৃদ্ধ সভ্যতার সৃষ্টি এই গণনাপদ্ধতির আঙ্গিকে করা যায়।

এর থেকে বলা যায় যে অস্ট্রিকভাষাভাষী মানুষেরা ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

'অসুর'

কোল-মুণ্ডা গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান বুলির নাম 'অসুর'। এই বুলি একসময় গৌড়ে-পুন্ড্রে বহুল প্রচলিত ছিল। মধ্যভারতের পূর্বদিকে যারা এই বুলিতে কথা বলত তারা আদি-অস্ট্রেলীয় পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অষ্টম শতকে রচিত 'অর্থমঞ্জুশ্রী মূল কল্প' গ্রন্থে এর ভাষাগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য আছে। যেমন এই ভাষায় 'ল' ও 'র'-র বাহুল্য চোখে পড়ে। এই (অসুর) ভাষাভাষী লোকদের 'ঋগ্বেদ'-এ 'অসুর' বলা হয়েছে।

এই গ্রন্থের রচয়িতা বলছেন বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, গৌড় ও পুন্ড্রের লোকেরা অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম, দক্ষিণ

ও উত্তর বঙ্গের লোকেরা 'অসুর' ভাষাভাষী —অসুরানাং, ভবেৎ বাচা গৌড়পুণ্ড্রো-দ্রবা যদা। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, গৌড়-পুণ্ড্রের আদিমতম স্তরেও এই আদি-অস্ট্রেলীয়দের বিস্তৃতি ছিল।

আসামেও প্রাচীনকালে 'অসুর' ভাষাভাষী লোকের বিস্তৃতি সম্পর্কে অনুমান করা যায়।

কামরূপের বর্মণ রাজবংশের সকলেই 'অসুর' বলে পরিচিত হতেন। সপ্তম শতকের রাজারা তাঁদের পূর্বপুরুষদের 'অসুর' বলে জানতেন এবং মহিরাঙ্গ অসুর, দানবাসুর, হাটকাসুর, সম্বারাসুর, রত্নাসুর, নরকাসুর প্রভৃতি পূর্বপুরুষদের বংশধর বলে নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে 'অসুর' ভাষাভাষী বলেই কি 'অসুর' নামে পরিচিত হতেন।

বর্তমানে 'অসুর' Tribe স্বীকৃত তালিকায়।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মহাবীর রাঢ় দেশে—বজ্জভূমি ও সুবভভূমি (মোটামুটি দক্ষিণ রাঢ়) জৈনধর্ম প্রচারের জন্য আসেন বলে জৈনদের আচারাঙ্গসূত্র-তে উল্লেখ আছে। ভ্রমণরত মহাবীরকে রাঢ়ের অধিবাসীরা আক্রমণ করেন, এবং কুকুর লেলিয়ে দেয়—ছু ছু বলে। অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষায় কুকুরের প্রতিশব্দ—

'ছক' (খমের), 'ছ্যুক' (কোন্ টু), 'ছো' (প্রাচীন খমের), 'ছো' (আনাম, সেদাং, কাসেং), 'অছো' (তারেং), 'ছু' (সেমাং), 'ছুও', 'ছু-ও' (সাকেই)।

বাংলা চু-চু বা তুতু মূলত অস্ট্রিক প্রতিশব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে এবং কুকুরার্থক বাংলা দেশজ শব্দে পরিণত হয়েছে।

এ থেকে অনুমান করা যায়, রাঢ়ে-সুহ্মে ওই সময় অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা প্রচলিত ছিল।

বর্তমানেও এই অঞ্চলে অস্ট্রিকভাষী সাঁওতাল ও কোলরা বাস করে।

কৃষি

অস্ট্রিকভাষী আদি-অস্ট্রেলীয়রাই এদেশে কৃষির প্রচলন করেন।

'লাঙ্গল' শব্দটি অস্ট্রিক ভাষার শব্দ। অস্ট্রিক ভাষা পরিবারের, আনামীয় ভাষায় 'লাঙ্গল' শব্দের অর্থ, - 'চাষ করা' এবং 'চাষ করিবার যন্ত্র'।

প্রাচীনকাল থেকে এই 'শব্দটি' 'আর্য' ভাষায় গৃহীত। আর্যভাষীরা চাষ করতে জানতেন না। ফলে চাষের যন্ত্রের সঙ্গেও তাঁদের পরিচয় ছিল না। 'লাঙ্গল' দিয়ে ধান চাষ করা হত। ধান ছিল প্রধান খাদ্যবস্তু। অস্ট্রিকভাষী লোকেরা কৃষি সভ্যতার সূচনা করে। অস্ট্রিকভাষী লোকেরা ভারতের যেখানে বসতি স্থাপন করেছে সেখানে ধান চাষের প্রচলন করেছেন। বৃষ্টিবহুল নদনদীবহুল সমতল ভূমিতে চাষের কাজ ভালো হয়। তাই দেখা যায় আসাম, বাংলা, ওড়িশা, দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র নিকটবর্তী সমতলে ধানের চাষ হয়। উত্তর ভারতে এর প্রসার ঘটে নি।

দ্রাবিড়ভাষী লোকেরা পরবর্তীকালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে বিহার পর্যন্ত যব ও গম চাষের শুরু করে ও প্রসার ঘটায়। এ দুটি চাষ ততটা বৃষ্টিনির্ভর না হওয়ায় উত্তর ভারতে এর বিস্তৃতি ঘটে সহজে।

জনবিস্তৃতি ও জলবায়ু—এই দুটি কারণ খাদ্যাভ্যাসকে কিভাবে গড়ে দেয়—এক্ষেত্রে তা স্পষ্ট।

ধান ছাড়াও অস্ট্রিকভাষী লোকেরা কলা, বেগুন, ডুমুর, সুপারি, হলুদ, লাউ, লেবু, পান, কামরাঙা, জাম্বুরা, ডালিম

'লাঙল' দিয়ে চাষ করার পদ্ধতি অনার্যদের থেকে শিখেছে আর্যরা

ইত্যাদির চাষ করতেন, কারণ প্রত্যেকটি কৃষিজ দ্রব্যের নামই অষ্ট্রিক ভাষা থেকে বাংলা-য় গৃহীত।

প্রত্যেকটিই আজও বাংলার মানুষের প্রিয় খাদ্য।

কিন্তু অস্ট্রিকভাষী লোকেরা আর্যভাষীদের থেকে গোপালন শিখেছে বলে অনুমিত হয়।

বস্ত্র

কার্পাস শব্দটি অস্ট্রিক। এই কর্পাস বা কার্পাস তুলা থেকে কাপড় তৈরির পদ্ধতির আবিষ্কার অস্ট্রিকভাষীদের অন্যতম অবদান। কাপড় যাঁরা তৈরি করেন তাঁদের তাঁতী বা তন্তুবায় বলে।

কার্পাস তুলো

প্রাচীন ও বর্তমান বাঙালি সমাজবিন্যাসে তাঁতী নিম্নতর স্তরে অবস্থান করে। এঁরা কি অস্ট্রিকভাষী! পট, কর্পট (পাটবস্ত্র)—অস্ট্রিক ভাষা থেকে গৃহীত। মেড়া বা ভেড়া-ও অস্ট্রিক শব্দ। ভেড়ার লোম দিয়ে 'কম্বল' তৈরি হত। 'কম্বল'ও অস্ট্রিক শব্দ। তবে অস্ট্রিকভাষী আদি অস্ট্রেলীয়দের সকলেই কৃষিজীবি ছিলেন না। এদের কয়েকটি শাখা ছিল অরণ্যচারী। নিষাদ ও ভীল, কোল শ্রেণির শবর, মুণ্ডা, গদর, হো, সাঁওতালদের অন্যতম প্রধান জীবিকা ছিল পশুশিকার। পশুশিকারের ব্যবহৃত অস্ত্র ছিল 'ধনুর্বাণ'। বাণ, ধনু বা ধনুক, পিনাক—এইসব শব্দও অস্ট্রিক।

হাতি, মেড়া (ভেড়া), কাক, কর্কট (কাঁকড়া) এবং কপোত শিকার করতেন তাঁরা। গজ, মাতঙ্গ, গণ্ডার, কপোত এইসব শব্দও অস্ট্রিক ভাষা থেকে গৃহীত। 'ধনুর্বাণ' ছাড়াও দা, করাত এইসব অস্ত্রও তাঁরা ব্যবহার করতেন। এই শব্দগুলিও অস্ট্রিক ভাষা থেকে এসেছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে তাঁদের জীবিকা-সংশ্লিষ্ট শব্দগুলি অস্ট্রিক ভাষা থেকে গৃহীত যেগুলি পরবর্তীকালে বাঙালির জীবনেও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে।

এই ঋণ শুধু ভাষার ঋণ নয়, শব্দভাণ্ডারের ঋণ নয়, জীবন-জীবিকা ও বৃহৎ অর্থে জীবন সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের ঋণ।

বাংলার আদি অধিবাসীদের কাছে আমাদের ঋণ যেমন প্রকট হচ্ছে এই বিশ্লেষণে, তেমনি এই তথ্যও উঠে আসছে যে, সভ্যতার উৎক্রমণ তাঁরা কিভাবে ঘটিয়েছিলেন। শুধুমাত্র কৃষিকাজ বা পশুশিকারেই তাঁরা সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রাচীন বাংলা যে ব্যাবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে সমৃদ্ধিলাভ করেছিল সেও সম্ভব হয়েছিল তাঁদের সাহায্যেই। তীর থেকে তারা ভেসে পড়ত সাগরে। উত্তাল সাগরে। দ্বীপ থেকে দ্বীপে, উপদ্বীপে। কখনও বা ডোঙায়, কখনও বা ভাসমান গুঁড়ি কাঠের ভেলায় বা বড়ো নৌকায় তাঁদের সমুদ্রযাত্রা চলত। জনতত্ত্ববিদদের এই আবিষ্কারের সঙ্গে আজকের বাস্তব সভ্যতারও যেন এক সমাপতন ঘটে গেছে। আজও নদী খালবিলের নিম্ন, পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে গেড়িকাঠের ডিঙা, ছোটো নৌকা জলযান হিসেবে খুব প্রচলিত। 'ডিঙা', 'গুড়ি'—এইসব শব্দও অস্ট্রিক অর্থাৎ সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে অস্ট্রিক ভাষাভাষী মানুষেরা (মেলানেশীয়, পলিনেশীয়) লোকরা ডোঙা, ডিঙ্গি, ভেলা, ছোটো বড়ো নৌকায় চলে নদী-সমুদ্রের পথে সহজেই যাতায়াতে অভ্যস্ত ছিল এবং এই পথেই সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়েছিল।

বাংলা তথা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রকৃত পথ অস্ট্রিকভাষীরা এইভাবেই তৈরি করেছিলেন। তাঁদের এই অবদান স্বীকৃতি পেয়েছে লেভি (সিলতা লেভি)-র কথায়—

আদি অধিবাসীর বাণিজ্যেও যেত নৌকায় করে

We must know whether the legends, the religion and the philosophical thoughts at India do not owe anything to this past. India had been too exclusively examined from the Indo-European stand-point. It ought to be remembered that India is a great maritime country... the movement which carried the Indian colonization (in historical times) towards the Far East was far from inaugurating a new route. Adventures, traffickers and missionaries profited by the technical progress at navigation and followed under better conditions of comfort and efficiency's the way traced from time immemorial, by the mariners at another race, when Aryan or Aryanism India despised as savages.

অস্ট্রিকভাষী আদি-অস্ট্রেলীয়দের কেউ কেউ গ্রামকেন্দ্রিক সভ্য সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। কৃষিজীবী ছিলেন তাঁরা। ফলে খাদ্যের অভাব ছিল না। জনসমৃদ্ধিও ছিল। তাঁরা নিজস্ব সমাজবন্ধনও গড়ে তুলেছিলেন। এখনও এইসব গোষ্ঠীর মধ্যে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে পঞ্চায়েত প্রথা/ব্যবস্থা দেখা যায় (মুণ্ডা)।

শরৎকুমার রায়-এর উক্তি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—

পঞ্চায়েত প্রথা সম্ভবত ভারতে প্রথম ইহাদেরই প্রবর্তিত। পঞ্চায়েতকে ইহারা সত্য সত্যই ধর্মাধিকরণজ্ঞানে মান্য করে। এখনও আদালতে সাক্ষ্য দেবার পূর্বে মুণ্ডা সাক্ষী তাহার জাতি প্রথা অনুসারে পঞ্চের নাম লইয়া এই বলিয়া শপথ করে, 'সিরমারে সিংবোঙা ও তেরে পঞ্চ', অর্থাৎ 'আকাশ সূর্যদেবতা পৃথিবীতে পঞ্চায়ত।'

তিনি আরও বলেছেন যে এদের মধ্যে কোনো কোনো জাতির এখনও কিংবদন্তি আছে যে একসময় ভারতে এদের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ 'গণতন্ত্র' রাজ্য ছিল। মুণ্ডা, ওরাঁও-দের গ্রামে ও গ্রামসঙ্ঘে রাজশক্তির চিহ্নস্বরূপ 'বিভিন্ন' চিহ্ন-আঁকা পতাকা যত্নসহকারে সসম্মানে রাখা থাকে।

অস্ট্রিকভাষী মানুষেরা প্রাচীনকালের মতো আজও সরল ও নিরীহ। তাই এদের মধ্যে দৃঢ়তা ও সংহতির অভাব দেখা যায়। অপরিসীম সহনশীলতায় বারবার তাঁরা অন্য শক্তিশালী জাতির কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছেন, আত্মসমর্পণ করেছেন তবু নিজেদের জনগত বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি আজও বজায় রাখতে পেরেছেন। তাঁদের মধ্যে এমন এক প্রাণশক্তি আছে যার ফলে এত কিছু সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পেরেছেন।

ড. নীহাররঞ্জন রায় লিখিত বাঙালির ইতিহাস-এ বলা হচ্ছে—'বর্তমান শবর বা সাঁওতাল, ভূমিজ বা মুণ্ডা প্রভৃতির জীবনাচরণ একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলে মনে হয়, ইহারা কিছুটা কল্পনাপ্রবণ, দায়িত্বহীন, অলস, ভাবুক এবং কতকটা কামপরায়ণও বটে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এত বিবর্তন-পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য তাহাতে বিশেষ বদলাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।' (বাঙালির ইতিহাস পৃ: ৫৪)

এই অস্ট্রিকভাষী আদি-অস্ট্রেলীয়দের 'জীবন বিশ্বাস' কেমন ছিল, আজও কেমন আছে তার একটা তুলনা করা যেতেই পারে। এই জীবন বিশ্বাস বাঙালিদের মধ্যেও কতটা প্রচ্ছন্ন বা প্রকট হয়ে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে সেই আলোচনার ভিত্তিতেও আমরা দেখতে পাব এদের মধ্যে নৈকট্য কতটা।

তাঁরা একাধিক জীবনে বিশ্বাস করতেন। অর্থাৎ মৃত্যুর পরই সব শেষ নয়—তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁদের ধারণা ছিল—কারোও মৃত্যু হলে তাঁর আত্মা কোনও পাহাড়, গাছ কোনও জন্তু, পাখি বা অন্য কোনও জীবকে, আশ্রয় করে, বেঁচে থাকে। এই বিশ্বাস থেকেই হয়তো বা হিন্দু পুনর্জন্মবাদ বা পরলোকবাদের উদ্ভব।

কাপড় বা গাছের ছালে মৃতদেহ জড়িয়ে গাছের ওপর বা ডালে ঝুলিয়ে দেওয়ার রীতিও ছিল। কখনও বা মাটির নিচে কবর দিয়ে তার ওপর বড়ো বড়ো পাথর সোজা করে পুঁতে দেওয়া হতো।

স্ত্রীলোককে কবরের উপর লম্বালম্বিভাবে শুইয়ে দেওয়া হতো (এখনও অনেকে দেয়)। মৃত ব্যক্তিকে খাবার দেওয়া হতো, এখনও দেওয়া হয়। হিন্দু সমাজ 'শ্রাদ্ধে' এই বিশ্বাস ও রীতিকেই প্রকাশ করে 'পিণ্ডদান' এর মাধ্যমে।

এদের মধ্যে 'লিঙ্গ পূজা' প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। লিঙ্গ শব্দটি অস্ট্রিক ভাষার। খাসিয়াদের সমাধির ওপর লম্বাকারে দাঁড় করানো পাথর ও শোয়ানো পাথর লিঙ্গ ও যোনির প্রতীক বলে কেউ কেউ অনুমান করেন।

এ প্রসঙ্গে পলিলুস্কির বক্তব্য দেখা যেতে পারে—

The phalic cults, of which we know the important in the ancient of indo-chiana, are generally, considered to have been derived from Indian Saivaism. It is more probable that the Aryans, have borrowed from the aborigins of idea the cult of linga as well as the name of the idol. These popular practices despised by the Brahamanas were ill-known in old times. If we try to know them better, we will probably be able to see clearly why so many non-aryan words of the family at linga have been introduced into the language of the conquarers.

এই প্রসঙ্গে দ্রাবিড়ীয় প্রভাবের উল্লেখ করা যেতে পারে। দেখা যাচ্ছে, 'পূজন' বা 'পূজা' এবং 'পুষ্প' দুটি শব্দই দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর। হরপ্পা-মহেঞ্জোদর-র ধ্বংসাবশেষ

সামাজিক বন্ধনের প্রতীক এই আদিবাসী নৃত্যভঙ্গী

থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সিন্ধুতীরের প্রাগৈতিহাসিক যুগে লিঙ্গ পূজা ও মাতৃকাপূজার প্রচলন ছিল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য—'অবশ্য এই দুটি পূজা সর্পপূজার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অনেক আদিম অধিবাসীদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল, তবু ভারতবর্ষে ইহার যে রূপ আমরা দেখি তাহা যে আর্যভাষীরা ভারতীয় আর্যপূর্ব ও অনার্য লোকদের সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমশ গড়িয়া তুলিয়াছিল, এই অনুমানই যুক্তি সংগত বলিয়া মনে হয়। লিঙ্গপূজাই ক্রমশ শিবের সঙ্গে জড়িত হইয়া শিবলিঙ্গ ও শক্তি-যোনি পূজায় রূপান্তরিত হয় এবং মাতৃকাপূজা ও সর্পপূজা ক্রমশ যথাক্রমে শক্তি পূজায় ও মনসা পূজায়। বৈদিক বিষ্ণুর যে রূপ আমরা দেখি তাহাতে যেন দ্রাবিড়ভাষীদের আকাশ-দেবতার স্পর্শ লাগিয়া আছে। শিব সম্বন্ধে এ কথা আরও বেশি প্রযোজ্য। শ্মশান-প্রান্তর-পর্বতের-রক্তদেবতা একান্তই দ্রাবিড়ভাষীদের শিবন্ যাহার অর্থ লাল বা রক্ত এবং শেম্ব যাহার অর্থ তাম্র, ইনিই ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া আর্যদেবতা রূদ্রের সঙ্গে এক হইয়া যান। পরে শিবন্ = শিব, শেম্বু = শম্ভু, রুদ্র-শিব এবং মহাদেবে রূপান্তর লাভ করেন। এই ধরনের সমন্বিত রূপ পৌরাণিক অনেক দেবদেবীর মধ্যে দেখা যায়, এ কথা ক্রমশ পণ্ডিতদের মধ্যে স্বীকৃতি লাভ করিতেছে। এই সমন্বিত রূপই আর্যভাষীদের মহৎ কীর্তি এবং ভারতীয় ঐতিহ্যে তাহাদের সুমহান দান।'

অস্ট্রিকভাষীরা গাছ, পাথর, পাহাড়, ফুল, ফলমূল, বিশেষ স্থান, বিশেষ পশু, পাখির উপর 'দেবত্ব' আরোপ করে পূজা করতেন। এখনও বাংলার সাঁওতাল, মুণ্ডা, শবর প্রায় প্রতিটি কোমের লোকেরাই তাই করেন। বাংলার গ্রামে শেওড়া, বট, তুলসীর সঙ্গে সঙ্গে পাথর ও পাহাড় পুজোও হয়। নবান্ন উৎসব বা বিভিন্ন ব্রত অনুষ্ঠান বাংলার ঘরে ঘরে মেয়েরা করেন, এমনকি আমাদের প্রতিদিনের জীবনে যেসব আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয় সেসব আদিম অস্ট্রিক ভাষাভাষী মানুষদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানেরই সঙ্গে যুক্ত। আজও এসব লোকাচার ও উপকরণ গ্রামীণ কৃষি সভ্যতার উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। তাদের প্রতিদিনের জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে ধান, ধানের গুচ্ছ, দূর্বা, কলা, হলুদ, সুপারি, নারিকেল, পান, সিন্দুর, কলাগাছ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বাঙালির জীবন সংস্কৃতিতে এগুলির ব্যবহার অপরিহার্য।

অর্থাৎ আজ জঙ্গলমহল-এর বিভিন্ন আদিবাসী কোমের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগতভাবে এমন অনেক কিছুই আছে যা বর্তমান বাঙালি সমাজে (হিন্দু)-এর মতো ঐতিহ্য হয়ে গেছে। তাঁদের জীবনধারা আমাদের জীবনধারাকে সমৃদ্ধ করেছে।

এই অস্ট্রিকভাষী লোকেরা আজও শ্রাদ্ধ বা যে কোনও শুভ কাজে পিতৃপুরুষের পুজো করেন, তাদের থেকে বাঙালি সমাজও এই রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠানকে আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে আসছেন।

''ভারতে শক্তিপূজার প্রবর্তন সম্ভবত ইহারাই প্রথম করে। ওঁরাও প্রভৃতি জাতির চাণ্ডী নামক দেবতার সহিত হিন্দু চণ্ডীদেবীর সাদৃশ্য দেখা যায়। অর্ধরাত্রে উলঙ্গ হইয়া ওঁরাও অবিবাহিত যুবক পূজারী 'চান্ডী স্থানে' গিয়া চাণ্ডীর পূজা করে।'' —(শরৎকুমার রায়)

এইভাবে জনপ্রবাহ ও বাস্তব সভ্যতার নানা বিশ্লেষণের ফলে দেখা যাচ্ছে যে বাংলার আদি-অস্ট্রালয়েড (আদিবাসী)-দের কাছে আমাদের অনেক ঋণ। আমাদের প্রতিদিনের জীবন-সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠানের মূলধারা তাঁদের থেকেই নানা উপাদানে পুষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ আমরা 'আত্মসাৎ' করেছি ওদের অনেক কিছু।

গ্রন্থঋণ:

–বাঙালির ইতিহাস, ড. নীহাররঞ্জন রায়

বাংলার মসলিন বাংলাকে আবার বিশ্বসেরার শিরোপা এনে দিচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটেই প্রকাশিত হল একটি তথ্যসমৃদ্ধ নিবন্ধ।

বিশ্ববাংলা বিপণিতে মসলিনের রকমফের

বাংলার মসলিন দেশের গর্ব

চূড়ামণি হাটি

পশ্চিমবঙ্গ ॥ ২০৮

অলঙ্করণে বাংলার দক্ষতা শ্রেষ্ঠ। সূক্ষ্ম কাজে কঠিন ধৈর্য দেখিয়েছে; শৈল্পিক ভাবনাতেও; প্রযুক্তি বিদ্যাতেও। অষ্টাদশ শতকেও বিশ্ববাজারে দাপট ছিল বাংলার বস্ত্র শিল্পের। তখন বাংলার প্রতি ঘরে তাঁত। মসলিনের ইতিহাস আরও প্রাচীন। বাংলায় চন্দ্রকেতুগড়ে প্রত্নখননে প্রাপ্ত যক্ষিণী ফলকগুলির খোদাই কাজে অলঙ্কারের সুনিপুণ ব্যবহারের পাশাপাশি মসলিন শাড়ি পরার ইঙ্গিত স্পষ্ট। মহেঞ্জোদারোর প্রত্নখননেও গোলাপি রঙের কার্পাস বস্ত্র মিলেছে। দু-হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোমবাসীরা কার্বোসিনা নামক বস্ত্র ব্যবহার করত, যা আসলে কার্পাস। রোমে বাংলার মসলিনের কদর ছিল। মমির গায়ে পাওয়া গেছে নীল সুতি বস্ত্র। পর্তুগিজদের হাত ধরে বিদেশে গেছে বাংলার মসলিন। ফিলিপাইন-সহ পূর্ব এশিয়ায় ছিল বৃহৎ বাজার। ইরাকে মসুল বন্দরেও ছিল মসলিনের বৃহৎ বাজার। বাংলা থেকে মসলিন রপ্তানি হত ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে জঙ্গলবেড়ি বাণিজ্যকেন্দ্রকে কেন্দ্র করে। একই সঙ্গে বাংলার মসলিন রপ্তানির জন্য ব্যবহৃত হত অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলায় বঙ্গোপসাগরের কূলে মসলিপত্তম বন্দরটি। ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজরা, ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে ফরাসিরা এবং ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা এইবন্দর দখল করে। বলা বাহুল্য এই মসলিপত্তম বা মুসলিয়াতে উৎকৃষ্ট মানের কার্পাস পাওয়া যেত। শেষ পর্যন্ত কাঁচা মাল নয়, শিল্পবস্তু গুরুত্ব হারাল।

মোগল আমলে মসলিনের যে বিকাশ ঘটেছিল; সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট ছিল পর্তুগিজ ও ইংরেজরা। ইংরেজরা শাহজাহানের সময় শুল্ক-মুক্ত স্বাধীন বাণিজ্যের ফরমান আদায় করে কাজটি সহজ করল। ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে মসলিন সম্পর্কে ইংল্যান্ডের রানী মেরীর কৌতুহল প্রকাশের সাথে সাথে ইংল্যান্ড জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে বাংলার মসলিন। ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার তেজগাঁয়ে মসলিনের আকর্ষণে ইংরেজরা কুঠি স্থাপন করে। কয়েক বছর পরই ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে নিজেদের দেশের শিল্পের গতিকে সচল রাখতে পার্লামেন্টে আইন পাশ করে বাংলার কয়েক প্রকার কাপড় নিষিদ্ধ হল। যার প্রভাব পড়ল বাংলার তাঁতিদের জীবনে। ১৭৭০-৭৮-এর খরা—এর সঙ্গে আর এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি করল। মসলিনের উপর খাঁড়া পড়ল ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি 'প্রাইভেট ট্রেডারস্' দের মসলিন বস্ত্র উৎপাদন ও ব্যবসার উপর নিয়ন্ত্রণ এনে দেয়। বন্ধ হয়ে যায় অগ্রিম দাদন প্রদান প্রক্রিয়াও। এই অগ্রিম দাদন থেকে উপরি নেওয়ার লালসা ছিল কোম্পানি নিয়োজিত গোমস্তাদের।

কথিত আছে, ব্রিটিশ কোম্পানির ও গোমস্তাদের শোষণ এমন মাত্রা নিয়েছিল যে, কেউ কেউ আঙুল কাটতে বাধ্য হয়েছিল। বাংলার বাজারে ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে এসে গেছে ম্যানচেস্টার, ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলের শাড়ি। একদিকে উন্নতমানের কার্পাস তুলো ও নীল লুট। অন্যদিকে নিম্নমানের রেশমকে উন্নত মান দিতে এদেশে ইংরেজ কোম্পানির হয়ে ওয়েস-সহ চার ইতালির আগমন। ভেতরে ভেতরে শোষণের মনোভাব। ১৭৭৩ সালে জঙ্গিপুরে রেশম শিল্পকে নিয়ে যে ভাবনা শুরু হয়েছিল; তা শেষ হয় ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে। অনেক পরে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠিত

হয় 'বঙ্গলক্ষ্মী কট্‌ন মিল্‌স', ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গেশ্বরী কটন মিল্‌স', ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কটন মিল্‌স', ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে 'বাসন্তী কট্‌ন মিল্‌স'।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে চম্পারণ সত্যাগ্রহের পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ সরকারের শিল্পনীতির বিরুদ্ধে মত ঘোষণা করে গান্ধীজি বোঝাতে চাইলেন, ভারত তার নিজস্ব সম্পদ ও হস্তচালিত প্রযুক্তির হাত ধরে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে চায়। এটা আসলে উৎপাদন ব্যবস্থাকে চাঙ্গা রেখে প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর আক্রমণও বটে। তৈরি হয়েছিল বারাণসীর সাওয়াপুরীতে গান্ধী আশ্রম।

বস্ত্রশিল্পের সূচনা পশুর চামড়া আর গাছের ছাল দিয়ে। অতসী প্রকৃতির গুল্ম জাতীয় গাছের ছাল থেকে সুতো সংগ্রহ করে বস্ত্র তৈরি হয়েছে। পাট-শণও কাজে লেগেছে। মোষ-ভেড়ার লোম দিয়ে তৈরি পশম অর্থে গরম কাপড়। কার্পাস তুলো দিয়ে সুতি-বস্ত্র। ফুটি কার্পাসে বীজ ও তুলো কাছাকাছি থাকে; আর বয়রাতী কার্পাসের ক্ষেত্রে দূরে। বলা বাহুল্য ফুটি কার্পাস সুতোয় প্রস্তুত হয় আটশো বা তারও বেশি কাউন্টের সূক্ষ্ম বস্ত্র মসলিন। তুঁত পাতা খেয়ে বড় হওয়া বাবু গুটি থেকে বার করা সুতোয় তৈরি হয় রেশম বস্ত্র। চাসাররা তুঁত রেশমের বাগান প্রস্তুত ও মথ প্রতিপালন করে; আর নাকদ-কাটানিরা গুটি থেকে সুতো তোলে। মালদায় যারা রেশম কীট পালন করে তাদের বলে পুণ্ড। শাল-অর্জুন গাছেও গুটি পোকা আশ্রয় নেয়। তৈরি হয় তসর। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এড়ি। সোম গাছের পাতা খাওয়া কৃত্রিম-রেশম মুগা। রেশমের নিকৃষ্ট অংশ নিয়ে চশম। মিহি লম্বা সুতোয় প্রস্তুত হয় গরদ। আর টুকরো মোটা সুতোয় মটকা। মনবেরি গাছে আশ্রয় নেওয়া পালু অর্থাৎ রেশমকীটের গুটি থেকে সুতো বের করে চীন দেশের চাংটাং-তেই হয় রেশম বস্ত্রের সূচনা। এই শিল্প ২৬৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চৈনিক সম্রাট হুয়াংতির আমলে অর্থনীতিতে গুরুত্ব পায়। গোপনীয়তা রক্ষা সত্ত্বেও চীন থেকে এ শিল্প ছড়িয়ে পড়ে কোরিয়া ও জাপানে। আর তুর্কি-আফগান যুগে বাংলা থেকে চীনে রপ্তানি হত মসলিন।

বাংলায় রেশম চাষের উল্লেখ আছে ৩২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে লেখা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। সওদাগর ও পর্যটকদের হাত ধরে ১২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চীনের পাশাপাশি ভারতেও রেশম বস্ত্র ইউরোপীয় দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ষষ্ঠ শতকে রোম সম্রাট জাস্টিনিয়ন সন্ন্যাসীদের দিয়ে পাঞ্জাবের সিরহিন্দ থেকে রেশমকীট আনিয়েছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে বাণভট্ট নীলাংশুক-অরুণাংশুক নানা নামের রেশম বস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি তাম্রলিপিতে উল্লেখ আছে সিল্কের কাপড় জলসারসের আঙুলের ছাপের প্রসঙ্গটি। অজন্তা-ইলোরার গুহাচিত্রেও বস্ত্রে নকশার ইঙ্গিত মিলেছে। বলা বাহুল্য গুপ্ত যুগ ও পাল যুগের মূর্তির ভাস্কর্যে কাপড়ের ভাঁজ আছে কিন্তু নকশার চিহ্ন নেই। চতুর্দশ শতাব্দীতে নেত্র নামক রেশম বস্ত্রটি সেজে উঠত লতাপাতা ও ফুল-পাখির অলঙ্করণে। ভারতে মোঘলরা আসার আগে পরিধেয় বস্ত্র ছিল সেলাইবিহীন।

চাষিরা কার্পাস বীজ তেল-ঘিতে ভিজিয়ে মাটির পাত্রে রেখে উনুনের কাছাকাছি পাট বা সুতোর বিনুনি বাঁধার কৌশলে তৈরি শিকেয় ঝুলিয়ে রেখে দিত। বসন্তকালেই উৎকৃষ্ট মানের ফুটি কার্পাসের চাষ হয়। বোয়াল মাছের চোয়ালের দাঁত চিরুনির মতো ব্যবহার করে সতর্কতার সঙ্গে ফুটি কার্পাসের বীজ থেকে লম্বা-সূক্ষ্ম-নরম আঁশ খসিয়ে নেওয়া হয়। চিতল ও কুঁচে মাছের চামড়ায় এই আঁশ-তুলো বিছিয়ে রেশম সুতোর ধনুনীতে ধুনে নেওয়া হয়। এরপর টাকু চরকায় সুতো কাটা। মাঝে মাঝে পাথরের বাটিতে রাখা খড়িমাটি হাতে মেখে নেওয়া। মসলিনের টানায় সুতোর নরম ভাব টিকিয়ে রাখতে খই-এর মাড় ব্যবহার করা হয়। তারপর নলি বা

"চতুর্দশ শতাব্দীতে নেত্র নামক রেশম বস্ত্রটি সেজে উঠত লতাপাতা ও ফুল-পাখির অলঙ্করণে। ভারতে মোঘলরা আসার আগে পরিধেয় বস্ত্র ছিল সেলাইবিহীন।"

"মসলিন বোনার শ্রেষ্ঠ মরশুম বর্ষা কাল বা আর্দ্র পরিবেশ। গ্রীষ্মকালে তাঁতের নীচে জলভর্তি পাত্র রাখা হত যাতে ঘর্ষণজনিত গরমে সুতো ছিঁড়ে না যায়। নদীর তীর থেকে ভেসে আসা ঠান্ডা হাওয়া এ শিল্পের উপযোগী।"

বল্লম আকৃতির মাকুতে তাঁত বোনা হয়। মাকু পিচ্ছিল রাখতে ব্যবহার করা হয় সরষের তেল। বলা বাহুল্য মসলিনের সুতো তৈরির জন্য চোখের জ্যোতি ও আঙুলের তৎপরতা প্রয়োজন। একাজ করতে হয় ভোরবেলায় অল্প আলোয়। এজন্য অল্পবয়সি মেয়েরাই একাজ করত। মসলিনের সুতো গোল না হয়ে হতো একটু চ্যাপটা। এক পাউন্ড সুতো দুশো পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত দীর্ঘ হত, যা সাধারণত হওয়ার কথা একশো পনেরো মাইল। মসলিন বোনার শ্রেষ্ঠ মরশুম বর্ষা কাল বা আর্দ্র পরিবেশ। গ্রীষ্মকালে তাঁতের নীচে জলভর্তি পাত্র রাখা হত যাতে ঘর্ষণজনিত গরমে সুতো ছিঁড়ে না যায়। নদীর তীর থেকে ভেসে আসা ঠান্ডা হাওয়া এ শিল্পের উপযোগী। চুন আছে এমন জল মাটির গামলায় নিয়ে গরম করা হতো মসলিন কাচার জন্য। প্রয়োজনে কলাগাছের শুষ্ক খোল পুড়িয়ে অল্প জলের মিশণে তৈরি বাসাম কিংবা সাজিমাটি, সোডা, লেবু—এগুলি কাচার জন্য ব্যবহৃত জলে মেশানো হত। দাগ তুলতে আমরুল পাতার রস। মসলিন কাচতে গিয়ে সুতোর স্থানচ্যুতি ঘটলে তা ঠিক করতে অতি যত্নে ও ধৈর্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হতো নাগফণি গাছের কাঁটা। আর মুসলমান রিফুগররা আফিমের নেশা চড়িয়ে মাতালের মতো রিফুকাজ করতেন। শঙ্খ দিয়ে ঘসে মসলিন মসৃণ করা হত। সবগুলি কাজই হয় সতর্কতার সঙ্গে। মসলিন আটশো বা তারও বেশি

কাউন্টের সূক্ষ্ম বস্ত্র। মসলিন তৈরির পেছনে হিন্দু-মুসলিম উভয়েরই আগ্রহ ছিল। নবাবদের অপছন্দ সত্ত্বেও মোঘল আমলে মসলিন বিশ্বে সুনাম নিয়েছিল। কথিত আছে, সাতপর্দা মসলিনে দেহ আবৃত করে জেবউন্নিসা পিতা ঔরঙ্গজেবের নজরে এসে তিরস্কৃত হয়েছিলেন।

যাই হোক মসলিন ভাঁজ করার কাজটি করত কুমিদার সম্প্রদায়। কথিত আছে, দেশলাই বাক্সে মসলিন শাড়ি রাখার গল্প কথা। নবম শতাব্দীতে আরবীয় পর্যটক সুলেমন মসলিন কাপড় প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন, একটি প্রমাণ সাইজের সম্পূর্ণ কাপড় আংটির মধ্য দিয়ে গলে যায়। এও কথিত, পারস্য সম্রাট চ্যাসোফিকে সন্তুষ্ট করতে একটি নারকেল খোলার ভেতর পাঠানো হয়েছিল ষাট হাত দীর্ঘ মণি-মুক্তো দিয়ে সাজানো মসলিন কাপড়ের পাগড়ি। সে যেন মাকড়সার জাল। মিহি ও সূক্ষ্মতার তারতম্যে মসলিনের নানা ভাগ। বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর কড়া নজরদারিতে প্রস্তুত হত উন্নত মানের সুতোর বুননে 'মলবুশ খাস'। এই 'মলবুশ খাস' ঔরঙ্গজেবের কাছে উপঢৌকন হিসাবে যেত। মোঘল পরিবারের অন্দরমহলে ঝুনা মসলিনেরও চল ছিল। নর্তকীরা ব্যবহার করত লজ্জা নিবারণে একেবারেই অসমর্থ 'মলমল খাস' বা 'মুলবুই খাস'। শিশিরসিক্ত ঘাসে 'শবনম' বিছিয়ে দিলে ঘাসের সঙ্গে মিলিয়ে যেত। 'শবনম' এর অর্থই হল ভোরের শিশির। নদীর স্রোতে 'আর-ই-রোয়ান' মেলে ধরলে কাপড় অদৃশ্য হয়ে যেতো। এ নামের অর্থই হল প্রভাবিত জল। ঘূর্ণি হাওয়ায় নিখোঁজ হয়ে যেতো 'বাফতা'; অর্থে বাষ্প হাওয়া।

আইন-ই-আকবরীতে ঠাস বোনা সূক্ষ্ম মসলিন 'খাস্‌সা'-এর উল্লেখ আছে। 'সর-বন্ধ' দিয়ে উচ্চপদস্থ কর্মীরা পাগড়ি বাঁধতেন। 'নয়নসুখ', 'তানজেব', 'জঙ্গল-ই-খাস', 'বদনখাস', 'সরকার-ই-আলি', 'চন্দ্রাবনী', 'মাসরু'—এরকম মসলিনের নানা নাম। শুভ্র বর্ণই ছিল শ্রেষ্ঠ। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, কালো রং করার প্রথাও ছিল।

"মিহি ও সূক্ষ্মতার তারতম্যে মসলিনের নানা ভাগ। বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর কড়া নজরদারিতে প্রস্তুত হত উন্নত মানের সুতোর বুননে 'মলবুশ খাস'। এই 'মলবুশ খাস' ঔরঙ্গজেবের কাছে উপঢৌকন হিসাবে যেত। মোঘল পরিবারের অন্দরমহলে ঝুনা মসলিনেরও চল ছিল।"

আকবরের সভাসদ আবুল ফজল এবং ইংরেজ পর্যটক রাল্ফ ফিচ্ সোনারগাঁও-এর মসলিনের প্রশংসা করেছেন। পর্তুগিজরা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে হুগলিতে মসলিনের উপর তসর সিল্কের কাজ করিয়েছিলেন। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারির 'বোর্ড অব ট্রেড' এর কার্যবিবরনণীতে চন্দননগরের ফরাসডাঙার বয়ন শিল্পে দক্ষতার কথা উল্লেখ আছে।

এক সময়ের জগৎবিখ্যাত ঢাকাই মসলিন বর্তমান বিশ্ববাজারে সেই মানের কার্যদক্ষতা দেখাতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমানের সমুদ্রগড় কিংবা কালনার রবীন্দ্রকুমার সাহা কিংবা কেতুগ্রাম সমন্বয় সমিতি, মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের শিল্পীরা হারিয়ে যাওয়া অহংকার ছোঁয়ার চেষ্টা করছে মাত্র। ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করার সময় মসলিনের কারিগর তথা দক্ষ তাঁতশিল্পীরাও এসেছিলেন মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের অদূরে ভাগীরথীর কূলে; সেকালে নাম ছিল বালুচর। এক সময় এই শিল্পগ্রাম অতল জলে তলিয়ে যায়। শিল্পীরা চলে যান বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর এবং কেউ বেনারস। বীরপুর ও মীরপুরেও কিছু থেকে যান। এ সূত্রে বিষ্ণুপুরে মসলিন তৈরির ঘটনা আশ্চর্য কিছু নয়। বস্ত্র ব্যবসায়ীরা মসলিনের সূক্ষ্ম কার্যদক্ষতা ও হালকা অনুভবপ্রিয়তাকেই কাজে লাগিয়েছিল। মসলিন কাপড় দিয়ে তৈরি হয়েছিল অসংখ্য ভাঁজে নানা ধরনের পোশাক। যার লালিত্য ছিল চোখে পড়ার মতো। এ ছিল বিলাসিতার অন্যরূপ। নানা পরিস্থিতির মধ্যে মসলিন অন্যরূপে ধরা দিল কিংবা তাঁতিরা পরিস্থিতির চাপে দক্ষতা হারিয়ে নতুন ভাবনায় সাজাল বস্ত্রশিল্পকে। গ্রাম্যবধূরা এখন ব্লাউজ পরে; শরীর দেখা যাওয়া মসলিন তাদের অপছন্দের। পর্দা ঢাকা অন্দরমহলেও মসলিনের চাহিদা কমল।

"১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করার সময় মসলিনের কারিগর তথা দক্ষ তাঁতশিল্পীরাও এসেছিলেন মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের অদূরে ভাগীরথীর কূলে; সেকালে নাম ছিল বালুচর।"

পরাধীন ভারতের পক্ষে সম্ভব ছিল না বিদেশের বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করা। খদ্দেরের অভাবে বালুচরের তাঁতিরা জেকার্ড ডাবি খুলে আটপৌরে শাড়ি বুনতে শুরু করে দিল। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে নদিয়া জেলার অধিকাংশ গ্রামে তৈরি হত তাঁতে বোনা মোটা শাড়ি-ধুতি। রূপকথার গল্পের মতো হারিয়ে গেল অসংখ্য সুতোর হিসেব রেখে

অসমান্য দক্ষতায় প্রস্তুত দীর্ঘ নকশা আঁচলের বালুচরি শাড়িগুলি। মাটির গভীরে গর্ত খুঁড়ে তাঁত বসিয়ে এ শাড়িগুলি তৈরি। দেশি হাতি আর বিদেশি ঘোড়ার পাশাপাশি আঁচলে নক্‌শার বিষয় হত বাদশাহি রাজ রাজাদের যাপনচিত্র এবং ফুল-লতা-পাতা, যেভাবে পোড়ামাটির নক্‌শা সেজে উঠত। ছন্দময়-বর্ণময় সুতোর বিন্যাস। শেষ স্বনামধন্য কারিগর দুবরাজ দাস, উনিশ শতকের শেষভাগে হেম ভট্টাচার্য। বিষ্ণুপুরের অক্ষয় দাস সোনামুখীর মোহনদাস বাবাজির মেলায় কোনো এক নববধূর পরনে ফুল তোলা আঁচল দেখে পৌঁছে যান বালুচরের পুরনো কাহিনিতে। বালুচরের নকশা তুলতে শুরু করেন পাঞ্চিং কার্ডে। দৈর্ঘ্য-রূপে তেমন না হলেও শান্তিপুরের তাঁতের শাড়িও সেজে ওঠে অপূর্ব নকশায়। উদ্ভব দাস শাড়িতে পদ্য লেখা শুরু করেন। নবদ্বীপ ও কালীঘাটে নামাবলি আর বৃন্দাবনী নামে দু-ধরনের নক্‌শা পাড়ের প্রচলন ছিল। বলা বাহুল্য ষোড়শ শতকে অসমের বৈষ্ণব মহাপুরুষ শঙ্করদেবের তত্ত্বাবধানে কৃষ্ণলীলাকে গুরুত্ব দিয়ে বৃন্দাবনী বস্ত্রের সূত্রপাত। বর্তমানে বাংলার শাড়ির জগতে কাঁথা হারিয়ে নতুন ভাবনায় এল কাঁথাস্টিচ শাড়ি। আর জাপানি ইতজিম টেকনিকে তৈরি বিশেষ করে রাজস্থানে প্রচলিত বাঁধনি শাড়ি, সেজে উঠল ছবি-রঙে।

ছবি-রঙে শাড়িকে সাজাল পটুয়ারাও। মুর্শিদাবাদ সিল্ক, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের স্বর্ণচরী, নদিয়ার ফুলিয়া ও শান্তিপুরের টাঙ্গাইল, হুগলির বেগমপুরী, ধনেখালি এগুলিতো আছেই। মালদার মলমলখাস কাপড়ের পাগড়ির সুনাম ছিল। বাংলার জনপ্রিয় ছিল চওড়া লালপাড় যুক্ত কাস্তেপেড়ে শাড়ি, সরু পাড় দেওয়া কাপড়। পরবর্তী পর্যায় তৈরি হয়েছে কৃত্রিম তন্তুজাত বস্ত্র অর্থে পলিয়েস্টর ফেব্রিক্স। শাড়িপ্রেমিকাদের মুখে মুখে ঘোরে ‘জামদানি’ নামটি। একসময় এই জামদানিকে বলা হত পুষ্পিত মসলিন। ‘জাম’ অর্থে জামা; আর ‘দানি’ অর্থে বুটি। ফরাসি শব্দ। ইরানি শিল্পকলার প্রভাব। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার রাজবাড়ির জন্য তৈরি হয়েছিল বহুমূল্যের

“শাড়িপ্রেমিকাদের মুখে মুখে ঘোরে ‘জামদানি’ নামটি। একসময় এই জামদানিকে বলা হত পুষ্পিত মসলিন। ‘জাম’ অর্থে জামা; আর ‘দানি’ অর্থে বুটি। ফরাসি শব্দ। ইরানি শিল্পকলার প্রভাব। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার রাজবাড়ির জন্য তৈরি হয়েছিল বহুমূল্যের জামদানি বা বুটি তোলা মসলিন। কিন্তু বর্তমানে তৈরি জামদানি সেকেলের জামদানির মতো নয়।”

জামদানি বা বুটি তোলা মসলিন। কিন্তু বর্তমানে তৈরি জামদানি সেকেলের জামদানির মতো নয়। বলা হত জামদানি আসলে 'কাসিদা' মসলিনের নিকৃষ্ট সংস্করণ। এই তুলনামূলক আলোচনায় মিহি মলমল-এর কথাও ভাবা যেতে পারে। তুলনামূলক আলোচনার জন্য কিংবা মসলিনের খোঁজে যাওয়া যেতে পারে ৪৫ নং গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউতে গভর্নমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে কিংবা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্ট সেন্টেনারি বিল্ডিং-এ কিংবা অন্য কোথাও।

অনেক স্মৃতি ও ইতিহাস নিয়ে জড়িয়ে থাকা বাংলার কাপড় ও পোশাক বিশ্বের এক মূল উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে উঠে আসার সম্ভাবনা রাখে। বিশ্ববাজারকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে মসলিন তারই একটি উদাহরণ। মূলত অলঙ্করণ বলতে তিন-চার পাপড়ির ফুল। যে ফুলের দেখা মেলে প্রাচীন পাথরের মূর্তিতেও। ঠাসা অলঙ্করণ গুরুত্ব পেত না বললেই চলে। প্রায় হারিয়ে যাওয়া সে চর্চা। দুর্নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সেদিনের সেই নিষ্ঠুর শাসন বাংলার তাঁত শিল্পে এনেছিল শব্দহীন অন্ধকার। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ আগস্ট গোলাগর ফ্যাক্টরি-আড়ংয়ের ৪০০২ জন পুরুষ তাঁতির সাক্ষরিত প্রতিবাদ তারই প্রমাণ। টোপ গেলা সাথী কিংবা সুবিধাবাদী সাথীর নির্বাক কণ্ঠের পাশে ছন্নছাড়া কত একক প্রতিবাদী অসহায় হয়েছে তার হিসেবতো গুনতির বাইরে। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ২৮ নভেম্বর সেনামুখী-সুরুলের তাঁতিরাও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিল। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের ২১ জানুয়ারি কমার্শিয়াল বোর্ড অব ট্রেডের কাছে পাওনা টাকা কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল শান্তিপুরের ফ্যাক্টরিতে। এত অত্যাচার ও কূটকৌশলের হাঁ-মুখের কাছাকাছি থেকেও এই জাতব্যবসা টিকে

"বিশ্ববাজারকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে মসলিন তারই একটি উদাহরণ। মূলত অলঙ্করণ বলতে তিন-চার পাপড়ির ফুল। যে ফুলের দেখা মেলে প্রাচীন পাথরের মূর্তিতেও। ঠাসা অলঙ্করণ গুরুত্ব পেত না বললেই চলে। প্রায় হারিয়ে যাওয়া সে চর্চা।"

রইল। কারণ তারা তাঁত বোনা ছাড়া কিছু শেখেনি। যন্ত্রচালিত তাঁত বোনার খরচ কম হওয়ায় হস্তচালিত মাধ্যম থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে বেসরকারি সংস্থাগুলি। যখন যন্ত্রনির্ভর বৈচিত্র্যহীন উৎপাদনের বাড়বাড়ন্ত; তখন ঐতিহ্য নির্ভর জ্ঞানভাণ্ডারে সমৃদ্ধ হস্তচালিত তাঁত বয়নশিল্পের ধারাকে ধরে রাখাটা শিল্পীদের কাছে চ্যালেঞ্জ।

মনে রাখতে হবে যন্ত্রযুগের সূচনার সময়ও মসলিনের সুনাম ধীরে ধীরে থমকে যায়নি; জোর করে মসলিন তৈরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। একটা বড় অংশ বস্ত্রশিল্প থেকে সরে গিয়েছিল সাধারণ জীবিকায়। তৈরি হল সুলভ শ্রম। অথচ আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসের দিকে চোখ রাখলে দেখা যাবে, কর্মসংস্থান ও অর্থনীতির বিকাশের জন্য বিশেষজ্ঞরা বারে বারে নির্ভর করেছেন বস্ত্র-বয়নশিল্পের উপর। কৃষিকাজ ও গবাদি পশুপালনের পাশাপাশি এ কাজ নতুন একটা আয়ের পথ দেখায়। বিশ্ববাজার এবং অভ্যন্তরীন বাজারে ব্যবসায়িক মডেলে দক্ষতার মূল্যকে নির্দিষ্ট ব্র্যান্ড হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে, অভ্যন্তরীন বাজারকে মজবুত করতে হলে সাংস্কৃতিক জগতকে দেশজ শিল্প বিক্রির উপযোগী করতে হবে। ভারতে বৈচিত্র্যের অপূর্ব মেলবন্ধন। সেই বৈচিত্র্য দিয়েই প্রভাবিত করতে হবে বিশ্বের সাংস্কৃতিক জগৎকে। আর ভেতরের বাঁধন শক্ত করতে হবে বিপ্লবীদের দেশজ আবেগকে ছড়িয়ে দিয়ে। সংস্কৃতিই বাজারের রং বদলায়। তাই নিজস্ব সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিলে বাইরের সংস্কৃতি বাঁধতে পারে না। নিজস্ব সংস্কৃতির রং চাপা পড়ে গেলে বিশ্বের কাছে তা প্রকাশ পাওয়ার সুযোগ পায় না। নিজস্ব সংস্কৃতির রঙের প্রকাশ ঘটাতে পারলেই বস্ত্রশিল্প ফিরে পাবে হারানো গৌরব। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে স্বনির্ভর করে তোলার উপায়। বলাবাহুল্য বস্ত্রশিল্পের কর্মগোষ্ঠীতে মহিলাদের প্রাধান্য।

“ভারতে বৈচিত্র্যের অপূর্ব মেলবন্ধন। সেই বৈচিত্র্য দিয়েই প্রভাবিত করতে হবে বিশ্বের সাংস্কৃতিক জগৎকে। আর ভেতরের বাঁধন শক্ত করতে হবে বিপ্লবীদের দেশজ আবেগকে ছড়িয়ে দিয়ে।”

আশার কথা, মসলিনের পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান সরকার। আবার বাংলার মসলিন সাগর পারি দিচ্ছে বিশ্ববাংলার হাত ধরে। এইভাবেই বাংলা নিজের ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলার বস্ত্র শিল্প বাংলাকে বিশ্বের কোণে কোণে পৌঁছে দিয়েছিল একসময়। আবারও তা সম্ভব হচ্ছে সরকারি উদ্যোগে। এই ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত উদ্যম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চিত্তেশ্বরী, কাশীপুর, কলকাতা

বাংলার দারু বিগ্রহ: শিল্প ইতিহাসের পরম্পরা

সোমা মুখোপাধ্যায়

একসময় জীবনধারণের তাগিদে আমাদের প্রপিতামহরা ইহজাগতিক সকল কিছুর পশ্চাতেই কল্পনা করেছিলেন অসংখ্য অলৌকিক পরিচালন শক্তিকে। এভাবেই কল্পিত হয়েছিলেন লৌকিক দেবদেবী যাঁদের আশীর্বাদে জীবন পুষ্ট হয় আর অভিশাপে ধ্বংস হয়ে যেতে হয়। সূচনায় এইসব দেবদেবীরা মূর্তিহীনভাবেই কল্পিত হয়েছিলেন। নদী, পাহাড়, বন, আকাশ সর্বত্রই এদের অস্তিত্বকে মেনে নিয়ে তাঁদের আরাধনা শুরু হয়েছিল। এভাবেই প্রাচীনকাল থেকে বৃক্ষপুজার শুরু হয় যা আজও প্রবহমান রয়েছে সাঁওতাল জনজাতির—বাহা পরব, ইঁদপরব বা বাংলার মনসাপুজোর সময় ফণিমনসার ডাল বা সিজ বৃক্ষের আরাধনার মধ্যে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষ থেকেই দেবতার বিগ্রহ তৈরি করে তার পুজোর সূচনা হয়।

আর্য আগমনের পূর্বে এদেশের প্রাচীন জনজাতি যাদের অনার্য নামে অভিহিত করা হত তাদের মধ্যে মূর্তিপুজোর প্রচলন ছিল। বেদে এই অনার্যদের বলা হয়েছে 'শিশ্নদেব' বা লিঙ্গ উপাসক ও 'মূঢ়দেব' অর্থাৎ অর্থহীন দেবতাদের উপাসক। সাহিত্যের এই উপাদান সমর্থিত হয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে পাওয়া পোড়ামাটির মাতৃকামূর্তির মাধ্যমে। বালুচিস্তানের কুল্লি ও ঝোভ থেকে সিন্ধুর নগরকেন্দ্রিক সভ্যতায় যাদের অবিরাম চলাচল ছিল।

সিদ্ধেশ্বরী, রামপাড়া, হুগলি

কৃষ্ণ ও বলরাম

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বাসগৃহ, উত্তর ২৪ পরগনা

ভৈরবী, দিলকাকা মানদারন, হুগলী

গঙ্গা, গৌরা, পশ্চিম মেদিনীপুর

ঐতিহ্যবাহী সাহিত্যে বাংলাকে বলা হয়েছে 'পাণ্ডববর্জিত দেশ'। খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের রাঢ়দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে আর্য সংস্কৃতির অভিঘাত সর্বপ্রথম এদেশের মাটি স্পর্শ করলেও এদেশের অনার্য সংস্কৃতির মানুষ তাকে গ্রহণ করেনি। আচারঙ্গ সূত্রের বর্ণনা অনুযায়ী তৎকালীন জনগোষ্ঠী মহাবীরের উদ্দেশে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল এবং তাদের মুখ নিঃসৃত শব্দের অর্থও তিনি অনুধাবন করতে পারেননি। এর থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির প্রভেদ। এরপর দীর্ঘদিন আর্যসংস্কৃতির বলয়ের বাইরে থাকা বঙ্গদেশে যখন ধীরে ধীরে আর্যসংস্কৃতি প্রবেশ করতে শুরু করে তখন আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মধ্যে একটা মেলবন্ধন ঘটে। এই সাঙ্গীকরণের সংস্কৃতির মাঝেই বঙ্গসংস্কৃতির মূল নির্যাসটুকু উপলব্ধি করতে হয়।

গুহাবাসী মানুষ তার মনের ভাব ব্যক্ত করতে গুহার দেওয়ালে ছবি এঁকেছিল। শিকারে যাওয়ার আগে কাঙ্ক্ষিত পশুর একটা অবয়ব ফুটিয়ে তুললে সেই পশুটির শিকার

সম্ভব হবে এমনই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ছবি আঁকত তারা। কৃষিভিত্তিক সভ্যতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী জীবনযাপন পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে মানুষের মনে নান্দনিক শিল্পভাবনার উদ্রেক হয়। এই ধারণা থেকে নিজেদের বাড়িঘর, আসবাব, ঘর গেরস্থালির নানা সরঞ্জামে যেমন তারা শিল্পকলার ছাপ রেখে যায়, তেমনি ব্রতের আলপনায় ধর্মাচার পালনের দিকটিও ফুটিয়ে তোলে। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান থেকে তারা প্রথমে নানা বিষয়বস্তু নির্বাচন করে; পরে মানুষের অবয়বও তৈরি করা হয় (দশপুতুল ব্রতের আলপনা)। এরপর আসে ছবি থেকে মূর্তি তৈরি। মঙ্গলকোট, পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে উৎখননের পর পোড়ামাটির মৃৎপাত্রে জালবন্দি একসার মাছ বা ময়ূরের সাপ ধরার দৃশ্যের পাশাপাশি পোড়ামাটির মাতৃকামূর্তিগুলি এই সাক্ষ্য বহন করছে। সময়ের নিরিখে এগুলি আনুমানিক ± ১২০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের। প্রাচীন বাংলার মানুষের বস্তুগত জীবন ও ধর্মীয় জীবনে শিল্পকলাগত পরিবর্তনের এটি অনন্য উদাহরণ।

প্রাচীন বঙ্গের মানুষ নমনীয় কাদামাটির তাল থেকে নারীমূর্তি বা মাতৃকামূর্তির অবয়ব গড়েছিল উৎকৃষ্ট ফসল আর প্রজননের কারণে। পরবর্তীতে একে স্থায়ী করতে আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে লোকদেবতার

ভগবতী, প্রসাদপুর, হুগলী

সিংহবাহিনী, শ্যামপুর, হুগলী

কৃষ্ণ-রাধা, আদি সপ্তগ্রাম, হুগলি

শ্যামরাই, কালীঘাট, কলকাতা

থানে এই ধরনের নারীমূর্তি ছলন হিসাবে দেওয়ার রীতি রয়েছে। কিন্তু আমরা যাকে দেব বিগ্রহ বা মূর্তি বলি বাংলায় তার প্রচলন হয়েছিল অনেক পরে। শিল্পশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী বিগ্রহ নির্মাণের ধ্রুপদি ধারা আর্যসংস্কৃতির বলয়ের বাইরে থাকা বাংলার শিল্পীরা গ্রহণ করলেও খুব বেশিদিন তা অনুসরণ করেননি। পাল-সেন আমলের পর থেকেই বাংলায় নিজস্ব এক মূর্তি নির্মাণ শৈলীধারা বা স্টাইল গড়ে ওঠে। উচ্চমার্গীয় ও লোকায়ত শৈলীর অপূর্ব মেলবন্ধনে সৃষ্ট এই ধারাটির সর্বাধিক প্রভাব পড়ে দারু বিগ্রহ নির্মাণের ক্ষেত্রে।

শিল্পশাস্ত্রে সাধারণত সাতটি মাধ্যমে দেব-দেবীর মূর্তি নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল স্বর্ণ বা সোনা, রজত বা রুপো, তাম্র বা তামা, পার্থিব বা মাটি, বৃক্ষি বা কাষ্ঠ, প্রস্তর বা পাথর এবং আলেখ্য বা চিত্র। পাল-সেন যুগ পর্যন্ত এই সবকটি মাধ্যমেই দেব-দেবীর বিভিন্ন মূর্তি তৈরি হত এবং এর বহু নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলার প্রাচীন দারু বিগ্রহের তেমন কোনো নিদর্শন নেই। বাংলার জল হাওয়ায় অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে কাঠ সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। সেই কারণে হয়তো আমাদের এই দৈন্যতা।

ত্রয়োদশ শতকে ইখতিয়ার উদ্দিন খলজির বঙ্গবিজয়ের মধ্যে দিয়ে বাংলায় মুসলমান শাসনের সূচনা হয়। এতদিন পর্যন্ত রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় যে দেববিগ্রহ

নির্মিত হত এবার তার পালাবদল ঘটে। পূর্বের মতো রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার বদলে স্থানীয় জমিদার, সামন্ত এবং গ্রামবাসীদের যৌথ উদ্যোগে শুরু হয় দেববিগ্রহ নির্মাণের নতুন উদ্যোগ। তাই মূল্যবান ধাতু বা পাথরের (যা আমদানি করতে হত বাংলার বাইরে থেকে) পরিবর্তে সহজলভ্য বৃক্ষের ওপরই মনোনিবেশ করেন শিল্পীরা। পূর্বের ভাস্করদের বদলে স্থানীয় লোকশিল্পীরাই এবার স্থানীয় শাসক গোষ্ঠীর নির্দেশে দেববিগ্রহ নির্মাণে এগিয়ে আসেন। মাটির মতো কাঠও নমনীয় মাধ্যম। সেজন্য এই মাধ্যমটি ব্যবহার করে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' শুরু হয় দেববিগ্রহ নির্মাণকার্য। সর্বভারতীয় দেববিগ্রহ-নির্মাণ শৈলীধারা থেকে মুক্ত হয়ে বাংলার শিল্পীরা এক নবযুগের সূচনা করেন।

বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যদেবের সময়কাল (১৪৮৬-১৫৩৪) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ইতিহাসটি সমৃদ্ধ হয়েছিল এক উন্নতমানের শিল্পচর্চার জন্য। সাহিত্য-সংগীতের পাশাপাশি অসংখ্য নয়নাভিরাম দারু বিগ্রহ নির্মাণ এই যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণ-রাধা, বলরাম, জগন্নাথ, রাম-সীতা, বেণুগোপাল, মদনমোহন, গৌর-নিতাই, অদ্বৈত-সীতাদেবীর মতো বৈষ্ণব ব্যক্তিত্বদের পাশাপাশি শাক্ত ধর্ম উপাসকদের পূজিত নানা দেবী মূর্তির নির্মাণও শুরু হয়, যে ধারা এখনো পর্যন্ত বর্তমান। এইসব দারু বিগ্রহে শিল্পীদের রূপকলা নিয়ে যেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়, তেমন বাংলায় যে পরধর্মসহিষ্ণুতা ও সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটি সমান্তরাল যুগান্তকারী ধারা প্রবহমান ছিল তারও পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাকৃতিক শক্তির কাছে অসহায় মানুষ প্রথম ভয়-ভীতির থেকে দেবতাদের কল্পনা করেছিল। সে-সময় অরণ্যচারী গুহাবাসী মানুষের ভ্রাম্যমাণ জীবনে শুধু বেঁচে থাকাটাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এরপর পশুচারণ থেকে পশুপালক-কৃষিজীবী হয়ে ওঠার পর যখন তাদের জীবনে অনিশ্চয়তা দূর হয়েছে তখন সুন্দরের উপাসনা করতে শিখেছে তারা। ধীরে ধীরে মানুষী অবয়ব গড়ে দেবতাকে রূপদান করেছে। ভয়ের জায়গায় এসেছে ভালোবাসা। সেজন্য দেব-দেবীর মূর্তি রূপায়ণেও এসেছে নান্দনিকতা। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভক্তি রসের প্রাবল্য। তাই দেবমূর্তিও হয়েছে মনোরম। ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের অনুশাসন অনুযায়ী দেবমূর্তি নির্মাণের রীতির সঙ্গে বাংলার শিল্পীদের নিজস্ব শৈলীর সংমিশ্রণে দেবত্বের ওপর আরোপিত হয়েছে মানবসুলভ বৈশিষ্ট। তাই দেব-দেবীর অর্ধ নিমীলিত মৎস্যাক্ষি যা তাদের আত্মধ্যানস্থ রূপটি প্রকাশ করত; তার পরিবর্তে বাংলার শিল্পীরা সৃষ্টি করলেন পটলচেরা চোখ যেখানে দেবতার সঙ্গে

মদনগোপাল,পালসীট, পূর্ব বর্ধমান

অনন্তবাসুদেব, জোনকুল, হুগলি

বলরাম, বোড়ো, পূর্ব বর্ধমান

বলরাম ও রেবতী
কামারপাড়া, চুঁচুড়া, হুগলি

ভক্তের একবারে সরাসরি সংযোগ তৈরি হল। দেবতার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সৃষ্টি করলেন এক অদ্ভুত পেলবতা। দেবতা কোনো ভিনগ্রহের বাসিন্দা নন। ভক্তের মাঝেই তাঁর বাস। ভারতীয় দর্শনের মূল নির্যাস 'সো অহং' অর্থাৎ 'আমিই তিনি আর তিনিই আমি' এভাবেই ফুটিয়ে তুললেন বাংলার শিল্পীরা।

বাংলার শিল্পীদের চিরন্তন এই সৃষ্টির অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে সমগ্র বাংলায়। এই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে পাঠকদের জন্য কয়েকটি প্রতিনিধি স্থানীয় বিগ্রহ নিয়েই আলোচনা করব। পূর্বেই বলা হয়েছে বিগ্রহ নির্মাণের এই বিশেষ শৈলীর সূচনা হয়েছিল শাস্ত্রীয় ও লোকায়ত ধারার মিশ্রণে। এর সর্বপ্রথম উদাহরণ হল বর্তমানের পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না থানার বোড়ো গ্রামের বিশালাকার বলরামের মূর্তি। এই মূর্তিতে তাঁকে যেভাবে রূপায়িত করা হয়েছে তাতে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। লোকায়ত শিল্পীরা চিত্রকলায় যেভাবে কোনো দেবতাকে উপস্থাপিত করেন সেভাবেই বলরামকে যেন মূর্তিতে রূপায়ণ করা হয়েছে। তেরোটি নাগের ছত্রাতপে চোদ্দো হাত বিশিষ্ট বলরামের এ হেন মূর্তির কোনো পৌরাণিক উৎস পাওয়া যায় না। তবে এঁর দাড়ি-গোঁফযুক্ত মুখমণ্ডল আর বৃহদাকার অক্ষিগোলক দুটি এই মূর্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অনেকে এর সঙ্গে ওড়িশার শিল্পরীতির সাদৃশ্য আছে বলে মনে করেন। পাল-সেন আমলে ভাস্কররা সমগ্র মূর্তিটি বিশদভাবে খোদাই করতেন। মূর্তির অলংকার, পোশাক-পরিচ্ছদ-সহ খুঁটি-নাটি সমস্ত কিছুতেই এই খোদাই কার্যের নিপুণতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু আলোচ্য সময়ের শিল্পীরা কাঠ খোদাইয়ের সঙ্গে তেমনভাবে দক্ষ না হওয়ায় তারা চিত্রশিল্পের আশ্রয় নিয়েছিলেন। মূলত সাদা, কালো, লাল, হলদে রঙেই তাঁরা মূর্তির মুখাবয়ব, অলংকার, পোশাক-পরিচ্ছদ নির্মাণ করতেন। কৃষ্ণের মূর্তির ক্ষেত্রে নীল রং ব্যবহৃত হত। বোড়ো বলরামের ক্ষেত্রে সাদা রঙের বেশি ব্যবহার দেখা যায়। সব মিলিয়ে এই মূর্তি যেন বিশ্ব চরাচরের প্রতীক হিসাবেই শিল্পী রচনা করেছিলেন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ভাস্কররা যাদের সাধারণত সূত্রধর নামে অভিহিত করা হয়, এই বিগ্রহ নির্মাণে কুশলী হয়ে উঠতে শুরু করেন। দেব-দেবীর মূর্তির মধ্যে একটা কমনীয় সৌম্যভাব আনতে তাঁরা সমর্থ হন। এক্ষেত্রে বাংলার প্রাচীন এক সিংহবাহিনী মূর্তির উল্লেখ করতে হয়। হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানার নিজবালিয়া গ্রামের দেবী সিংহবাহিনী। কিংবদন্তি অনুসারে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রানা সিংহ রায় নামের এক স্থানীয় জমিদার। যিনি শেরশাহের

সমসাময়িক ছিলেন। ১৬৮৩ সালে তাঁর বংশধরদের বর্ধমানের মহারাজা কৃষ্ণরাম রায় হত্যা করেন। অন্য একটি লোকশ্রুতি অনুযায়ী এই দেবী ছিলেন বর্ধমানের মহারাজার মানসকন্যা যাঁকে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও এনার উল্লেখ রয়েছে। অষ্টভুজা এই দেবীর নির্মাণে শিল্পীরা শাস্ত্র ও লোকায়ত ধারার খুব সুন্দর মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। সিংহবাহিনীর শ্বেতকায় সিংহের সঙ্গে মানসার শিল্পশাস্ত্রের সিংহ নির্মাণ পদ্ধতির যেমন সাদৃশ্য রয়েছে তেমনি দেবীর অলংকার ইত্যাদি খোদাই করা হলেও বাকিটা রঙের মাধ্যমে শিল্পীরা ফুটিয়ে তুলেছেন। এমনকি দেবীর পশ্চাতপটও খুব সুন্দরভাবে খোদাই করে রং করা হয়েছে। এর পরবর্তী সময়ে হাওড়া আর হুগলি জেলার নানা স্থানে বিভিন্ন লোকায়ত ও শাস্ত্রীয় দেব-দেবীর নির্মাণ করেছেন শিল্পীরা। হাওড়া জেলার রসপুরের অভয়াদুর্গা গড়চণ্ডী, দহের মা মনসা, হুগলি জেলার দিলাকাশ মান্দারনের ভৈরবী, কুলাকাশের চণ্ডী, প্রসাদপুরের ভগবতী এমন অজস্র উদাহরণে বাংলার শিল্পীদের পরম্পরা প্রতিফলিত হয়েছে।

পাল-সেন যুগে ভাগবত পুরাণে বর্ণিত বাসুদেব বিষ্ণুর প্রচুর পাথরের মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেলেও দারু

গড়চণ্ডী, রসপুর, হাওড়া

সিংহবাহিনী, নিজবালিয়া, হাওড়া

যশোমাধব, গরাণহাটা, কলকাতা

বিগ্রহের মাত্র ৩ টি দুর্লভ উদাহরণ রয়েছে। অবিভক্ত বাংলার ঢাকার ধামরাইয়ের যশোমাধব। স্থানীয় সামন্ত যশোপাল কর্তৃক আনুমানিক ৭২৪-৭২৫ খ্রিঃ তৈরি এই মূর্তি ঘিরে লোকশ্রুতি রয়েছে। এটির সঠিক কাল নির্ণয় নিয়ে মতভেদ আছে। বর্তমানে মূল মূর্তিটি অনেক পরবর্তী কালের। অবিভক্ত বাংলার কুমিল্লার কৃষ্ণপুর অঞ্চলের মূর্তিটি বিনষ্ট। আর বর্ধমান জেলার গোদা থেকে গরুড়বাহন বিষ্ণুমূর্তিটি রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালায় রয়েছে। কলকাতার স্বর্ণ ব্যবসায়ী হারাণ চন্দ্র বসাকের পরিবারের ক্ষুদ্রকায় যশোমাধবের একটি মূর্তি রয়েছে সেটি প্রায় ১৫০ বছরের প্রাচীন। উক্ত মূর্তিটি ধামরাইয়ের যশোমাধবের মূর্তির অনুকরণে তৈরি। পরবর্তী সময়ে এই চতুর্ভুজ বাসুদেব কৃষ্ণ মূর্তির পরিবর্তে একক কৃষ্ণ মূর্তির প্রচলন হয়। ভাগবত পুরাণের বাসুদেব কৃষ্ণের সঙ্গে দ্বাদশ শতকের কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের বেণুগোপাল কৃষ্ণের ধারণার সংমিশ্রণে গোপীনাথ বা গোপীবল্লভের বিগ্রহ তৈরি হয়। এই মূর্তি রূপান্তরিত হতে হতে অবশেষে পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি কৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত হন। তবে ইনি রাধিকাহীন, একক ভাবেই আরাধিত হতেন। বাংলায় শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পার্ষদ হুগলি জেলার আদিসপ্তগ্রাম নিবাসী রঘুনাথ দাস

অদ্বৈতপ্রভু ও সীতাদেবী, শান্তিপুর, নদীয়া

গোস্বামীর পিতা গোবর্ধনদাস পুত্রের জন্মের পর কৃষ্ণের মন্দির নির্মাণ করেন। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শিষ্য কমললোচন গোস্বামী নিতাই গৌরের বিগ্রহের সঙ্গে রাধিকার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলায় এটিই সর্বপ্রথম কৃষ্ণের দারু বিগ্রহ। কৃষ্ণ যে এককভাবে দীর্ঘদিন পূজিত হতেন তার অপর নিদর্শন বিরহীর মদনগোপাল। লোকশ্রুতি অনুসারে রাধার বিরহে কাতর মদনগোপাল তাঁর পূজারিকে স্বপ্নে রাধার মূর্তি নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন। নদীতে ভেসে আসা নিমকাঠের রাধিকা মূর্তি নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন নদিয়ার তৎকালীন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। সেই থেকে গ্রামটির নামও হয় বিরহী। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি বাংলার সর্বত্র রয়েছে। এর মধ্যে নদিয়া জেলার শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভু পূজিত রাধা-মদনগোপালের মূর্তি, নান্দনিকতার উৎকর্ষে শুধু ভক্ত নয় শিল্পরসিকদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর পাশাপাশি বর্ধমান মহারাজা প্রতিষ্ঠিত কালনার লালজি, রাজা বসন্ত রায়-পূজিত দক্ষিণ ২৪-পরগনার জয়নগরের রাধাবল্লভ ও কলকাতার কালীঘাটের শ্যাম রাই-এর মূর্তিও গুরুত্বপূর্ণ। মূর্তিগুলির নির্মাণশৈলীতে লোকায়ত শিল্পের প্রভাব ভালোভাবে উপলব্ধ করা যায়। রাধা-

রাধা মদনগোপাল, শান্তিপুর, নদিয়া

মদনগোপাল, বিরহী, নদিয়া

বলরাম ও কৃষ্ণ, ভুলু পালের ঠাকুরবাড়ি, কলকাতা

রাধাবল্লভ, জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

কৃষ্ণের যুগল মূর্তি পুজোর মতো একসময় বাংলায় কৃষ্ণ-বলরামের পুজোরও প্রচলন হয়। হুগলি জেলার গুড়াপের জোলকুল গ্রামে অনন্তবাসুদেবের মূর্তিটি এক্ষেত্রে বিশেষ আলোচ্য। এই মূর্তিতে চোদ্দো হাত বিশিষ্ট বলরামের কোলে রয়েছেন কৃষ্ণ। যেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরমাদরে লালন করছেন স্নেহের ভাইটিকে। বাংলায় কৃষ্ণ-বলরামের আর কোনো এই ধরনের মূর্তি পাওয়া যায় না। চৈতন্য-পরবর্তী সময়ে কৃষ্ণ-বলরামের পুজো অধিকমাত্রায় প্রচলন হয়। শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণের এবং নিত্যানন্দকে বলরামের মানবরূপ ভাবা হয়। সেই কারণে এই ধরনের বিগ্রহের বেশি প্রচলন হতে আরম্ভ করে। পূর্ব বর্ধমান জেলার বরশুল, বেরা, বাঘনাপাড়া, সুদপুর, নদিয়া জেলার নবদ্বীপ, বিরহী, মুর্শিদাবাদ জেলার মহুলা-সহ অনেক জায়গায় এমন যুগল মূর্তি দেখা যায়। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের পারিবারিক বিগ্রহও কৃষ্ণ-বলরাম। তবে বলরাম দারু বিগ্রহ কিন্তু কৃষ্ণ কষ্টিপাথরের। শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের ভাবে এঁদের পুজো হয় বলে অনেক স্থানে কৃষ্ণের সঙ্গে বলরামের হাতেও বাঁশি থাকে শিঙা ও লাঙলের পরিবর্তে। আবার রাধিকার মতো বলরামের সঙ্গে তাঁর সহধর্মিণী রেবতীর বিগ্রহও পুজো করা হয়। কলকাতার শোভাবাজার ও বউবাজারের

শশীভূষণ দে স্ট্রিটে ভুলু পালের ঠাকুরবাড়িতে এমন দারু বিগ্রহ রয়েছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের সময় থেকে বাংলার জগন্নাথদেবের আরাধনা শুরু হয়। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার সাবেকি মূর্তি ছাড়া বিশেষ করে স্বপ্নাদিষ্ট জগন্নাথদেবের বিভিন্ন বিগ্রহ দেখা যায় যেখানে কোথাও তাঁর পূর্ণাঙ্গ হাতও যুক্ত করা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪-পরগনার জয়নগর, হুগলির রামপাড়া, পূর্ব বর্ধমান জেলার গুপ্তিপাড়ায় এমন নিদর্শন রয়েছে।

শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর নরহরি সরকার তাঁর তিনটি বিগ্রহ তৈরি করিয়েছিলেন। এছাড়া শ্রীচৈতন্যদেবের জীবদ্দশায় তাঁর প্রধান কীর্তনীয়া গোবিন্দ দত্ত গৌর-নিতাই বিগ্রহ করে পুজো করতেন। বর্তমানে এই বিগ্রহ উত্তর ২৪-পরগনা জেলার সুখচরে মহেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেবালয়ে রয়েছে। গৌর-নিতাইয়ের দারু বিগ্রহ রয়েছে সারা বাংলা জুড়ে। এছাড়া পরবর্তী সময়ে শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ, নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বাদশ গোপালদের মূর্তিও নির্মিত হয়েছে। যাঁর মধ্যে রয়েছেন গদাধর, অভিরাম ঠাকুর প্রভৃতি। এছাড়া বিষ্ণুপ্রিয়া, জাহ্নবা দেবীরও সংখ্যায় অল্প হলেও দারু বিগ্রহ রয়েছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের আন্দোলনের পাশাপাশি বাংলায় শক্তিসাধনার ধারাও জোরদার হতে থাকে। তন্ত্রসাধক আগমবাগীশ, বামাখ্যাপা, রামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণের মাধ্যমে সেই ধারা প্রবাহিত হয়। নির্মিত হয় কালীর নানা রূপ

জাহ্নবা দেবী, দাসগদাধরের শ্রীপাট
উত্তর ২৪ পরগনা

ষড়ভুজ মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ-গদাধর, আদিসপ্তগ্রাম, হুগলী

কালী, সরদারপাড়া, গড়িয়া
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

যেমন দক্ষিণা কালী, শ্যামা কালী, শ্মশানকালী। অন্যদিকে বাংলার দুর্ধর্ষ ডাকাতরাও কালীপুজো করে ডাকাতি করতে বের হত। লোকশ্রুতি অনুসারে এমন কালী মূর্তিও জঙ্গল বা পুকুর থেকে বহু বছর পর পাওয়া গেছে যা পরবর্তীতে গ্রামের স্থানীয় কোনো পরিবার বা জমিদার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। দক্ষিণ ২৪-পরগনার গড়িয়ার সরদার পাড়ার কালীও এমনি। দীর্ঘদিন পুকুরে থাকার জন্য কাঠের যে ক্ষয় হয়েছিল তা ওই মূর্তি দেখে বোঝা যায়। তবে হুগলির রামপাড়া, কাপড়পুর ইত্যাদি অঞ্চলে যে কালী বিগ্রহ রয়েছে তা শিল্পরসিকদের নজর কাড়তে বাধ্য। বিশেষ করে রামপাড়ার নন্দী পরিবারের কালীর বেশভূষা, অলংকরণ যে শুধু পৃথক তা নয় শিবের অবস্থানই এখানে উল্টো।

বাংলায় তন্ত্রসাধনার ধারা প্রসারিত হতে থাকলে দশমহাবিদ্যার মূর্তিও নির্মিত হতে থাকে। তবে একসঙ্গে দশটি মহাবিদ্যার মূর্তি কিন্তু সচরাচর পুজো হতে দেখা যায় না। কলকাতার বরাহনগরের নিকটবর্তী রতনবাবু ঘাটের দশমহাবিদ্যা মন্দির এখানে বিশেষ আলোচনার অবকাশ রাখে। বহুদিন আগে কোনো তান্ত্রিক এনাদের পুজো করতেন। পরবর্তীকালে তিনি স্থানীয় মুখোপাধ্যায় পরিবারের

দশমহাবিদ্যা, বরাহনগর, কলকাতা

কোনো বংশধরকে এই পুজোর ভার অর্পণ করেন। এই মন্দিরে দশমহাবিদ্যার অত্যন্ত সুন্দর দারু বিগ্রহ রয়েছে, সঙ্গে রয়েছে তাঁদের পথপ্রদর্শক রূপে বটুক ভৈরব। স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব এই মন্দিরে বিশ্রামের জন্য আসতেন। তাঁর নির্দেশে মথুরবাবু এই দশমহাবিদ্যার অন্নভোগের ব্যবস্থা করেছিলেন। দশমহাবিদ্যার অন্যতম মহাবিদ্যা ত্রিপুরাসুন্দরীর দারু বিগ্রহ আছে মথুরাপুরের ছত্রভোগে।

বিভিন্ন মুখ্য দেব-দেবীর পাশাপাশি গৌণ এবং লোকায়ত দেব-দেবীরও দারু বিগ্রহ নির্মাণ করেছিলেন শিল্পীরা। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুরের গৌরার গঙ্গা মন্দির সে দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নদীতে ভেসে আসা একখণ্ড নিমকাঠ থেকে স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন স্থানীয় এক ব্যক্তি; পরবর্তীতে চক্রবর্তী পরিবার এই পুজো করে আসছেন দীর্ঘদিন যাবৎ। এই মূর্তিটিতে লোকায়ত শিল্পশৈলীর অপূর্ব প্রভাব লক্ষ করা যায়। আমবারুণিতে এই মন্দির চত্বরে একটি মেলা বসে প্রতিবছর।

বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিদর্শনও রয়েছে দারু বিগ্রহের মাধ্যমে। দক্ষিণবঙ্গে বিশেষত দক্ষিণ ২৪-পরগনায় মধ্যযুগে গাজী-কালু-চম্পাবতী, বনবিবি-দক্ষিণ রায়কে নিয়ে গড়ে ওঠে অসংখ্য মিথ ও কিংবদন্তি। তৈরি হয় নানা ধরনের মূর্তি পুজোর উদ্দেশ্যে। এই অঞ্চলের মথুরাপুরের খাড়িতে রয়েছে চন্দনকাঠের বৃহদাকার গাজীর দারু বিগ্রহ।

ত্রিপুরা সুন্দরী, ছনভোগ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

নারায়নী-দক্ষিণ রায় হোটোর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

খোদা-খুদি

গৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়া, কলকাতা

হোটরের সাঁপুই পরিবারের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে নারায়ণী, দক্ষিণ রায়-সহ একাধিক লোকদেবতার দারু বিগ্রহ রয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বজবজের অদূরে ব্যবসায়িক কারণে চিনা বসতি গড়ে ওঠে। টং অছি নামে এক ব্যবসায়ী ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রদত্ত জমিতে চিনির কল তৈরি করেন। তিনি একটি মন্দিরও নির্মাণ করেন সেখানে দুটি চিনা দেব-দেবীর পুজো হতে থাকে। পরবর্তীতে এই মূর্তি দুটি পরিচিত হয় খোদা-খুদি নামে যাঁর তত্ত্বাবধান করতেন একজন মুসলমান। আশ্চর্যের কথা এই মন্দির চত্বরেই রয়েছে দক্ষিণরায়ের প্রাচীন মন্দির। জনশ্রুতি, একদিন দক্ষিণরায় ঘোড়ায় চড়ে যখন নিকটবর্তী নদীর ধারে প্রাতঃভ্রমণ করছিলেন তখন জলে দুটি সুন্দর মুমূর্ষু নারী ও পুরুষকে দেখতে পান। তীরে এনে তাদের সুস্থ করার পর জানতে পারেন যে তাঁরা আদতে চিন দেশের ভাগ্য দেবতা যাঁরা রাজার দুর্ব্যবহারে চিন থেকে চলে এসেছেন ভারতবর্ষে। দক্ষিণরায় তাঁদের জমি দিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। এরপর চিনের রাজা তাদের ক্ষমা চেয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসেন। কিন্তু ভারতের আতিথেয়তায় মুগ্ধ ওই দেবদেবী আর ফিরে যাননি। এরাই হলেন খোদা-খুদি। চিনের প্রথম কলোনি টং অছির নামানুসারে অছিপুর হয়। যদিও টং অছির মৃত্যুর পর চিনারা কলকাতার টেরিটিবাজার, তপসিয়া অঞ্চলে স্থানান্তরিত হন। কিন্তু প্রতিবছর চিনা নববর্ষের সময় তাঁরা খোদা-খুদির মন্দিরে পুজো দিতে সমবেত হন। খোদা-খুদির ক্ষুদ্রাকৃতির অদ্ভুত প্রকৃতির দারু বিগ্রহ আজও এই সমন্বিত ধর্মধারার উদাহরণ বহন করে চলেছে।

বাংলার দারু বিগ্রহের বিস্তৃত পরিধি থেকে পাঠকদের সামান্য কয়েকটির সঙ্গে পরিচিত করানো হল এই প্রবন্ধে। রূপকলার নিজস্ব শৈলীর সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ভাস্করেরা মূলত নিমকাঠের মাধ্যমেই এই সমস্ত অপূর্ব নিদর্শন তৈরি করেছিলেন। শাস্ত্রে যেসব কাঠের উল্লেখ আছে সেখানে কিন্তু নিমকাঠের কোনো উল্লেখ নেই। অনেকে মনে করেন যে ওড়িশার জগন্নাথ ধর্মধারার প্রভাবে বাংলায় নিমকাঠের চল হয়েছিল। কিন্তু এই বিষয়ে বেশি প্রচলিত মতটি হল, শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে; কেননা তাঁর সময় থেকে বাংলার সর্বত্র এই দারু বিগ্রহের প্রচলন হয়। নিম গাছের তলায় শ্রীচৈতন্যদেব জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তাই তাঁর ভক্তদের কাছে এই গাছটি অত্যন্ত পবিত্র। এছাড়া কাঁঠাল কাঠ, গামার কাঠ, বেল কাঠ প্রভৃতি দিয়েও বিগ্রহ তৈরি হয়। সাধারণত পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাট, নতুনগ্রাম, হাওড়া জেলার থলে রসপুর সহ বিভিন্ন অঞ্চলের সূত্রধররা বংশপরম্পরায় এই দারু বিগ্রহ নির্মাণ করে আসছেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার বাঘনাপাড়ায় রয়েছে বিগ্রহের অঙ্গরাগ শিল্পীরা। এইভাবে

বাংলার দারু বিগ্রহ আঞ্চলিক শিল্পকলার ইতিহাসকে আজো সমৃদ্ধ করে চলেছে।

গ্রন্থঋণ

(১) কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্যচরিতামৃত, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা।
(২) জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চোপাসনা, ফার্মা কে এল এম, কলকাতা, ১৯৬০।
(৩) তারাপদ সাঁতরা, বাংলার কাঠের কাজ।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

(১) শ্রী সঞ্জয় সেনগুপ্ত
(২) শ্রী সাগর চট্টোপাধ্যায়্যা
(৩) শ্রী গোপীকান্ত মেথুর
(৪) শ্রীমতী আভা মুখোপাধ্যায়
(৫) শ্রীমতী বরুণা গোস্বামী
(৬) শ্রী মনোজ গোস্বামী
(৭) শ্রী রাজর্ষি হালদার
(৮) শ্রী ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
(৯) শ্রী অনির্বাণ চৌধুরী
(১০) শ্রী সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়
(১১) শ্রীমতী ডলি জানা
(১২) শ্রী কাশীশ্বর রায়চৌধুরী
(১৩) শ্রী কালিদাস বসাক
(১৪) শ্রীমতী দীপ্তি নন্দী

মা মনসা — খড়দা, হাওড়া

ষড়ভুজ মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, জগন্নাথ — নিমতলাঘাট স্ট্রীট, কলকাতা

জয়দেব মেলা: চিরন্তন সত্যের অনুসন্ধান

জয়দেব-কেঁদুলিতে পৌষ-সংক্রান্তির বাউল মেলা জমে ওঠে চিরায়ত সত্যের অনুসন্ধানে। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে মানুষ আসে বাউলের কথায় ও কণ্ঠে জীবনকে চিনে নেবে বলে। সারা রাত ধরে আখড়ায় আখড়ায় বাউল গান আর কীর্তন চলে। অজয়ের তীরে কুয়াশার মায়ায় সেই সুর ছড়িয়ে পরে দিক-বিদিক।

ভোর হতে না হতেই পুণ্য স্নানে মাতে ভক্তের দল। কথিত আছে, প্রতি পৌষ-সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নানে যেতেন কবি জয়দেব। একবার তিনি যেতে না পারায় খুব মন খারাপ করেছিলেন। দেখলেন, শুকনো অজয় জলে ভরে উঠল। গঙ্গা এসে মিশেছে। এই জনশ্রুতিই, সংক্রান্তির ভোরে আজও অজয়ের তীরের এই গ্রামকে জনারণ্য করে তোলে।

জয়দেব কৃষ্ণের উপাসক। শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম-এ তিনি কৃষ্ণ-রাধার প্রেমভাষ্য তুলে ধরেছেন। দেহি পদপল্লব মুদারাম—তিনি লিখতে দ্বিধা করছিলেন। তিনি যখন স্নানে গিয়েছেন কৃষ্ণ তাঁর রূপ ধরে এসে লিখে যান এই পদ। এমনকি জয়দেবের স্ত্রীর হাতে ভাতও খান। এ হেন জয়দেব বাংলার এক অন্যতম কবি-দার্শনিক। বৈষ্ণব-ভাবনার এক স্বর্গলোকের চাবিকাঠি তিনি হাতে তুলে দিয়েছেন মর্ত্যবাসীকে।

এই জয়দেবের নামে বাউল মেলা চলে আসছে। এখানেই বাউল-চর্চা চলে বিভিন্ন মঠ-মন্দির-আখড়ায়। সারা বছর ধরেই ভক্তরা আসেন এই খোলামেলা অজয় নদের তীরে। অসংখ্য মঠ-মন্দির-আশ্রমের সাধন-ভজন এই অঞ্চলকে পুণ্যভূমি করে তুলেছে। এখানেই বাউল-অ্যাকাডেমি গড়ে তোলা হচ্ছে সরকারি উদ্যোগে।

কবি জয়দেব জীবন রসের পথিক। মানুষকে তিনি এই পথের সন্ধান দিয়েছেন রাধা-কৃষ্ণের প্রেমময় কাব্যের আধারে। রসিক-রসিকাদের ভিড় জমে এ মেলায়। জীবনের গূঢ় অর্থ আস্বাদনের হাতেখড়ির পালা চলে। বাউল-বাউলানির দল ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে বেরায়। তাঁদের খমক আর একতারা-র সুর তন্দ্রার ঘোর কাটিয়ে দেয়। মহাঘুম থেকে জেগে ওঠে জীবন। তাই জয়দেব মেলা এক জাগরণের মেলা।

জয়দেবকে ঘিরে নানা প্রশ্ন ওঠে। কেদুলির জয়দেবকে খুঁজে নিতে ইচ্ছে করে যে কোনও ভক্তেরই। তারই কিছু তথ্য নিয়ে এই নিবন্ধ।

দেশ, কালের সীমা পেরিয়ে তাঁর বেঁচে থাকা। তিনি তর্কাতীতভাবে বৃহৎবঙ্গের কবি। শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্-এর স্রষ্টা জয়দেব আমাদের গর্ব।

কবি জয়দেব শুধু কাব্য রচয়িতাই নন, মানব-মানবীর প্রেমলীলাই মূর্ত হয়েছে তাঁর রাধা-কৃষ্ণলীলার এই কাব্যে। শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্ তিনি সংস্কৃতেই রচনা করেছেন। এ যেন প্রেমের মহাকাব্য।

কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেমের চরম আকুতি এখানে প্রকাশিত। রাধাকে ভুলে কৃষ্ণ অন্য সখীদের সঙ্গে মত্ত। রাধা বিরহ যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছেন। তবু কৃষ্ণের ভ্রূক্ষেপ নেই। কৃষ্ণের কাছে রাধা বারবার তাঁর সখীকে পাঠাচ্ছেন। সখী ফিরে ফিরে এসে জানাচ্ছে কৃষ্ণের লীলামত্ততার কথা। রাধার কাতরতা আরও বেড়ে যাচ্ছে।

অবশেষে কৃষ্ণ এলেন। অভিমানিনী রাধার মান ভাঙাতে কৃষ্ণের আকুল প্রার্থনা—তোমার পা আমার মাথায় রাখো রাধা।

নারীর প্রেমের শ্রেষ্ঠ মূল্যায়ন করলেন একজন পুরুষ। ভারতীয় ভাবনায় 'নারীশক্তি'-র সর্বোত্তম মূল্যায়ন যেন ঘোষিত হল। 'নারীর প্রেম' সেই মুহূর্তে মর্তলোকের সবথেকে মূল্যবান সামগ্রী হয়ে উঠল।

জয়দেবের জন্ম ১১২৩ খ্রিস্টাব্দে। কথিত আছে, এই 'কেন্দুবিল্ব' তথা 'কেঁদুলি' গ্রামেই জয়দেবের জন্ম। লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেব লক্ষ্মণসেনের থেকে চার বছরের ছোটো ছিলেন। 'সেখ শুভোদয়া' থেকে এ কথা জানা যায়। ১১১৯ খ্রিস্টাব্দ রাজা লক্ষ্মণসেনের জন্মবর্ষ। এই বছর থেকে পিতা রাজা বল্লালসেন 'লক্ষ্মণাব্দ'-এর প্রবর্তন করেন। রাজা লক্ষ্মণসেন ও কবি জয়দেব—দুজনের গভীর সখ্যতার কথা নানা সূত্র থেকে আমরা পাই।

১২২৮ খ্রিস্টাব্দে জয়দেব ইহলোক ত্যাগ করেন। যদিও ১১৪৩ খ্রিস্টাব্দকে জয়দেবের জন্মবর্ষ ধরে তাঁর জন্মোৎসব পালন করার রেওয়াজ চলছে কেঁদুলিতে।

অন্যদিকে মিথিলাবাসীরা দাবি করছেন জনকপুরের রাজসভাকবি ছিলেন জয়দেব। ১৪৪৬ খ্রিস্টাব্দের কার্তিক মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে জয়দেব জন্মগ্রহণ করেন। মিথিলায় পৌষ-সংক্রান্তিতেই তাঁর স্মৃতি-উৎসব পালিত হয় খুব ঘটা করে।

আবার জয়দেব বৃন্দাবনের নিম্বার্কীয় শ্রীশ্রীটাট্টিস্থান আশ্রমের ছেচল্লিশতম আচার্য ছিলেন। হরিদাস স্বামীর 'অষ্টাদশ সিদ্ধান্ত কে পদ' গ্রন্থের আচার্য-পরম্পরা থেকে জানা যায় এই তথ্য।

জয়দেব-কেঁদুলির শ্রীশ্রী নিম্বার্ক আশ্রমে প্রতিবছর পৌষ-সংক্রান্তিতে স্বর্গত কবি জয়দেবের উদ্দেশ্যে 'শ্রাদ্ধদান' করা হয়। ১২২৮ খ্রিস্টাব্দের 'শুক্লাষ্টমী পৌষী উত্তরায়ণ সংক্রম'-এ তিনি দেহরক্ষা করেন বলে কথিত। দ্বাদশ বঙ্গাব্দের ষষ্ঠ বা সপ্তম দশকে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীশ্রীনিম্বার্ক আশ্রম।

কবি জয়দেব তাঁর 'গীতগোবিন্দ'-এ তাঁর জন্মগ্রাম হিসেবে 'কেন্দুবিল্ব'-র নাম উল্লেখ করেছেন।

অজয় নদের উত্তর-তীরে 'কেন্দুলি' গ্রাম বীরভূম জেলায় অবস্থিত। মনে করা হয়, 'কেন্দুবিল্ব'-এরই সংক্ষিপ্ত নাম এই কেঁদুলি। জয়দেব-এর নাম যুক্ত হয়ে 'জয়দেব-কেঁদুলি' বা শুধুই 'জয়দেব' হয়ে উঠেছে 'কেঁদুলি'।

কর্ণাটের দ্রাবিড় সেনবংশীয়রা বাংলায় এসে উপনিবেশ স্থাপন করেন বীরভূমের সেনভূমি বা রাজনগর এলাকায় এবং কেঁদুলি-সংলগ্ন সেনপাহাড়ি অঞ্চলে। দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দে সেনপাহাড়িতে সেন-রাজাদের একটি গড়-প্রাসাদ ছিল বলে জানা যায়। রাজা লক্ষ্মণসেন সেখানে থাকতেনও নাকি। এপারে জয়দেব। ওপারে লক্ষ্মণসেন। দুপারে দুজন—রাজা ও রাজকবি। এই ঐতিহাসিক সূত্র ধরেই তাঁদের সমসাময়িকতার প্রমাণ আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে।

জয়দেব কেঁদুলি-তে বর্তমান সরকার তৈরি করছে বাউল অ্যাকাডেমি। উদ্দেশ্য, বাউল চর্চা ও গবেষণা। পৌষ সংক্রান্তিতে আয়োজিত জয়দেব মেলা সরকারি উদ্যোগে ভিন্ন মাত্রা পাচ্ছে। অজয়-এর তীরে এই মেলাকে কেন্দ্র করে সুপ্রাচীন কাল থেকে হাজারো ভক্তের সমাবেশ। তাঁরা আসেন কৃষ্ণ কথা শুনতে, বাউল গান শুনতে। স্থানীয় পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় এই মেলা পরিবেশবান্ধব মেলার স্বীকৃতি পাচ্ছে।

জয়দেব মেলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মেলাকে সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকে মেলার সুচনা করেন প্রতিবছর। দূর-দূরান্ত থেকে আগত যাত্রীদের সুবিধার জন্য নানা ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে আলো, শৌচালয় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণের জলের ব্যবস্থা রাখা হয়। এছাড়া সার্বিক নিরাপত্তার দিক দিয়েও প্রশাসনিক উদ্যোগে নিপুণভাবে এই মেলা করার প্রয়াস নেওয়া হয়।

মনে করা হয়, রাঢ়ে যখন সেন রাজত্বের সূচনা হয় তখন থেকেই, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের বাসস্থান হিসেবে 'কেন্দুলি' গ্রামের পত্তন হয়। অর্থাৎ, এই গ্রাম ছিল ব্রাহ্মণপ্রধান। চতুর্বেদের নানা শাখার, নানা গোত্রের ও নানা পদবীর ব্রাহ্মণেরা বাস করতেন। কুলীন ব্রাহ্মণদেরও বসতি ছিল এখানে।

সেই সময় কেন্দুবিল্ব ছিল বিশাল এক জনপদ। পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। এই গ্রামেই বাৎস্যগোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জয়দেবের জন্ম। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের কবি মোহনদাস-এর লেখায় পাই— 'কেন্দুবিল্লি [কেন্দুবিল্ব] গ্রাম আছে অজয় কিনারে।'

যদিও ড. সুকুমার সেন এ ব্যাপারে অন্য অভিমত জানিয়েছেন।

অজয় নদের তীরে 'কেন্দুবিল্ব'-এর ভাঙাগড়ার ইতিহাস বহু বিতর্কিত। জয়দেব-এর বাস্তুভিটা নিয়েও নানা প্রশ্ন-উত্তরের মালা গাঁথা হয়ে চলেছে। তবু নিষ্ঠার সঙ্গে নানা তথ্য অনুসন্ধান করে গবেষণার কাজও চলছে নিরন্তর। স্থানীয় মানুষজনের কাছ থেকে পরম্পরাগত নানা তথ্য, কিংবদন্তি, লেখা আজও আমাদের জয়দেব-অনুসন্ধানকে জারিয়ে চলেছে।

বিভিন্ন সূত্র থেকে অনুমান করা যাচ্ছে, জয়দেব-এর সমাধিস্থলেই অর্থাৎ বাস্তুভিটাতেই শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ-এর নবরত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জয়দেব ছিলেন বৈষ্ণবাচার্য। বাস্তুভিটাতেই তাঁদের সমাধিমন্দির বা স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা নিয়ম।

জয়দেব-এর বাস্তুভিটার সঠিক সন্ধান তর্কাতীত নয়। তর্কাতীত নয় শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিগ্রহ প্রসঙ্গও।

জয়দেব-এর আরাধ্য দেবতার নাম — শ্রীশ্রীরাধামাধব। কবি গীতগোবিন্দ-র প্রথম শ্লোকের শেষ দিকে লিখছেন—

রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ

লক্ষ্মণসেনের আর এক সভাকবি ধোয়ী তাঁর রচিত পবনদূত-এ লিখছেন যে এই সুহ্মদেশে সেনান্বয়নৃপতি সেনরাজবংশীয় রাজা কর্তৃক দেবরাজ্যে অভিষিক্ত কমলার কেলিসহচর মুরারি বাস করেন। রাজা লক্ষ্মণসেন স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণমুরারিকে সুহ্ম বা রাঢ়দেশের গঙ্গাতীরে রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলেন, রাজা লক্ষ্মণসেন ও তাঁর পুত্র কেশবসেনও শ্লোক রচনা করেছেন যেখানে জয়দেব-এর শ্লোকের আনুরূপ্যতা দৃশ্যমান।

কেউ কেউ ধারণা করেছেন—জয়দেবের আরাধ্য দেবতা শ্রীশ্রীরাধামাধবের উল্লেখ করে রাজা ও রাজকুমার উভয়েই প্রীত হয়ে সাধককবিকে সম্মানিত ও অভিনন্দন করেছিলেন।

কেঁদুলির পশ্চিমদিকের একটি ঘাট কদম্বখণ্ডীর ঘাট। বৈষ্ণব মহাজন ও সাধু-সন্তদের কাছে 'পরমতীর্থ'। জনশ্রুতি এই যে এই ঘাট থেকেই তিনি শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিগ্রহ পান এবং কেঁদুলিতেই সেটি প্রতিষ্ঠা করেন। কেঁদুলি-সেনপাহাড়ি অঞ্চলের কীর্তন গানে তাই শোনা যায়—

দয়া কর রাধামাধব
জয়দেবের প্রাণধন পদ্মাবতীর সেবার ধন।

এই অঞ্চলের বৈষ্ণব ভিক্ষুক-ভিক্ষুণীরা ভিক্ষা করতেন 'জয় রাধামাধব' বলে।

সেনরাজাদের আগে বাংলায় 'একা কৃষ্ণ'-র পূজা হত। বর্ধমানের মঙ্গলকোট থানার এরুয়ার গ্রামের উত্তর-পূর্বদিকে একটি গাছের কাণ্ডের কোটরে দেড়ফুটের একটি বাঁশিধারী কৃষ্ণের পাথরের মূর্তি দেখা যায়। মূর্তির শিল্পশৈলীর স্থূলতায় অনুমান করা হয় মূর্তিটি পালযুগের। বীরভূমের নলহাটির কিছুদূরে নাথপাহাড়ে এবং একচক্রা বা বীরচন্দ্রপুরের আশ্রমে গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের দুটি পাথরের বিগ্রহ দেখা যায়। বীরভূমের নানা স্থানে শ্রীরাধাকান্ত, শ্রীগোপীবল্লভ নামে শালগ্রাম শিলার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। শ্রীবাসুদেব-এরও নানা পাথরের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে বীরভূমের নানা গ্রামে।

কদম্বখণ্ডীর ঘাট থেকে জয়দেব-এর শ্রীশ্রীরাধামাধব বিগ্রহ প্রাপ্তির সম্ভাবনা যে অমূলক নয়, সে ব্যাপারেও নানা তথ্য বিশ্লেষণ করা যায়। এই অঞ্চলের বিভিন্ন মন্দিরের শ্রীবাসুদেব এবং শ্রীবিষ্ণুর একাধিক পাথরের মূর্তি অজয়নদের গর্ভ থেকেই পাওয়া।

জয়দেব শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ-এ কৃষ্ণের বেশ কিছু নাম উল্লেখ করেছেন। 'মাধব' নামটিই তাঁর সব থেকে প্রিয় নাম ছিল। রাধা-মাধব-এর যুগল বিগ্রহ জয়দেব-পদ্মাবতীর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত।

জয়দেব-পদ্মাবতীর ব্যক্তিজীবনের প্রেম-সাধনার উৎসও যেন রাধা-কৃষ্ণের প্রেম।

আলোচনা সূত্রে বলা যেতে পারে, জয়দেব-এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শ্রীকৃষ্ণের গভীর প্রভাব পড়েছিল। তৎকালীন বাংলার, সমাজজীবনেও কৃষ্ণ-আরাধনা মুখ্য হয়ে উঠেছিল।

সেন রাজারা বৈষ্ণব ছিলেন। রাজকবিও বৈষ্ণব। রাধা-কৃষ্ণের লীলার প্রচারক। তারই অমৃতময় মহাকাব্য—শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্।

কেউ কেউ বলে থাকেন কবি জয়দেবের শ্রীশ্রীরাধামাধবের মূল মন্দির লক্ষ্মণসেন পাথর দিয়ে নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। মন্দিরটি ছিল মন্দিরা গ্রামে। মন্দিরময় মন্দিরা গ্রামটি সম্ভবত ষোড়শ শতকের আগেই অজয়-গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। পরবর্তীকালে অজয়-গর্ভ থেকে মন্দিরের কিছু ভগ্নাবশেষ কেঁদুলি-তে নিয়ে আসা হয়। শ্রীশ্রীকুশেশ্বর শিবমন্দিরের উত্তরদিকে একটি মন্দির-খিলানের পাথর রাখা আছে। ড. পঞ্চানন মণ্ডল-এর অনুমান—এই পাথরখণ্ডটি জয়দেব-এর শ্রীশ্রীরাধামাধব-এর মূল মন্দিরের চুড়ো, যে রকম খাঁজ-কাটা চুড়ো নালন্দা-রাজগির-এ আছে।

মন্দিরের আরেকটি খাঁজকাটা পাথরের লম্বা অংশ বর্তমান শ্রীশ্রী রাধাবিনোদ মন্দিরের দরজার নীচে গাঁথা আছে।

শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ মন্দিরের জায়গায় শ্রীশ্রীরাধামাধবের মূল প্রস্তর-মন্দির ছিল বলে অনেকেই মনে করেন না। তাঁদের যুক্তি, তাহলে অজয়-গর্ভে বিলীন হত না।

বর্তমান কেঁদুলির কিছু দূরে অজয়ের দু-তীরেই কবিরপুর-মন্দিরা গ্রাম। তাই মনে করা যেতে পারে শ্রীশ্রীকুশেশ্বর শিবের মন্দির থেকে মন্দিরা ও কবিরপুর পর্যন্ত ভূখণ্ডই কবি জয়দেবের জন্মগ্রাম কেন্দুবিল্বর মূল অংশ ছিল, যেখানে জয়দেব-পদ্মাবতী বাস করতেন। বিশাল এই অঞ্চলকে জয়দেব বলেছেন—'কেন্দুবিল্বসমুদ্র'।

অজয়ের তীরে দাঁড়ালে যে বালুচর চোখে পড়ে এই শীতে, তারই মাঝে হারিয়ে গেছে কি কবির জন্মগ্রামের মূল অংশ? প্রাচীন কেন্দুবিল্বের পশ্চিমদিকের উত্তর-মধ্য ভূখণ্ডই আজকের জয়দেব-কেঁদুলি গ্রাম।

পদ্মাবতীর দেহত্যাগের পর এই কেঁদুলি থেকেই বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন জয়দেব। বৃন্দাবনের টাট্টিস্থান নামক এক জায়গায় নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের এক শাখা আছে। তাঁদের আশ্রমে গুরুপরম্পরার তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে আচার্য নিম্বার্ক থেকে অধস্তন ছেচল্লিশতম গুরুর নাম জয়দেব। এই কুলগুরু 'জয়দেব কবি' বলে উল্লিখিত। 'গীতগোবিন্দ' সমন্বয়মূলক বৈষ্ণবধারা আদর্শের ভিত্তিতে রচিত। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় দর্শনের সঙ্গে গীতগোবিন্দ-র ধর্মদর্শনের অনেক সাদৃশ্য আছে। সহজ ভক্তিধর্মের আদর্শ প্রচারিত হয়েছিল তাঁদের মাধ্যমে।

লক্ষ্মণ সেন-এর সময়ে বাংলা চলে চায় তুর্কি শাসকদের হাতে। বাংলার সার্বিক জীবনে ঘটে যায় চরম বিপর্যয়। রাজকবি জয়দেব স্বভাবতই এই অস্থির সময়ে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে তাঁর বৃন্দাবনযাত্রা। শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবাপূজা চালানো সহজ ছিল না তাঁর পক্ষে।

কেঁদুলি থেকে হেঁটে দু'মাসে নাকি বৃন্দাবন পৌঁছন কবি।

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় — খ্রিস্টীয় একাদশ শতকের প্রথমভাগে মহম্মদ গজনীর ভারত আক্রমণের সময় 'বৃন্দাবন'-এর অস্তিত্ব ছিল। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে 'বৃন্দাবন'-এর অধিকাংশই জনমানবহীন ও বনজঙ্গলময় হয়ে যায়। পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের আদেশে রূপ-সনাতন 'বৃন্দাবন'-ধামকে পুনঃপ্রকাশিত করেন।

খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে জয়দেব বৃন্দাবনে যখন আসেন তখন তার অস্তিত্ব ছিল এবং 'তীর্থক্ষেত্র' হিসেবেও প্রসিদ্ধি ছিল বলে মনে করা হয়। কবি মোহনদাস-এর লেখা থেকে জানা যায়—শ্রীশ্রীরাধামাধব-কে তিনি বৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

নানা তথ্যসূত্রের মেলবন্ধন দীর্ঘপ্রসারী ব্যাপার। ছোট্ট নিবন্ধে শুধু আগ্রহ জাগানো যায়। গীতগোবিন্দর কবি জয়দেব আমাদের আজও কাছে টেনে নিয়েছেন। পরবর্তীকালে বর্ধমানের মহারানি ব্রজকিশোরী কেঁদুলিতে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট ঔরংজেবের এক সনদ অনুসারে প্রথম সেনপাহাড়ি পরগনার অধিকার পান বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম রায়।

সেনপাহাড়ি দূর্গ ও পাশের অঞ্চলেরও অধিকার পান তিনি। এই পরগনাতেই 'অজয়-কেন্দুলি'-র অবস্থান ছিল। তারপরই শ্রীশ্রী রাধাবিনোদ-এর মন্দির নির্মাণ করা হয় বলে নানা তথ্য উঠে আসছে। বর্তমানে এটি জাতীয় পুরাকীর্তি হিসেবে সংরক্ষিত। যাই হোক, এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে মেতে আছে 'জয়দেব-কেন্দুলি'। চারপাশে নানা আশ্রম। 'জয়দেব মেলা' ভারতের প্রাচীনতম মেলাগুলির একটি।

জয়দেবের বৃন্দাবন থেকে ফিরে আসা নিয়ে নানা মত থাকলেও। কিন্তু তাঁর 'সাধনক্ষেত্র' হাজারো মানুষের 'সাধনক্ষেত্র' হয়ে উঠেছে। মন-ময় জগতের সাধনা এখানে চলে। জয়দেব স্মরণে জমে ওঠে পৌষ-সংক্রান্তির ভোর। প্রবাদ আছে, অজয়ের সঙ্গে গঙ্গার মিলন হয় তখন। সেই পূণ্য প্রভাতে স্নানে মাতে ওই অঞ্চলের মানুষ। আর রাতভর গানে মাতে বিশ্বের 'বাউল'। জয়দেব বিতর্ক উধাও হয়ে যায়।

সকলের মনে যে বাউলের বাস—তাঁরই মুক্তি ঘটে এই বাউল-মেলায়। 'গীতগোবিন্দ'-র জয়দেব-কে কেন্দ্র করে প্রকৃত বাউলের সন্ধান চলে মনের গভীরে। সকলেই আসেন নিজের 'মনের মানুষ' খুঁজে নিতে। আজও তাই আমাদের এত জয়দেব-কাতরতা—চিরন্তন সত্যের অনুসন্ধানে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. জয়দেব-কেন্দুলির শ্রী শ্রী রাধাবিনোদের মন্দির—ডঃ অজিতকুমার দাস,

২. বাউলতীর্থ—জয়দেব মেলা ২০১৭, সম্পাদক—শম্পা হাজরা, মহকুমা শাসক ও সম্পাদক জয়দেব মেলা কমিটি, বোলপুর, বীরভূম।

১১ জুন, ২০১৯। 'আইটিসি রয়্যাল বেঙ্গল'-এর উদ্‌বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

১২ জুন, ২০১৯। রাজ্যের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর কৃতীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে, নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী।